রাসূলের (স.) যুগে মদীনার সমাজ রূপ ও বৈশিষ্ট্য

(১ম খন্ড)

ড: আকরাম জিয়া আল উমরী

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা মহাবিশ্বের রব আল্লাহর জন্য এবং
তাঁর শেষ নবী ও রাসূলের প্রতি সালাম ও দুরূদ।

www.pathagar.com

রাসূলের (সা.) যুগে মদীনার সমাজ

রূপ ও বৈশিষ্ট্য

(১ম খণ্ড)

ড. আকরাম জিয়া আল উমরী

অনুবাদ

মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

www.pathagar.com

রাসূলের (সা.) যুগে মদীনার সমাজ
রূপ ও বৈশিষ্ট্য (১ম খন্ড)
ড. আকরাম জিয়া আল উমরী
অনুবাদ : মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বি আই আই টি)
বাড়ী # ৫০, রোড # ১৬ (পুরাতন ২৭), ধানমন্ডি
ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ।
ফোন : ৯১৩৮৩৬৭, ৮১২২৬৭৭, ফ্যাক্স : ৯১১৪৭১৬
ইমেল : biit_org@yahoo.com

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৮
দ্বিতীয় প্রকাশ ; ২০০৭

ISBN 984-8203-13-3

প্রচ্ছদ
এম এ আকাশ

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

Rasuler (sm) Jooge Madinar Samaj is a Bengali translation of Medinan Society at the Time of the Prophet- Its Characteristics and Organisation vol. 1, by Akram Diya al Umari and translated into Bengali by Md. Sajjadul Islam and published by Bangladesh Institute of Islamic Thought, Dhaka Bangladesh, 2nd Print 2007.
Phone : 9138367, 8122677, Fax : 9114716, Email : biit_org@yahoo.com
Price : Tk. 150.00 US$ 10.00

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

রাসূলের (সা.) যুগের সমাজ বিশ্ব মুসলিমের চিরন্তন আদর্শ সমাজ। এ সমাজ একটি বাতিঘরের মত। বিশ্বের মুসলমানগণ যে দেশেই বাস করুন না কেন, নিজেদের অবস্থান নির্ণয় করতে পারেন সহজেই। এই সমাজের প্রত্যেকটি অঙ্গ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এর সমাজ ব্যবস্থা, ব্যবসায়, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, যুদ্ধ ও শান্তি সবই পরবর্তী বংশধরদের জন্য আদর্শস্বরূপ। তাই মদীনার সমাজ ও শাসন ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে জানা দরকার।

এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমরা বইটি অনুবাদে হাত দিয়েছি। ড: আকরাম জিয়া আল উমরী একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ইসলামী গবেষক। এতে কোন সন্দেহ নেই, বর্তমান কালে ইসলামী বিশেষজ্ঞদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ইসলামের ইতিহাস রচনা এবং এ রচনাও শুধু জীবন বৃত্তান্তমূলক না হয়ে সমাজভিত্তিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইসলামের ইতিহাস লিখনে, প্রমাণপঞ্জী যাচাই, বাছাই ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে গভীর মনোনিবেশ প্রয়োজন ছিল তার খুব কমই করা হয়েছে।

ড: উমরী এ বিষয়টির প্রতি খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন এবং একারণেই তার এই রচনা একখানি আদর্শ ইতিহাস হতে পেরেছে বলা যায়। বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে এরকম একটি বই উপহার দিতে পেরে আল্লাহর *শুকরিয়া* আদায় করছি।

অনুবাদ কার্য একটি দুরূহ কাজ। আমি মনে করি কাজটি সফলতার সংগে সম্পাদন করেছেন বইটির অনুবাদক সাংবাদিক সাজ্জাদুল ইসলাম। তাঁর নিরলস পরিশ্রমের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

এম জহরুল ইসলাম এফসিএ
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
ঢাকা।

জুলাই ২০০৭

www.pathagar.com

সূচি

মুখবন্ধ ৯

ভূমিকা ১১

লেখকের কথা ১৯

ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস রচনা সম্পর্কিত প্রস্তাবনা ২১

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাস বিশ্লেষণে ইসলামী বৈশিষ্ট্য ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

হাদীস বিশারদগণের মূলনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে
নমনীয়তা অবলম্বনের আবশ্যকতা ৩৯

তৃতীয় অধ্যায়

মহানবীর (সা:) আমলে মদীনার সমাজ ঃ
বৈশিষ্ট্য ও প্রাথমিক কাঠামো ৬৩

চতুর্থ অধ্যায়

মদীনার সমাজে ইসলামের প্রভাব ৬৮

পঞ্চম অধ্যায়

হিজরত ও মদীনার সমাজ কাঠামোয় তার প্রভাব ৭১

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহানবীর (সা:) যুগে মুয়াখাহ্‌র (পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের) বিধান ৭৭

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

মানব সম্পর্কের বুনিয়াদ হচ্ছে ধর্মবিশ্বাস ৮৮

অষ্টম অধ্যায়

মদীনার সমাজের ভিত্তি ভালবাসা ৯২

নবম অধ্যায়

সমমর্যাদার ভিত্তিতে ধনী ও গরীবের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ৯৫

দশম অধ্যায়

মদীনার সনদ ১১৩

একাদশ অধ্যায়

ইহুদীদের চুক্তি ভঙ্গ এবং মদীনা থেকে তাদের বহিষ্কার ১৪৫

দ্বাদশ অধ্যায়

খায়বর ও হেজাজের অবশিষ্ট ইহুদী ঘাঁটি জয় ১৬৭

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট এক :

আহল আল সুফফাহ সম্পর্কিত সূত্র ১৮৬

পরিশিষ্ট দুই :

মদীনার সনদ সম্পর্কি গবেষনা সূত্র ১৮৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

ইন্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট ডঃ আকরাম জিয়া আল দ্বীন আল উমরীর লেখা প্রথম ইংরেজী সংস্করণ 'Madinan Society at the Time of the Prophet' প্রকাশ করেছে। এর মধ্য দিয়ে ইনষ্টিটিউট দ্বীন সম্পর্কে তথ্য উদ্‌ঘাটনে সুগভীর গবেষণায় উৎসাহদান অব্যাহত রেখেছে। মুসলমানদের বর্তমান চিন্তাধারা সংস্কারের জন্য এ ধরনের জ্ঞানগর্ভ গবেষণা অত্যন্ত জরুরী। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাতের তাৎপর্য অপরিসীম। সকল গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিবরণ একে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে। সুন্নাহকে অবশ্যই তার সঠিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতে হবে এবং সেজন্যে সীরাত অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সুন্নাহর সমালোচনামূলক উপলব্ধি অপরিহার্য। ডঃ আল উমরীর গ্রন্থে এ বিষয়টি সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

ডঃ আল উমরীর রচনার আরেকটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিকোণ রয়েছে। তা হলো পদ্ধতিগত দিক। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে ইনষ্টিটিউট ইংরেজী ভাষার পাঠক সমাজের সামনে গ্রন্থখানি তুলে ধরতে আগ্রহী হয়েছে।

ঐতিহাসিকভাবে সীরাত বিশেষজ্ঞ ও হাদীসবেত্তাগণের সমালোচনামূলক পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। একপক্ষ যেসব বিবরণ গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেছেন অন্যপক্ষ তা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং কোন হাদীস সহীহ কিনা তা নিরূপণের জন্য হাদীসবেত্তাগণ যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন মহানবীর (সা.) সীরাত রচয়িতাগণ প্রায়ই তা উপেক্ষা করেছেন। এভাবে বহু প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থের মতো সীরাত গ্রন্থগুলোতে যে অসংখ্য তথ্য ছড়িয়ে রয়েছে তা একান্তভাবে প্রায়োগিক প্রেক্ষাপটের কারণে সহীহ পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। মুহাদ্দীসগণের কঠোর মানদন্ডে এসব বিবরণ সরাসরি সঠিক নয় বলে প্রতীয়মান না হলেও কিছুটা সংশয়ের উদ্রেক করে।

সীরাত গবেষণার এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ডঃ আল উমরীর কৃতিত্ব হল সীরাতের বুনিয়াদী বিষয়গুলো হাদীস সমালোচনার প্রচলিত পদ্ধতি এবং ইসলামী প্রেক্ষাপটে আধুনিক পশ্চিমা ইতিহাস গবেষণায় সমন্বিত প্রয়োগ। ডঃ খালিদ ব্লাঙ্কিনশীপের লেখা ভূমিকা এবং স্বয়ং লেখকের "ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস রচনার পদ্ধতির সম্পর্কিত প্রস্তাবনা" শীর্ষক নিবন্ধে এপদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

বস্তুতঃ সমসাময়িক মুসলিম বিশেষজ্ঞগণের সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম প্রধান বিষয় হচ্ছে ইসলামের ইতিহাস রচনা। এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে ইসলামের ইতিহাস বিশেষ করে প্রমাণপঞ্জী, যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে গভীর মনোনিবেশ ও যত্নের দাবিদার, তা করা হয়নি। অতীতে এ ব্যাপারে অবহেলার কারণে ইসলামের ইতিহাসের উপর কালো ছায়াপাত হয়েছে, এতে ইসলাম সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী সম্পর্কে ভিত্তিহীন ধারণার অবতারণা এবং মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

www.pathagar.com

একথা সত্য যে, মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ প্রথম থেকেই ইসলামের প্রাথমিক যুগের প্রতি গভীর মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং প্রকৃতিগত দিক থেকে এই মনোযোগ ছিল আইন সংক্রান্ত বা শরয়ী বিষয়ের প্রতি। তাই আইন সংক্রান্ত বিষয়ে হাদীসের বিবরণ অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে এবং সেগুলো সহীহ হওয়া বা সহীহ না হওয়ার মানদন্ড অত্যন্ত কঠোর ও বৈজ্ঞানিক পন্থায় খুবই সতর্কতার সঙ্গে নির্ণীত হয়েছে। এর পাশাপাশি ঐতিহাসিক ঘটনা ও বিষয় বর্ণনায় শিথিলতা প্রদর্শন করা হয়েছে; আর এ ধরনের প্রশ্রয়দানের ফলেই ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস বর্ণনায় অসম্পূর্ণতা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে অনেক মুসলিম ঐতিহাসিক ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণের অনুসৃত পদ্ধতি ও মানদন্ডকে একান্তভাবে ঐতিহাসিক বিষয় নির্ভরযোগ্য, স্বল্প নির্ভরযোগ্য, সন্দেহজনক অথবা জাল কিনা তা যাচাই করার জন্য প্রয়োগ করার চিন্তা করেন। ব্রিটিশ ভারতের বিশিষ্ট আলেম আল্লামা শিবলী নোমানী ও তাঁর ছাত্র সাইয়েদ সোলায়মান নদভী প্রমুখ হাদীসবেত্তাগণের মূলনীতি ও মানদন্ড সর্বপ্রথম প্রয়োগের কৃতিত্বের দাবিদার। তাদের প্রচেষ্টার সোনালী ফসল হল উর্দু ভাষায় রচিত ছ'খন্ডে সমাপ্ত রাসূলের জীবনী গ্রন্থ "সীরাতুন্নবী (সাঃ)"। তাদের পন্থা অনুসরণ করে আবুল বরকত আব্দুর রউফ জৈনপুরী উর্দূ ভাষায় রচনা করেন "মাসাহ আল সাইয়ার"। ভবিষ্যতে ইতিহাসের ভিত্তি কি হবে সে সম্পর্কে ডঃ আল উমরী আদর্শ নমুনা উম্মাহর সামনে তুলে ধরার আগে অন্যান্য ভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকাগণ তাদের মূল্যবান রচনা থেকে ফায়দা অর্জনের সুযোগ পাননি।

বস্তুতঃ এই প্রকল্প হল ডঃ আল উমরীর গভীর আগ্রহ, নিষ্ঠা ও ত্যাগের ফসল। তিনি তাঁর কয়েকজন সুযোগ্য গ্রাজুয়েট ছাত্রকে সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করেন, যারা ইসলামের ইতিহাসের অন্যান্য যুগ সম্পর্কেও একই নীতিমালা ও মানদন্ড প্রয়োগের কাজ শুরু করেছেন।

এভাবে পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসের একটি ক্রান্তিকাল অধ্যয়ন এবং সীরাত (সাঃ)-মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগত অবদান হিসেবে ডঃ আল উমরীর এ মূল্যবান গ্রন্থখানি অধ্যয়নের জন্য আমি তাদের প্রতি আমন্ত্রণ জানাই।

পরিশেষে রাসূলের (সাঃ) আগমনের শাশ্বত সত্য পরিস্ফুটনে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তারা আল্লাহর অসীম রহমতে অভিষিক্ত হোন, এই দোয়া করি।

ডঃ তাহা জাবির আল আলওয়ানী
প্রেসিডেন্ট
ইন্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
হার্ণডন, ভার্জিনিয়া
জুন ১৯৯১

www.pathagar.com

ভূমিকা

সমসাময়িক মুসলিম বিশেষজ্ঞ আকরাম জিয়া আল উমরী তাঁর "রাসূলের (সা.) যুগে মদীনার সমাজ" গ্রন্থে ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমা বিশেষজ্ঞ এবং মুসলিম বিশ্বে তাদের প্রতিপক্ষের কতিপয় মৌলিক ধারণা চ্যালেঞ্জ করে ইসলামের শিক্ষণীয় প্রাথমিক যুগ সম্পর্কে গবেষণায় নতুন ও মূল্যবান অবদান রেখেছেন।

অধ্যাপক হিসেবে আল উমরী তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, পশ্চিমা ইতিহাস বিশেষজ্ঞগণ ইসলামের ইতিহাস বিশ্লেষণের পদ্ধতি বিশেষ করে প্রাথমিক যুগ সম্পর্কে এখনও বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন। সাধারণভাবে সত্যানুসন্ধানের লক্ষ্যে বস্তুনিষ্ঠতার উচ্চতম মান সমুন্নত রাখার পশ্চিমা ঐতিহাসিক ঐতিহ্য সত্ত্বেও ইসলামের প্রাথমিক যুগ সম্পর্কে তাদের আচরণের ক্ষেত্রে অতীতের অন্যান্য ধর্মীয় ঐতিহ্য, বিশেষ করে ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মের ব্যাপারে তাদের আবিষ্কৃত সন্দেহজনক ঘটনাবলীর দ্বারা তাদের প্রভাবান্বিত হওয়ার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এরসাথে যোগ হয়েছে ইসলামী দুনিয়া ও ইউরোপের মধ্যকার দীর্ঘদিনের তিক্ত সম্পর্ক এবং অনেক বিশেষজ্ঞের ব্যক্তিগত পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। এসব কারণে অন্য যেকোন অপশ্চিমা ইতিহাসের ক্ষেত্রে পশ্চিমা গবেষণার তুলনায় ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাদের আলোচনা অনেক নিম্নমানের। এসব প্রতিবন্ধকতা ছাড়াও ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমা বিশেষজ্ঞদের আচরণের আরেকটি অদ্ভুত দিক হল নতুন কিছু উদ্ভাবন এবং যেকোন নতুন ফলাফলই উত্তম; তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিও স্বীকৃত ধ্যানধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ইসলামের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও অবাস্তব। কল্পনাপ্রসূত ধারণাকে রূপদানে তাদের চেষ্টায় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে, যা তাদের বিশেষজ্ঞ বিশেষণের সঙ্গে মোটেই মানানসই নয়।

মহানবী (সা.) মদীনার জীবন সম্পর্কে পশ্চিমা বিশেষজ্ঞদের উঁচুমানের কোন রচনা যে একেবারেই নেই, আমরা সেকথা বলছি না। তবে সাধারণতঃ তাদের শ্রেষ্ঠ রচনাতেও দুটি পূর্বধারণার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়, যা মুসলমানদের দৃষ্টিকোণ থেকে কেবল অসঙ্গতিপূর্ণই নয়, উপরন্তু তাদের পান্ডিত্য সম্পর্কে সন্দেহাতীত সংশয়ের উদ্রেক করে।

প্রথমতঃ তারা সকল ঐতিহাসিক ঘটনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বস্তুগত লক্ষ্য অর্জনের দিক সংযোজনের চেষ্টা করেছেন। তাদের এই মানসিকতায় ঐতিহাসিক সত্যের চেয়ে আদর্শিক দৃষ্টিকোণই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অন্যান্য এলাকা

www.pathagar.com

ও যুগের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চিমাদের মানসিকতার চেয়ে যে সম্পূর্ণ ভিন্নতর, সেটিকে তারা উপেক্ষা করে গেছেন। আর একারণেই তারা ইসলামের প্রাথমিক যুগের সামরিক বিজয়কে (ফুতুহা) গণিমতের মালের লোভে পরিচালিত লড়াই বলে অভিহিত করেছেন। গণিমতের মাল লাভের আকাঙ্ক্ষায় নিঃসন্দেহে এর পিছনে কারণ ছিল, কোরআনে যার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু গণিমতের মাল লাভ করাকে প্রাথমিক উদ্দেশ্য হিসেবে প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে ইসলামে বর্ণিত "সমগ্র জমীনে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা"[১] লক্ষ্যের গুরুত্বকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। উমাইয়া খলিফাদের আমলে আগ্রহী মুজাহিদদের নিয়ে গঠিত সেনাবাহিনীকে একের পর এক নিঃসম্পদ ও গণিমতের মালের সম্ভাবনাহীন কাবুলিস্তানের মতো উষর পার্বত্য এলাকায় অভিযানে প্রেরণের ঘটনাবলীতে বস্তুগত লাভের আকাঙ্ক্ষা নয়, আল্লাহর পথে জিহাদে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের স্বাভাবিক চেতনারই প্রতিফলন ঘটেছে।[২]

অধিকাংশ পশ্চিমা বিশেষজ্ঞ এবং মুসলমানদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের বিষয়টি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি ঐতিহাসিক ঘটনার উদ্দেশ্য সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে নয়, ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তা হল প্রথমত হাদীসের বিশুদ্ধতা এবং দ্বিতীয়তঃ ঐতিহাসিক সূত্র হিসেবে এর মানদন্ড সম্পর্কে বিরোধ।

এই বিরোধ রাসূলের (সা.) মদীনার জীবনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা অধিকাংশ হাদীস এই যুগ সম্পর্কিত।

হাদীসসমূহ বিলম্বে লিখিত হওয়া এবং দীর্ঘ সময় ধরে মৌখিকভাবে বর্ণিত হতে থাকার কারণে পশ্চিমা বিশেষজ্ঞগণ পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত বলে হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করার চেষ্ট করেছেন।[৩] এর মাধ্যমে তারা মধ্যযুগে হাদীসের যথার্থতা প্রতিপন্ন করার জন্য অনুসৃত প্রাথমিক যুগের হাদীসবেত্তাগণের প্রতিষ্ঠিত বিচারের মাপকাঠি সমালোচনা পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। একথা সত্য যে, হাদীস বিশেষজ্ঞগণ তাদের গবেষণায় সহায়ক হিসেবে আধুনিক প্রযুক্তি সুবিধা প্রয়োগের সুযোগ পাননি, তা সত্ত্বেও তাদের গবেষণার ফলাফলকে প্রত্যাখ্যান করা অত্যন্ত ভ্রান্তিকর হবে, কারণ তারা একটি কঠোর মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করে হাদীসের বিশাল ভান্ডার থেকে চালুনীর ন্যায় ছেকে ছেকে সহীহ হাদীসসমূহ আলাদা করেছেন।

বস্তুতঃ হাদীস সমালোচনার ক্ষেত্রে মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ যে পদ্ধতি অনুসরণ করেন তার অনেক পরে পাশ্চাত্যে ইতিহাস সমালোচনায় অনুরূপ পদ্ধতির বিকাশ ঘটে; উভয় পদ্ধতির লক্ষ্য কিন্তু একই ঃ সত্যের সন্ধান। হাদীসের নির্ভরযোগ্য সূত্র নির্ণয়ের ক্ষমতার কারণে প্রথম দৃষ্টিতেই মুসলমানদের বুনিয়াদ হিসেবে তাকে গ্রহণ করা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। বর্তমানে পশ্চিমা ইতিহাস জীবনীকারগণ Herodotus,

www.pathagar.com

Thucydides অথবা Tacitus এর সত্যতা যাচাই করার জন্য অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। মুসলিম বিশেষজ্ঞদের কিছু কিছু ভুলত্রুটি থাকা বিচিত্র নয় আর সেকারণে তাদের পদ্ধতিকে মূল্যহীন বা ঠাট্টার বিষয় বলে মনে করার কোন কারণ নেই। তৎসত্ত্বেও কোন বিশেষ দৃষ্টান্ত পরীক্ষার ক্ষেত্রে সবসময়ই তা সূক্ষ্মভাবে যাচাই করা হয়েছে, আর এই প্রক্রিয়ায় কুখ্যাত সাইফ ইবনে উমার আল উসাইয়িদীর জালিয়াতির বিষয় Wellhausen ও তার অনেক পশ্চিমা উত্তরসূরী যথার্থই নিন্দা করেছেন। তার বিবরণের প্রকৃতিতে স্পষ্টত সুন্নী বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠা সত্ত্বেও কয়েক শতাব্দী আগেই মধ্য যুগের মুসলমানগণ অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তার নিন্দা করেন।[৪]

ছ'খানি সহীহ হাদীসের কিতাব– বিশেষ করে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুসলমানদের গভীর বিশ্বাস রয়েছে। চূড়ান্ত যথার্থতা সম্পর্কে যে যাই ভাবুক না কেন হাদীস সংকলনগুলো রাসূলের (সা.) সীরাত সম্পর্কে সকল "ঐতিহাসিক" উৎসের চেয়ে পুরানো অথবা অপেক্ষাকৃত পুরানো। সবচেয়ে প্রাচীন পাঁচখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থের রচনাকাল হল, আল ওয়াকিদী (হিঃ ২০৭/৮২৩), ইবনে তোমান হিশাম (হিঃ ২১৮/৮৩৪), ইবনে সা'দ (হিঃ ২৩০/৮৪৫), আল বালাদুরী (হিঃ ২৭৯/৮৯২) আল তাবারী (হিঃ ৩১১/৯২৩)।[৫]

এই ইতিহাস গ্রন্থগুলো রচনার সময়ে বুখারী শরীফ (হিঃ ২৫৬/৮৭০) মুসলিম শরীফ (হিঃ ২৬১/৮৭৫) সংকলিত করা হয়। ইমাম মালিক (হিঃ ১৭৯/৭৯৪) এবং ইবনে হাম্বলের (হিঃ ২৪১/৮৫৫) মতো অনেকে এরও আগে হাদীস সংকলিত করেন।

বস্তুতপক্ষে ইতিহাসের সূত্র হিসেবে হাদীস অধিকতর তত্ত্বনির্ভর এই অজুহাত দেখিয়ে ইতিহাস গ্রন্থ ও হাদীসের কিতাবের মধ্যে ব্যবধান করা যাবে কি-না সে সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ রয়েছে, কেননা উভয় প্রকার গ্রন্থের প্রণেতাগণ একই শ্রেণীর বিশেষজ্ঞগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উপরন্তু বর্ণনাকারীদের ধারাক্রমে পরীক্ষার মাধ্যমে ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনায় যথার্থতার প্রতি হাদীসের কিতাবসমূহ অপেক্ষাকৃত অধিক যত্নশীল। ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত থাকার নিশ্চয়তা না থাকলেও বিবেচনা ও মূল্যায়নযোগ্য ইতিহাস সূত্রের মধ্যে হাদীসের একটি স্থান অবশ্যই থাকা উচিত। প্রকৃতপক্ষে উত্তম ও পূর্ণ সনদসহ বিবরণসমূহ প্রথমে বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত হবে কেননা এগুলো সুস্পষ্ট এবং অতিসহজে এর সূত্র যাচাই করা সম্ভব।

আনন্দের বিষয় যে, অধ্যাপক আল উমরী রাসূলের (সা.) সময়ের ঐতিহাসিক

www.pathagar.com

সূত্র হিসেবে হাদীসকে যথার্থ স্থান দিয়ে সীরাত অধ্যয়নের ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। মধ্যযুগের মুসলমানদের উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আল উমরী বর্ণনার ধারাক্রমের উৎকর্ষ তুলে ধরে প্রত্যেক ঘটনা সম্পর্কে প্রতিটি বিবরণের বিশ্বাসযোগ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের উপর নির্ভর করে তিনি এই কাজ সম্পাদন করেন। এই দু'টি কিতাব সাধারণভাবে সহীহ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। সহীহ বুখারীর একটি বিরাট অংশ বিশেষ করে মাগাজী সম্পর্কিত হাদীসমূহের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া আল উমরী অন্যান্য হাদীস সংকলন এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রও তুলে ধরেছেন। বিবরণের উচ্চমান নির্ণয়ের জন্য তিনি বর্ণনাকারীদের মান নির্ণয়ের মধ্যযুগীয় গ্রন্থ-কিতাবুল রিজালের শরণাপন্ন হয়েছেন এবং তার নিজস্ব অভিমত সম্পর্কে বার বার বিস্তারিত পাদটীকা প্রদান করেছেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি ঘটনার সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য সংস্করণ সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

আল উমরীর রচনা দুটি খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডের উপ-শিরোনাম "জিহাদ এগেইন্স্ট মুশরিকীন" (মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ)। এই খন্ডের পুরো অংশ জুড়ে রাসূলের (সা.) সামরিক অভিযানের (মাগাজী) বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এই খন্ডে সামরিক অভিযানের ওপর ভিত্তি করে প্রাথমিক যুগের সীরাত বিশেষজ্ঞগণের নিরূপিত কালানুক্রম অনুযায়ী রাসূলের (সা.) মদীনার জীবনের অধিকাংশ রাজনৈতিক ঘটনাও স্থান পেয়েছে।

ঐতিহাসিক পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি অধ্যায়ে লেখক হাদীস সমালোচনার ইসলামী ঐতিহ্যের সঙ্গে পশ্চিমা আদর্শের আধুনিক রীতির সমালোচনামূলক পদ্ধতির একটা সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছেন। এক অধ্যায় পরে আল উমরী ইসলামের জিহাদের মূলনীতির তাৎপর্য তুলে ধরে প্রত্যেক অভিযান সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিবরণের যথার্থতা মূল্যায়ন করে প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ ইসলামী আইন বা বিধি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারও বর্ণনা দিয়েছেন। এই খন্ডে কেবলমাত্র আরব বেদুইন ও বাইজেন্টাইনের বিরুদ্ধে অভিযানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ইহুদীদের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রসঙ্গ দ্বিতীয় খন্ডে স্থান পেয়েছে।

www.pathagar.com

"The Madinan Society at the Time the of Prophet"-এর দ্বিতীয় খন্ডের সুগঠিত অধ্যায়সমূহে বিচিত্র প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। প্রথম দু'টি অধ্যায়ে সীরাত ও হাদীস বিবেচনার সর্বোত্তম ঐতিহাসিক পদ্ধতি কি হবে তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। আল উমরী ইতিহাস বিশ্লেষণে হাদীস সমালোচনার মূলনীতি প্রয়োগ করার সাথে সাথে একথাও স্বীকার করেন যে, এই নীতি প্রয়োগে নমনীয়তা অবলম্বন করতে হবে, কেননা, ঘটনার কাল পুনর্গঠন করার জন্য কেবল সহীহ ও হাসান হাদীস যথেষ্ট নয়। আল উমরীর মতে ঘটনা প্রবাহের ক্ষেত্রে দুর্বল বর্ণনা থাকতে পারে এবং শরিয়ত ও আহকামের প্রসঙ্গ আসার পূর্ব পর্যন্ত এগুলো গ্রাহ্য হতে পারে তবে সেক্ষেত্রে সহীহ ও হাসান হাদীস সমূহই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে। সহীহ রেওয়াতের অভাব ও দুর্বল বর্ণনার কারণে সীরাতের কতিপয় ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে মতদ্বৈধতার সৃষ্টি হয়েছে। একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে আল উমরী ব্যাপক কৌতূহল প্রকাশ করে ঘটনা বিশ্লেষণে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিন্যাস করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে কোন ঘটনা সম্পর্কে সুবিদিত অভিমতের চেয়ে ভিন্নতর অভিমত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ কিভাবে বস্তুনিষ্ঠতা ও পান্ডিত্যের উচ্চমান অর্জনে সক্ষম হবেন তার রচনায় তারও সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে।

দ্বিতীয় খন্ডের মধ্যবর্তী অধ্যায়সমূহে (৩য়-১০ম) মদীনায় মুসলমানদের মৌলিক রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কতিপয় বিশেষ বিষয়েরও নিষ্পত্তি করা হয়েছে, তাহলো পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব (মুয়াখাহ), মসজিদে অবস্থানকারী গরীব মুসলমানগণ (আহল আল সুফফাহ) এবং সাধারণভাবে মদীনার সনদ বলে পরিচিত দলিল। আল উমরীর রচনার এই নিবন্ধগুলো সর্বোৎকৃষ্ট। মুয়াখাহ সম্পর্কে আলোচনার সময় তিনি দেখিয়েছেন যে, মক্কা শরীফ থেকে আগত মুহাজির এবং মদীনা মনোয়ারার বাসিন্দা আনসারদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলাই ছিল এর উদ্দেশ্য, আর সেকারণেই রাসূল (সা.) ও আলী (রাঃ) এর মধ্যে কথিত পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন হিজরতের সময় স্থাপিত হয়নি, যদিও বিখ্যাত সূত্রে এই বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। আহল আল সুফফাহ প্রসঙ্গ আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি তাদের মধ্যকার সম্পূর্ণ অপরিচিত কয়েকজনের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আবু নূয়াইমের (হিঃ ৪৩০/১০৩৯) হিলায়াত আল আওলিয়া গ্রন্থে উল্লিখিত বিস্তারিত তালিকা ব্যবহার করেন। আহল আল সুফফাহ পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত বলে প্রাচ্যবিদদের অভিযোগ খন্ডন করাই হলো এর

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য।[৬] লেখক মদীনার সনদ আলোচনা করে ইহুদীদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি এবং মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেছেন।

শেষ দুটি অধ্যায়ের (১১শ-১২শ) আল উমরী ইহুদীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানের বিষয় বর্ণনা করেছেন। এই অভিযানের ফলে মদীনা থেকে ইহুদীদের বহিষ্কারের পথ প্রশস্ত হয়। তিনি এসব ঘটনা আলোচনায় প্রচলিত রীতি অনুসরণ করেছেন। বনু কায়নুকাকে বহিষ্কারের বিষয় অস্বীকার করার সাম্প্রতিক চেষ্টাকে তিনি গ্রহণ করেননি। এছাড়া বনু কুরায়জার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার ঘটনাকেও তিনি অস্বীকার করেননি।[৭]

আল উমরীর রচনার অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে সূত্রের বহুল প্রয়োগ। তার বিবরণ ও পাদটীকায় ইতোপূর্বে উল্লিখিত আদর্শ "ঐতিহাসিক" সীরাত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও অসংখ্য রচনার পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি মদীনার যুগের ইতিহাস বর্ণনা করার জন্য যেখানেই সম্ভব সেখানেই কোরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। অতি মূল্যবান তথ্যের আধার হাদীস শাস্ত্রে তার অগাধ জ্ঞান এবং বর্তমানে বিলুপ্ত অন্যান্য গ্রন্থের উদ্ধৃতি তার গ্রন্থকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। ইবনে হাজর আল আসকালানীর বিশাল রচনা 'ফতহুল বারী"-এর ক্ষেত্রে এই বিষয়টি অধিকতর প্রযোজ্য। আল উমরী বার বার এই গ্রন্থের উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। তাছাড়া তিনি ইবনে কাসির এবং খুবই প্রথম দিকের বিখ্যাত খলিফা ইবনে খাইয়াত (হিঃ ২৪০/৮৫৪) এর মতো উপেক্ষিত ঐতিহাসিক সূত্রগুলো প্রায়ই প্রচুর পরিমাণে কাজে লাগিয়েছেন। আল উমরী আল ওয়াকিদীর কতিপয় দুর্বল দিকের আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও তার রচনায় কিংবদন্তির অনেক উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দৃশ্যত রচনার কলেবর বৃদ্ধির জন্য তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করেছেন বলে আভাস পাওয়া গেছে। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, আল ওয়াকিদীর ছাত্র ইবনে সা'দ তার উস্তাদের ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তিনি তা পরিহার করার চেষ্টা করেছেন।

পাঠকবর্গ আল উমরীর রচনা থেকে উপকৃত হতে পারবেন। এতে হাদীস সমালোচনার স্বীকৃতি মূলনীতি অনুসারে রাসূলুল্লাহর (সা.) মদীনার যুগের লক্ষ্যকে সুস্পষ্ট করার একটা সযত্ন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক যুগের মুসলমানরা এই লক্ষ্যকে সত্য ও নির্ভুল বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। আল উমরী মধ্যযুগের মুসলিম বিশেষজ্ঞদের নিরূপিত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অথবা

www.pathagar.com

সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বিবরণ নির্বাচন তাদের অতীব উন্নত ও বিশুদ্ধ বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে অধিকতর সঠিক ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেছেন। ইংরেজী ভাষায় আর কোন রচনায় এই বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। মধ্যযুগের আরবী ভাষায় রচিত বহু সীরাত গ্রন্থে সত্য উদঘাটনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে, তাতে সাধারণত শক্তিশালী ও দুর্বল রীতির মিশ্রণ ঘটেছে। আল উমরী তার মন্তব্যে সেসব রচনার কথা ব্যাপকভাবে উল্লেখ করেছেন। সীরাত রচনার প্রচলিত রীতির মূল স্রোতধারার অনুসরণে আর উমরী একটি সার্বিক চিত্র অংকন করলেও পাঠকবর্গ দেখতে পাবেন যে, লেখক ঘটনা সম্পর্কে সম্ভব সবচেয়ে শক্তিশালী ও বিশুদ্ধতম বর্ণনা তুলে ধরার লক্ষ্যে দুর্বল বর্ণনা পরিহার অথবা তা টীকার বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ রাখার মাধ্যমে ঘটনাসমূহ সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেছেন।

খালিদ ইয়াহিয়া ব্লাঙ্কিনশিপ
সেটল, ওয়াশিংটন
২৪ রবিউল আওয়াল
১৪০৯/৩রা নভেম্বর ১৯৯৩

তথ্যসূত্র ঃ

১. কুরআন, ২ঃ১৯৩, ৮ঃ৩৯।

২. ফুতুহ আল বুলদান, আহমদ বি জাবির আল বালাদুরী, কায়রোঃ দার আল নাহদাহ আল মিসরিয়া ১৯৫৬-৭, পৃষ্ঠা ৪৯০-৩।

৩. Ignaz Goldzeher, Muslim Studies, tr. C.R. and S.M. Stern, London : Gorge Allen and Unwin, ১৯৭১, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ১৮-৯ এবং Passim: J. Schact. The Orgin of Muhammadan Jurisprudence, Oxford. Clarendon Press, ১৯৫০, পৃষ্ঠা ৪-৫

৪. J. Wellhausen, "Prelegomena zur altesten Geschichte des Islams" Skizzen and Vorabeiten, Berlin, ১৮৯৯, ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩-৭; L. Caetani, Annalidell Islam. Milan, ১৯০৫-২৪, ২/১ খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৫০-১, ৫৫৩-৪, ৬৮৪-৫ ইত্যাদি। C. Brockelmann. Geschichte der Arebischen Litteretur. Leiden : Brill. ১৯৩৭ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২১৩-৪, Erling L. Petersen, Ali and Muawiyah in early Arabic Tradition, Odense: University Press- ১৯৬৪ পৃষ্ঠা, ৭৮-৮২, ১৫০-

www.pathagar.com

৩; আবু মুহাম্মদ আব্দুর রহমান ইবনে আবিহাতিম আল রাজী (৩২৭ হিঃ/৯৩৯ খৃঃ) আল জারহা আল তাদিল, হায়দ্রাবাদ, ভারত; দায়রাত আল মা'রিফ আল উসমানিয়া, ১৩৭২/১৯৫২ ২/১ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৭৮; মুহাম্মদ বি হিব্বান (৩৫৪/৯৬৫), আল মাজরুহিন মিন আল মুহাদ্দিসীন ওয়াল জয়াফা ওয়াল মাতরুকিন, মাহমুদ ইব্রাহীম জায়েদ সম্পাদিত, হালাব; দার আল ওয়াই (তারিখ বিহীন) প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা, ৩৪৫; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আল দাহাবী (৭৪৮/১৩৪৭), মিজান আল ইতিদাল ফি নাক্দ আল রিজাল, আলী মুহাম্মদ আল বাজাবী সম্পাদিত, কায়রোঃ ইসা আলা বাবি আল হালাবী, (তারিখ বিহীন) ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা, ২২৫; আহমদ বিন আলী ইবনে হাজর আল আসকালানী (৮৫২/১৪৪৮), তাহজিব আল তাহজিব, হায়দ্রাবাদ, ভারতঃ দায়রাত আল মা'রিফ আল উসমানিয়া, (তারিখ বিহীন), ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা, ২৯৫।

৫. ১৯৭৭ সালে J.MB. Marsden Jones ব্যক্তিগতভাবে আমাকে এই অভিমত জানান।

৬. দেখুন EI^2-এ watt- এর নিবন্ধ, আহল আল সুফফাহ

৭. এই প্রসঙ্গে বিশেষকরে বরকত আহমদের Muhammad and the Jews: A Re-examination নয়া দিল্লী, ভাইকস পাবলিসিং হাউস প্রাঃ লিঃ ১৯৭৯। আল উমরী অবশ্য তার কথা উল্লেখ করেননি। বরকত আহমদও আল উমরীর অনুরূপ ইসলামী ঐতিহাসিক রীতি অনুসরণ করেন, (দেখুন আহমদ, পৃষ্ঠা ৫)।

www.pathagar.com

লেখকের কথা

আল হামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য। দূরুদ ও সালাম শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কেরাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানানোর জন্য তার ডাকে সাড়া দেবেন তাদের প্রতি।

আমি দীর্ঘ সময় ধরে এই গবেষণা গ্রন্থখানি রচনা করেছি এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তা পর্যালোচনা করেছি। আমি ঐতিহাসিক বিবরণের ক্ষেত্রে হাদীসবেত্তাগণের সমালোচনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছি এবং আমার বিশ্বাস, আল্লাহর রহমতে এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়েছে। অবশ্য মহানবীর সীরাতের সকল অধ্যায় এবং প্রাথমিক যুগের খলিফাগণের (রাঃ) সময়কাল সকল ঘটনার পূর্ণাঙ্গ চিত্র তার সঠিক প্রেক্ষাপটে অংকনের জন্য সুদীর্ঘ সময় সবাই কঠোর প্রচেষ্টার প্রয়োজন। আমি আশা করছি যে, শিগগিরই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবেন এবং ইতিহাসের গবেষক ও ছাত্ররা এই গবেষণা গ্রন্থখানি আলোচনা পর্যালোচনা এবং সমালোচনার দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করবেন। তাদের সমালোচনা থেকে আমরা উপকৃত হতে পারবো কারণ সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনায় সমালোচনামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা সবেমাত্র হাদীসবেত্তাগণের সমালোচনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ শুরু করেছি। এটি একটি কঠিন কাজ। এজন্য একদিকে যেমন হাদীস শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষমতা আবশ্যক তেমনি অন্যদিকে ঐতিহাসিক বর্ণনা বিচার ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে নমনীয়তা অবলম্বন প্রয়োজন। আমি পোষ্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ বিভাগে মাষ্টার ও পিএইচডি উভয় শ্রেণীর বেশ কয়েকটি থিসিস-এর নির্দেশনা দান ও তদারকির দায়িত্ব পালন করেছি। এতে হাদীসের কিতাব, মাগাজী (সামরিক অভিযান) এবং সীরাত গ্রন্থে বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সমালোচনামূলক গবেষণা স্থান পেয়েছে। এই গবেষণার লক্ষ্য ছিল, রাসূলের জীবন সম্পর্কে আমাদের কাছে যেসব তথ্য রয়েছে তা যাচাই করা। থিসিসের কয়েকখানি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং অন্যগুলোর উপর এখনো গবেষণা চলছে।

www.pathagar.com

মদীনা মনোয়ারার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের উদ্যোগে ছয় বছর ধরে এই গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। আমার মতে, এই গবেষণার ফলে সীরাত সম্পর্কে প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনায় এযাবতকালের মধ্যে সবচেয়ে বড় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। যে কোন অগ্রণী প্রচেষ্টা সাধারণত যে ধরনের কঠিন বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়ে থাকে এক্ষেত্রে তেমনটি হয়নি। আমি আশাবাদী যে, আমরা এই প্রকল্পের আরো উন্নতি বিধান করতে সক্ষম হবো যাতে ঐতিহাসিক ঘটনার পূর্ণাঙ্গ দলিলসহ সীরাতের সকল দিক সম্পূর্ণ নতুনভাবে লিখিত হবে এবং তাতে ইসলামী দৃষ্টিকোণ ও এর অনন্য বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণ স্বীকৃতি থাকবে।

আল্লাহতায়ালা সকল উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং তিনি সঠিক পথের একমাত্র হেদায়েতদাতা।

ডঃ আকরাম জিয়া আল উমরী

www.pathagar.com

ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস রচনার পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রস্তাবনা

মুসলিম বিশেষজ্ঞগণকে যেসব সমস্যার মোকাবেলা করতে হচ্ছে ইসলামের ইতিহাস পুনঃলিখন নিঃসন্দেহে তার মধ্যে অন্যতম। ১৯৬০ এর দশক থেকে তারা এবিষয়টির প্রতি মনোযোগ দিয়ে আসছেন। এই বিশেষজ্ঞগণের মতে ইসলামী দৃষ্টিকোণ ও ইতিহাস বিশ্লেষণ পদ্ধতির আলোকে এই সংশোধনী ও পুনঃরচনা কর্ম সম্পাদিত হওয়া উচিত। এছাড়া ইসলামী ইতিহাস গবেষণা অবশ্যই হাদীস বিশেষজ্ঞ, মুহাদ্দিসগণের পদ্ধতি অনুসারে হতে হবে। চৌদ্দশত বছর পার হয়ে যাবার পর ইসলামী ইতিহাস পুনঃরচনা সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ যে অত্যন্ত দূরূহ কাজ তাতে সন্দেহ নেই। কারণ একদিকে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে অন্যদিকে এর উৎসের বহুমুখিতা। বিভিন্ন সূত্রের বিন্যাস পদ্ধতি এবং কোন বিশেষ যুগের ঘটনাবলী প্রকাশে বৈচিত্রের কারণে এই বহুমুখিতা দেখা দিয়েছে। প্রাথমিক কালে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিকৃতি এই কঠিন অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলেছে। পরবর্তীতে এই বিকৃতি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষার মতো অন্যান্য ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে, আর বিংশ শতাব্দীতে এসে এই বিকৃতি মারাত্মক রূপ ধারণ করে আমাদের মৌলিক ঈমান, আকিদা-বিশ্বাস ও শরয়ী বিষয়সমূহকে আক্রান্ত করেছে। এসব ইসলামী ইতিহাস আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে।

একারণে আমি এই রচনাকে ইসলামের প্রাথমিক যুগের বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি। এযুগ রাসূল (সা.) এবং সঠিক পথের অনুসারী খলিফাগণের (রাঃ) সময়ের সমন্বয়ে গঠিত। এযুগে মুসলমানদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য রূপায়ণে ঈমানের প্রভাবের উৎকর্ষ সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। আমাদের মূল সূত্রসমূহে হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে যাতে হাদীস বিশেষজ্ঞগণের রীতি অনুযায়ী বর্ণনাকারীদের পরিচয় বিবৃতির মাধ্যমে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এযুগে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আদর্শ সঠিকভাবে বাস্তবে রূপলাভ করেছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগ হচ্ছে ইসলামী আদর্শের আদর্শ নমুনা, যার সঙ্গে আমরা আমাদের সমসাময়িক ইসলামী সমাজের তুলনা করে থাকি। এই গ্রন্থে আমি ইতিহাস বিশ্লেষণ সম্পর্কিত ইসলামী

www.pathagar.com

প্রেক্ষিতের কতিপয় বৈশিষ্ট্যও তুলে ধরারও চেষ্টা করেছি। অতঃপর আমি মুস্তালা আল-হাদীস এর নীতি অনুযায়ী ইতিহাস গবেষণার পদ্ধতি কিরূপ হবে সেসম্পর্কে আলোচনা করছি। এরপরে মুসলিম বিশেষজ্ঞদের দ্বারা ইসলামী ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তার বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। অন্যান্য জাতির ইতিহাস সেসব জাতির লোকেরাই রচনা করেছেন। অন্যরা সেক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারেন। তাই ইসলামী ইতিহাস রচনার দায়িত্ব আমাদের, মুসলমানদেরকেই পালন করতে হবে। আমাদেরকে নিজেদের সভ্যতা আদর্শ ও মূল্যবোধের সঙ্গে এর সঠিক উপলব্ধি অনুযায়ী অবশ্যই সুপরিচিত থাকতে হবে। বাইরে লোকেরা কিছু কিছু অবদান রাখতে পারেন কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের সুযোগ সীমিত এবং তা আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা অর্জনের প্রধান অবলম্বন বিবেচিত হতে পারেনা, না তা বিশ্বের সামনে আমাদের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার তুলে ধরার একমাত্র উপায় হিসেবে গণ্য হতে পারে।

কিন্তু বাস্তব অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে সভ্যতার পশ্চাৎপদ অবস্থার কারণে নিজেদের ইতিহাস মূল্যায়ন, বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপন এবং রচনার ক্ষেত্রে তার অসামর্থ্যের বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস গবেষণায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বৃহত্তর অংশ প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। প্রথম শ্রেণীভুক্ত লোকেরা তাদের ইসলামী উত্তরাধিকারকে ঘৃণার চোখে দেখেন এবং তাদের ধারণা, এই কারণেই মুসলিম বিশ্বে সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা বিরাজ করছে। তারা ফিলিস্তিনে ইহুদীদের হাতে বার বার পরাজয়ের জন্যও এই উত্তরাধিকারকে দায়ী করে থাকেন। এই শ্রেণীর ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে একটা যবনিকা স্থাপন করা জরুরী এবং নতুন বংশধরদেরকে ইসলামের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে এর ঐতিহ্য ও সভ্যতার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছেন নিষ্ক্রিয় পেশাজীবী ঐতিহাসিক নিবন্ধকারগণ। তারা মূলত প্রাচ্যবিদদের অনূদিত রচনার উপর নির্ভর করে কল্পনাশক্তিহীন গ্রন্থ রচনা করেন। এসব রচনায় তাদের বিশ্লেষণী প্রচেষ্টা এবং মূলসূত্রের আলোকে তা যাচাই করার কোন বাস্তবসম্মত ও পরিশ্রমী প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। এসব রচনায় তাদের নিজস্ব ধ্যানধারণার কোন প্রতিফলন থাকেনা। প্রাচ্যবিদরা তাদের রচনার মাধ্যমে ইসলামী সমাজে কোন অনিষ্টকর ধ্যানধারণা প্রবিষ্ট করাচ্ছে কিনা সেসম্পর্কেও তারা সম্পূর্ণ বেখবর।

মুসলিম বিশ্বে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনে দুর্বলতা এবং বিশ্ব চিন্তাধারার অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার এগিয়ে চলার অসামর্থ্যের কারণে ইতিহাস উপেক্ষার

www.pathagar.com

এপরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছে। এর মূলে রয়েছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্য, ইউরোপীয় রেনেসাঁর সময় থেকে যা চলে আসছে। গোটা উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে কোন মুসলিম বিশেষজ্ঞের রচিত অধিকাংশ ইতিহাস গ্রন্থে প্রাচ্যবিদদের রচনার প্রতিফলন ঘটেছে যাতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যানধারণা হুবহু বিবৃত হয়েছে।

ইসলামের যেসব একনিষ্ঠ অনুসারী ঈমান ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে মুসলমানদের নতুন বংশধরদের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন তাদেরকেই ইসলামী ইতিহাস রচনার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, কারণ একমাত্র তারাই ইসলামী ইতিহাস ও ইসলামী সমাজের সঠিক পরিচয় ও ধ্যানধারণা যথাযথভাবে তুলে ধরতে সক্ষম। তারা এমন ব্যক্তিবর্গ, যারা যথার্থ ঈমানী মাধুর্য নিজেদের জীবনে উপলব্ধি করেছেন এবং আপন জীবনাচরণে তার প্রভাবের বাস্তব অভিজ্ঞতার সোনালী স্পর্শ লাভ করেছেন। তারা নিষ্ঠাবান মুসলমানদের কর্মতৎপরতার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং সত্যিকার ইসলামী সমাজের গতিপ্রকৃতি অনুধাবনের ক্ষেত্রে সকলের চেয়ে অগ্রগামী আর সেকারণে তারাই ইসলামী ইতিহাস অনুধাবনে অধিকতর যোগ্য।

মহাবিশ্ব, জীবন ও মানুষ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতিহাসের ইসলামী বিশ্লেষণের সূত্রপাত হয়েছে এবং তা আল্লাহ তায়ালা, তাঁর কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, পরকাল ও শেষ পরিণতি এবং আল্লাহর মর্জিতে ভালমন্দ সবকিছুই হয়, এই দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তির উপর স্থাপিত। তাই ইসলামী ইতিহাস বিশ্লেষণ ইসলামী পরিসীমা বহির্ভূত নয় বরং মদীনা মনোয়ারায় প্রথম ইসলামী সমাজে মানব আচরণের উদ্দেশ্য ও অনুপ্রেরণার পরম উৎকর্ষের যে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল তার উপর ভিত্তি করে তা বিনির্মিত হয়েছে। ইসলামী ইতিহাসের গতিপ্রকৃতির এই অনন্য বৈশিষ্ট্য তাকে বিশ্বের সার্বজনীন ইতিহাস থেকে ভিন্নতা প্রদান করেছে। কারণ ইসলামী ইতিহাসের উপর মহান আল্লাহর বাণীর অপরিসীম প্রভাব ক্রিয়াশীল রয়েছে। ইসলামী ইতিহাসে অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে সত্যিকার ঈমানী চেতনা অধিকতর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যা এই ইতহাসকে বিশিষ্টতা দান করেছে। ইসলামী ইতিহাস বিশ্লেষণ কোন বস্তুবাদী বিশ্লেষণ নয়, যাতে উৎপাদনের উপকরণ মানব ইতিহাসের গতিপ্রকৃতিকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণের একমাত্র চালিকা শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে, যেমন মার্ক্সবাদী ইতিহাস। ভৌত পরিবেশ, জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি, অর্থনীতি, ইত্যাদির মতো বাহ্য উপদানের প্রভাবের ফলে ইতিহাসের গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন হওয়ার ব্যাখ্যাও ইসলামী ইতিহাসের ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

প্রযোজ্য হতে পারে না। এসব হচ্ছে পশ্চিমা বস্তুবাদী ব্যাখ্যা। আর ইসলামী ব্যাখ্যায় মহান আল্লাহর বিধি-বিধানের সীমারেখার মধ্যে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিবর্তনে তার কার্যকর ভূমিকার কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইসলামী ইতিহাসের কোন বর্ণগত ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হতে পারেনা, যাতে কোন বিশেষ বর্ণ বা জাতির লোকদের ভূমিকাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। ইসলামী ইতিহাসে সত্যিকার অবদানের ভিত্তিতে সকল মুসলমানের ভূমিকার যথার্থ স্বীকৃতি বজায় থাকে। ইসলামী ইতিহাসকে সাম্প্রদায়িক ইতিহাস বলা যাবে না, যাতে কেবলমাত্র একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অগ্রগতির গুণকীর্তন করা হয়, যা ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত অনিষ্টকর।

এসব বিষয় সুস্পষ্ট করার জন্য আরও বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন কিন্তু এই গ্রন্থে সে সুযোগ নেই। আমি কতিপয় রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করবো এবং ভবিষ্যতে এব্যাপারে আলোচনার আশা করি।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাস বিশ্লেষণের ইসলামী বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন ঘটনা বিশ্লেষণ করে পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণাঃ মানব বিশ্বাসের মূলে রয়েছে তওহিদ, শিরক নয়।

হযরত আদম (আঃ) এর জামানা থেকেই তওহিদের বিধান প্রচলিত ছিল। এরপর উদ্ভব হয় শির্কের। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেনঃ "প্রথমে সব মানুষ একই পথের অনুসারী ছিল। (তারপর এ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকেনি, তাদের মধ্যে মতভেদের সূচনা হয়) তখন আল্লাহ নবী পাঠান। তাঁরা ছিলেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী"। (আল বাকারা ২ঃ২১৩)। অর্থাৎ সকল মানুষ একই জাতি (উম্মাহ) আর তাদের দ্বীন ছিল একমাত্র তওহিদ। পরে মানুষ যখন তওহিদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে দূরে সরে যায় তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পুনরায় তওহিদের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেন, পবিত্র কোরআনে যার বহু প্রমাণ রয়েছে। অথচ প্রাচীনকালের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই যে, অনেক মুসলমান ঐতিহাসিকের পরিবেশিত তথ্যও পবিত্র কোরআনের শিক্ষার পরিপন্থী। তারা বলেন, আদিম মানুষেরা জীবজন্তু, গাছপালা ও প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা করতো। তারপর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ফলে মানুষ তওহিদ বা একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে। এই বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ ফিরাউন আখেনাতনকে প্রাচীনতম একেশ্বরবাদী বলে গণ্য করেন। কারণ তিনি মিসরের সকল দেবতার আরাধনার পরিবর্তে একমাত্র সূর্যের পূজার প্রবক্তা ছিলেন। দু'টি কারণে এই প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেয়া হয়েছেঃ

১. প্রথমতঃ কিছু সংখ্যক মুসলমান ঐতিহাসিক ঐশীবাণী (ওহী) এবং নবুওতের অকাট্য সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের ধারণা, মানুষের সাধনায় বহু দেবতার উপাসনা থেকে এক আল্লাহর এবাদতের ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে, যা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারার বিকশিত হয়েছে।

২. দ্বিতীয়তঃ মুসলিম ঐতিহাসিকদের অনেকে ডারউইনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তারা ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তার প্রজাতির উৎপত্তি ও বিবর্তন তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন।

www.pathagar.com

মানবজাতির ইতিহাস সম্পর্কে কোরআনের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিত কি মুসলিম ঐতিহাসিককে অবশ্যই তা অনুধাবন করতে হবে এবং ইতিহাস রচনার সময় যথাযথভাবে তা প্রয়োগ করতে হবে। কোরআনের মূলনীতির পরিপন্থী কোন তত্ত্বের সম্মুখীন হলে তার কর্তব্য হবে সে মতবাদকে চ্যালেঞ্জ করা, কেননা তা নিছক তত্ত্বকথা, কোন প্রমাণিত সত্য নয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রাচীন ইতিহাসের অধিকাংশ মতবাদ গড়ে উঠেছে। এধরনের প্রচেষ্টায় যে যৎসামান্য তথ্য পাওয়া যায় তা প্রাচীন কালের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের বিপুল অভাব ও কৌতূহল পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়। যেখানে অমুসলিম ঐতিহাসিকের তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল ভিন্ন আর কিছু নেই সেখানে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ নিঃসন্দেহে পবিত্র কোরআনের উপর নির্ভর করতে পারেন। "অগ্র বা পশ্চাতের কোন মিথ্যা যাকে স্পর্শ করতে পারেনি" (ফুসসিলাত ৪১ঃ৪২)। পবিত্র কোরআন হচ্ছে একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা সবধরনের পরিবর্তন ও বিকৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রয়েছে। মুসলমানদের প্রতি এটা আল্লাহর এক অফুরন্ত রহমত যে তিনি স্বয়ং কোরআন মজিদকে হেফাজত করেছেন। কোরআন ঠিক যেভাবে নাজিল হয়েছিল প্রত্যেক যুগের মুসলমানগণ ঠিক সেভাবেই তা তেলাওয়াত করেন এবং তা যে "আল্লাহর বাণী" সে কথা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেন। এই নিঃসংশয় বিশ্বাস তাদের মন-মগজ, আচরণ ও চরিত্রের উপর এক সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়া তা সমাজ ও সভ্যতার প্রকৃতিকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মুসলিম উম্মাহ ছাড়া আর কোন জাতি কখনও আল্লাহর এরূপ রহমতে অভিষিক্ত হয়নি।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের আচরণের হাকিকত

ইসলামী সমাজে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও রীতিনীতি (ঈমান ও আকিদা) উভয়ই গভীরভাবে প্রোথিত থাকে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখেরাতে পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা তার কাজ ও আচরণের উদ্দেশ্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানের কাজে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য থাকে না। একজন মুসলমানকে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে তার সকল কাজ, সে জিহাদ হোক, হোক আত্মশুদ্ধি অথবা যেকোন ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। মুসলিম জিন্দেগীর সকল ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে

www.pathagar.com

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। একজন মুসলমান একথা ভাল করে জানেন যে, কোন কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ভিন্ন অন্যকিছু যুক্ত হলে তার সে কাজ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "একান্তভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্য ও তাঁর জন্য নিবেদিত না হলে আল্লাহ কোন কাজই গ্রহণ করবে– না।" আজও যদি অসংখ্য সচেতন মুসলমান এ চিন্তাধারা অনুযায়ী জীবযাপন করেন তাহলে সর্বযুগের শ্রেষ্ঠতম মানব মহানবীর (সা.) সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের উত্তরসূরী তাবেয়ীগণের জামানায় এর প্রভাব ছিল কত গভীর?

প্রাথমিক যুগে ইসলাম তার অনুসারীদের যে শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছে তার প্রভাব, তাদের আত্মশুদ্ধি, মানসিক উৎকর্ষ ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ঐকান্তিকতার সাথে সাথে এক আল্লাহর এবাদতের ভিতর দিয়ে একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আলফুতুহ (দেশজয়) নামে পরিচিত সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে কোন পার্থিব উচ্চালিভাষ জড়িত ছিলনা। বরং এসব ভূখন্ডে ইসলাম প্রচার-প্রসারের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, এর দৃঢ় ভিত্তিপ্রদান, নতুন বিজিত ভূখণ্ডকে সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করা, ইসলামের যথার্থ শিক্ষার আলোকে সেখানকার অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান এবং যেসব নতুন সমস্যা উদ্ভব ঘটতে পারে তা নিস্পত্তি করার আগ্রহই এক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল। Ceatani ও অন্যান্য প্রাচ্যবিদের মতানুযায়ী এতে এসব ভূখণ্ডের জনগণের উপর প্রাধান্য বিস্তার বা তাদের ধন-সম্পত্তি দখল করা অথবা মরুভূমির দুঃসহ জীবনের ক্লেশ থেকে নিষ্কৃতি লাভের কোন উদ্দেশ্য মুসলমানদের ছিলনা।

ইমাম আল তাবারী বর্ণনা করেন, রাবী ইবনে আমীর পারস্যের নেতা রুস্তমের শাহী দরবারে প্রবেশ করলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, " আপনি কি নিয়ে এখানে এসেছেন?" রাবী জবাব দিলেন, "আল্লাহ আমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ যাকে চান তাকে মানুষের দাসত্ব থেকে তার এবাদতের দিকে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা ও জুলুম থেকে পরকালের বিশালতা ও প্রাচুর্যের দিকে এবং ধর্মীয় অবিচার থেকে ইসলামের ইনসাফের দিকে পরিচালিত করার জন্য আমাদেরকে এখানে হাজির করেছেন। আল্লাহ মানুষের জন্য প্রেরিত তার দ্বীনসহ আমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছেন তার পথে লোকদের আহ্বান জানানো জন্যে।"

মুসলমানদের প্রতিনিধি রাবী বিন আমীর সেদিন পারস্যবাসীকে যেকথা বলেছিলেন তা কেবল তার ব্যক্তিগত অনুভূতি ছিলনা বরং তা ছিল মুসলিম নেতৃত্ব ও অধিকাংশ মুজাহিদের চিন্তাধারার প্রতিফলন। বস্তুগত স্বার্থসিদ্ধি ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের আশায় কতিপয় বেদুইন হয়ত সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করতে

www.pathagar.com

পারে। তবে তারা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব অথবা এর অন্তর্নিহিত প্রেরণাদায়ক শক্তির কোনটির প্রতিনিধিত্ব করেনি। একথা বলা প্রয়োজন যে, মুসলিম সমাজ একটি মানব সমাজ এবং এ সমাজের শ্রেষ্ঠাংশ উচ্চতম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল, তাদের সকল কর্ম ও চিন্তা একান্তভাবেই আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই তাদের একমাত্র কামনা আর এ লক্ষ্যেই তাদের সকল প্রচেষ্টা পরিচালিত। তবে মুসলিম সমাজে বিভিন্ন পর্যায়ের মুসলমান রয়েছে। তাদের সকলেই নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেবার উপযুক্ত ন্যূনতম গুণাবলী লালন করে থাকে।

আমরা একথা সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান, যিনি প্রতিনিয়ত রাসূলের (সা.) প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর বাণীঃ "আপনি বলুন, আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার সুকৃতি, আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহরই জন্য, যার কোন শরীক নেই। আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল" (আল আনাম ৬ঃ১৬২-১৬৩) বার বার তেলওয়াত করেন, কেবল তিনিই ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইসলামী ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণে সক্ষম। কোরআন ও সুন্নাহ মুসলমানের মানস ও আবেগকে প্রভাবিত করে। ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং কাজ ও আচরণের লক্ষ্য নির্ধারণে তিনি সে প্রভাব গভীরভাবে অনুভব করেন। এ কারণেই প্রাশ্চাত্যের লোকেরা ও প্রাচ্যবিদগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের কর্মকাণ্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ Henri Lammens- এর বনু সাঈদার সাকিফার ঘটনা বিশ্লেষণের বিষয় তুলে ধরা যেতে পারে। (এ ছিল শুরা প্রয়োগের প্রাথমিক দৃষ্টান্ত যাতে সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের অভিমতের অনুসরণ করত।) তিনি পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী আদালতের চক্রান্তের ঘটনার স্মৃতিতে উজ্জীবিত হয়ে এই ঘটনা বিশ্লেষণ করতে যেয়ে শেষাবধি প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করেছেন। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন আবু বকর, উমর ও উসমানের চক্রান্তের ফসল হিসেবে সাকিফার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বনু সাঈদার সাকিফাতে তারা খেলাফত দখল এবং একজনের পর আরেকজনের খলিফা হবার ব্যাপারে একমত হন।

প্রাচ্যবিদগণের অসংখ্য গবেষণা কর্ম রয়েছে। তাদের অবস্থান, মান এবং ধর্মীয় ও জাতিগত সংস্কার মুক্ত অবস্থার আলোকে তার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সাধারণতঃ ইসলাম থেকে অনেক অনেক দূরে ভিন্নতম পরিবেশ-পরিমণ্ডলের অধিবাসী এবং স্বতন্ত্র দর্শন ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক বিশেষজ্ঞগণ এসব গবেষণা

www.pathagar.com

সম্পাদন করেন। একারণে তাদের পক্ষে মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণের যথার্থ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা কঠিন ছিল। তারা ইসলামের ইতিহাস বিশ্লেষণে ইউরোপীয় ইতিহাসের উপমা ব্যবহার করেছেন, অথচ দুটি ইতিহাসের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। উপরন্তু আমাদেরকে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে সামরিক ও প্রযুক্তিতে বলিয়ান ইউরোপীয়রা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই বিশ্বকে বিশ্লেষণ করবেন। এক্ষেত্রে তারা নিজেদের সম্ভব সকল সুকৃতি ও গুণাবলী প্রকাশ এবং অন্যদের দোষ-ত্রুটি সন্ধান ও তুলে ধারা চেষ্টা করেন। Toynbee বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস রচনার সময় ইসলামের ইতিহাসের জন্য অতি সামান্য জায়গা ছেড়ে দেন, যা বিশ্ব ইতিহাসে ইসলামের বিপুল অবদানের সঙ্গে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

প্রাচ্যবিদগণের গবেষণার সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল তারা ইসলামের যথার্থতা, এর প্রেরণা শক্তি ও ইসলামী সমাজে এর প্রভাব এবং এসমাজের ইতিহাসের গতিধারা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই মারাত্মক ত্রুটি আমাদেরকে তাদের এসব গবেষণা– বিশেষ করে সীরাত এবং সত্যনিষ্ঠা খলিফাগণের যুগ সম্পর্কিত গবেষণা গ্রহণ ও অনুমোদনে নিবৃত্ত রেখেছে।

একটি সভ্যতার মূল্যায়ন

মুসলিম ঐতিহাসিকগণ কোন সভ্যতাকে শুধুমাত্র তার বস্তুগত সাফল্যের ভিত্তিতে বিচার করেন না উপরন্তু মহান স্রষ্টা আল্লাহ মানুষের জীবনের যে লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেক্ষেত্রে তার অর্জন কতখানি তা-ও বিবেচনা করে থাকেন। আল্লাহ এরশাদ করেনঃ "আমি মানুষ ও জীনকে কেবলমাত্র আমার এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" (আয যারিয়াহ ৫১ঃ৫৬)

এ দৃষ্টিকোণ থেকে একটি মহান সভ্যতা তাকেই বলা হবে যেখানে এমন একটি উপযোগী রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বস্তুগত পরিবেশ গড়ে উঠবে যা মানুষকে এক আল্লাহর এবাদতের পথে পরিচালিত করবে, সকল কর্মকাণ্ডে আল্লাহর হুকুম-আহকাম প্রতিপালনে সক্ষম করে তুলবে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে না। এসব প্রতিষ্ঠানকে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ সৃষ্টির সুযোগ অথবা বিশ্বজাহানের রবের এবাদতের পথ থেকে কাউকে বিচ্যুত করার জন্য চাপ প্রয়োগের অনুমোদন দেয়া হবে না। মুসলিম ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে কোন সভ্যতায় বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলায় অভূতপূর্ব সাফল্য, স্থাপত্য, পোশাক, আসবাবপত্র

www.pathagar.com

ও রন্ধন প্রণালীতে চোখ ধাঁধানো অগ্রগতি এবং বস্তুগত দিক থেকে গগনচুম্বী কীর্তি অর্জন সত্ত্বেও সেখানে আল্লাহর এবাদত ও শরিয়তের হুকুম-আহকাম প্রতিপালনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তা একটি "পশ্চাদ্পদ" ও ত্রুটিপূর্ণ সভ্যতা বলে গণ্য হবে।

খোদ ইসলামী সভ্যতা কয়েকটি অধ্যায় অতিক্রম করে এসেছে এবং একথা সত্য যে এর অধিকাংশ বস্তুগত সাফল্য প্রাথমিক যুগে অর্জিত হয়নি। হিজরী তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে অধিকাংশ বস্তুগত সাফল্য এসেছে। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমা ঐতিহাসিক Adam Mitez -এর অভিমত তুলে ধরা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, হিজরী চতুর্থ শতকে ইসলামী সভ্যতা অগ্রগতির স্বর্ণশিখরে আরোহন করেছিল। কারণ এই যুগে এক আল্লাহর এবাদতের যথার্থ পরিবেশ বিরাজমান ছিল। হিজরী চতুর্থ শতকের এবং হিজরী প্রথম শতকের মুসলমানদের মধ্যে তুলনা করলে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হবে যে হিজরী প্রথম শতকের মুসলমানরা শরিয়তের অধিকতর অনুবর্তী ছিলেন। মহানবীর (সা.) হাদীসে যার সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছেঃ "আমার জামানার উম্মতেরা সর্বোত্তম, তারপরে যারা আসবে তারা এবং এরপরে যারা আসবে তারা তাদের পরবর্তীদের চেয়ে উত্তম।"

এযুক্তি অমুসলিম ঐতিহাসিকদের কাছে বিস্ময়কর মনে হতে পারে কারণ তারা প্রাচ্যত্য সভ্যতার মানদণ্ড ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী। তবে পাশ্চাত্যের মূল্যবোধ, মানদণ্ড ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবের উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম মুসলিম ঐতিহাসিকদের কাছে তা আত্মস্বাক্ষরে সমুজ্জ্বল। সমসাময়িক সমগ্র মুসলিম দুনিয়ায় পরিদৃষ্ট নতুন ইসলামী সচেতনতার ফলে মুসলমানরা এই নয়া দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে সক্ষম হয়েছে। এজাগরণের প্রভাবে মুসলিম যুব সমাজ পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রেখেছে। ইসলাম ও ঈমান তাদেরকে আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে শ্রেষ্ঠত্ব, আত্মবিশ্বাস ও স্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জীবিত করেছে, যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা আল্লাহর মর্জিমত একটি নতুন সভ্যতার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই অনুভব হচ্ছে প্রথম যথার্থ পদক্ষেপ।

প্রাথমিক যুগের ইসলামের ইতিহাস বিশ্লেষণে "কৈফিয়তদান ও যুক্তির অবতারণা" মূলভিত্তি বিবেচিত হতে পারে না

পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে আমাদের মানসপটে সৃষ্ট মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নিপীড়নের ফলশ্রুতিতে যুক্তিবাদের অবতারণা হয়েছে। এর প্রভাবে

www.pathagar.com

অনেক মুসলিম ঐতিহাসিক ইসলামের জিহাদ বা দেশ জয় (আল ফুতুহ আল ইসলামিয়া) সম্পর্কে আলোচনার সময় অনেকটা দ্বিধাযুক্ত ও কৈফিয়তমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে থাকেন। তারা মনে করেন, এই সামরিক অভিযানের লক্ষ্য ছিল রোম ও পারস্যের হামলা থেকে আরব উপদ্বীপকে রক্ষা করা। এমনকি মহানবীর (সা.) সামরিক অভিযানও তাদের এই দ্বিধাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। মদীনা রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য তিনি এসব অভিযান পরিচালনা করেন বলে উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়। সীরাত সম্পর্কে অধ্যাপক মুহাম্মদ শালাবী আল নোমানীর অনবদ্য গবেষণা গ্রন্থখানিও এই ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে পারেনি।

মুসলিম ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ সুপরিচিত ও সুস্পষ্ট দলিল থাকা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত অনেক ঘটনাকে প্রত্যাখ্যান করে চলেছেন, কারণ এজন্য আবশ্যক যে কৈফিয়তমূলক যুক্তি তা তারা পরিবেশন করতে পারছেন না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এ ধরনের একজন লেখক বনু কুরায়জার যোদ্ধাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ঘটনা সম্পর্কে ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকে অস্বীকার করেছেন অথচ হাদীস গ্রন্থসমূহ, সীরাত গ্রন্থ ও ইতিহাসে এর সুস্পষ্ট সমর্থন রয়েছে। মনে হয়, তিনি যেন এ হত্যার যথার্থতা সম্পর্কে সন্দিহান। ইসলামী ইতিহাস বিশ্লেষণ যেমন কৈফিয়তমূলক নয়, তেমনি তা আত্মপক্ষ সমর্থনমূলকও নয়। ইসলামের ইতিহাস বিশ্লেষণের ভিত্তি হচ্ছে এমন দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইসলামই সত্য এবং যা কিছু এরসঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ তাই-ই ভ্রান্তিকর। আল্লাহ ইসলামে যেসব বিধিবিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সে জিহাদ হোক বা অন্য কিছু, তাই-ই সঠিক, বিংশ শতকের পাশ্চাত্য প্রভাবাচ্ছন্ন মানসিকতায় তা যতই বিস্ময়কর অথবা অগ্রহণযোগ্য মনে হোক না কেন, সেজন্য কৈফিয়ত প্রদান বা আত্মপক্ষ সমর্থন করার কোন প্রয়োজন নেই। কোন বিশেষ যুগের মানুষের অভিরুচি ও আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের জন্য ইসলাম ও তার ইতিহাসকে কোনক্রমে পরিবর্তন করা যাবে না। কোন নির্দিষ্ট যুগের মানুষ যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ অন্য সময়ে তা-ই আবার অরুচিকর প্রতীয়মান হতে পারে, এক স্থানের লোকেরা যাকে ভাল বলে জানে অন্য স্থানের লোকেরা তাকেই আবার মন্দ বলে গণ্য করে। তাই একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই কোন কিছুর যথার্থ মূল্যায়ন ও বিচার করতে পারেন। তার দেয়া আইন শরিয়তে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। মরণশীল মানুষ নিজস্ব খেয়াল-খুশী, মর্জি ও ব্যক্তিগত অভিমতের শৃঙ্খলে আবদ্ধ; তাই তার পক্ষে কোন বিষয়ে সঠিক ও চিরন্তন রায় দেয়া সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ সব ধরনের ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

www.pathagar.com

ইতিহাস রচনায় শরয়ী পরিভাষার ব্যবহার

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের ইতিহাস রচনায় শরয়ী পরিভাষার ব্যবহার করা খুবই জরুরী। ইসলামী আইনগত ধারণার মানদণ্ড অনুযায়ী শরয়ী পরিভাষার সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট অর্থ ও কার্যকারিতা রয়েছে– যা লোকজন ও ঘটনার বিচারে তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ বহন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পবিত্র কোরআন মানুষকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে ঃ মুমিন, কাফির ও মুনাফিক। এই তিনটি শব্দের প্রতিটির সুস্পষ্ট অর্থ ও উদ্দেশ্য রয়েছে যা বিকৃত করা সম্ভব নয়। আমাদেরকে এসব পরিভাষার ব্যবহার থেকে নিবৃত্ত থাকলে চলবে না, অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া অমুসলিম মহল যেসব পরিভাষা উদ্ভাবন করেছে, যেমন "বামপন্থী", "ডানপন্থী" অথবা শরিয়তের পরিপন্থী এবং অস্পষ্ট ও সন্দেহজনক যে কোন অনৈসলামিক পরিভাষা গ্রহণ করা আমাদের জন্য উচিত হবে না। সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কিত সাফল্য বিচারের ক্ষেত্রে ইসলামী পরিভাষার প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। "প্রগতিশীল", "প্রতিক্রিয়াশীল" ইত্যাদি পশ্চিমা পরিভাষার স্থলে ইসলামী ব্যবহারিক পরিভাষা "আল খায়ের", "আল শাবর", "আল হক", "আল বাতিল" "আল আদল" "আল জুলম" ইত্যাদি অবশ্যই ব্যহার করতে হবে।

কতিপয় মুসলিম লেখক ইসলামী অভিধানের বহির্ভূত অনেক পরিভাষা প্রয়োগের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছেন। এখানেই জাহেলী চিন্তাধারার সঙ্গে ইসলামের মিশে যাওয়ার ও তার পরিভাষার মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার বিপদ নিহিত রয়েছে, যা আমাদের স্বতন্ত্র পরিচিতিকে গ্রাস করে ফেলতে পারে।

ইসলামী বিধিবিধানের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং স্বকীয় পরিচিতির বিকাশের জন্য ইসলামের ইতিহাস পুনঃপ্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক ইসলামী পরিভাষার প্রয়োগ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। উপরন্তু ইসলামের ব্যবহারিক পরিভাষা সমূহ পাশ্চাত্যের পরিভাষার চেয়ে অধিকতর সংক্ষিপ্ত ও অর্থবোধক।

আমরা প্রশ্ন করতে পারি, হাদীস বিশারদগণের (মুহাদ্দিসীন) পদ্ধতি অনুসারে ইসলামী ইতিহাস গবেষণা বলতে কি বুঝায়?

মুহাদ্দীসগণ কতিপয় সুস্পষ্ট পদ্ধতি অনুসারে হাদীস সমালোচনা করে সেগুলোকে সহীহ হাদীস, জয়ীফ হাদীস, ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিক বিবরণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারি? এসব বিবরণ হাদীসের সঙ্গে তুলনীয়, যা সনদের

www.pathagar.com

(ধারাবাহিক বিবরণদাতাদের) মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে এবং তাদের মতনের (মূল বক্তব্যের সঙ্গে সনদও যুক্ত রয়েছে। এভাবে সামলোচকরা ঘটনার বিবরণ দাতাদের নাম এবং তারা কিভাবে তা বিবৃত করেছেন, তা জানতে পারেন। ইলম আল রিজাল (আক্ষরিক অর্থ মানববিজ্ঞান) গ্রন্থে এসব বিবরণদাতাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। এ গ্রন্থে তাদের নির্ভরযোগ্যতা নিরূপণের জন্য বিশেষ করে তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও মর্যাদা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, হাদীসকে সহীহ বলে গ্রহণ করার শর্ত হচ্ছে বর্ণনাকারীকে অবশ্যই আল আদল আল জাবিত (নির্ভুল স্মরণশক্তির অধিকারী নির্ভরযোগ্য মুসলমান) হতে হবে এবং তিনি যার কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছেন তাকেও আল আদল আল জাবিত হতে হবে। এভাবেই হাদীসের বিবরণদাতাদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছে। এ ধারাবাহিকতার কোন ধরনের ত্রুটি বা অস্বাভাবিকতা কোন ক্রমেই থাকতে পারবে না। অনুরূপভাবে ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণের যথার্থতা বা নির্ভুল হওয়ার শর্ত হল প্রত্যক্ষদর্শীসহ সকল বিবরণদাতা, তিনি তা মুখস্থ করুন অথবা সুচারুরূপে তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করুন না কেন, তাকে অবশ্যই (ত্রুটিহীন ও চমৎকার স্মরণশক্তিসহ) নিষ্ঠাবান ধার্মিক ব্যক্তি হবে। এছাড়া এ বিবরণকে অবশ্যই দলিল প্রণয়নে নির্ভরযোগ্য হিসেবে সুবিদিত অন্যান্য বর্ণনাকারীর বিবরণের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। এসব বিবরণের সঙ্গে তা যদি বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হয় তাহলে তাকে "সম্পর্কহীন" বিবরণ বলে গণ্য করা হবে এবং তদস্থলে উন্নতর বিবরণই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। ঐতিহাসিক বিবরণের ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য, মিথ্যা, ইরসাল (বর্ণনাকারীদের সংযোগ বিচ্ছিন্নতা) অথবা মূলবক্তব্যের সঙ্গতিহীনতার মত কোন ত্রুটি থাকতে পারবে না। কোন ঐতিহাসিক বিবরণ হাদীসবেত্তাগণের পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ভুল হিসেবে উত্তীর্ণ না হলে তার সনদকে অবশ্যই যাচাই করতে হবে। কোন বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে সকল বিবরণ অবশ্যই সংগ্রহ ও পরীক্ষার মাধ্যমে তা সঙ্গতিপূর্ণ অথবা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ কিনা তা নির্ণয় করতে হবে। কোন বিবরণ যদি অনেকগুলো সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হয় তা হলে সেটির নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক, বিশেষ করে সে ক্ষেত্রে মনে হবে, যে, এতো অধিকসংখ্যক বর্ণনাকারীর পক্ষে মিথ্যা রচনা করা অথবা দৈবক্রমে তা ঘটে যাওয়া সম্ভব নয়।

ঐতিহাসিক বিবরণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে হাদীসবেত্তাগণের পদ্ধতি অবশ্যই অনুসৃত হতে হবে। স্বয়ং হাদীসবেত্তাগণ ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করার সময় কিছুটা নমনীয়তা অবলম্বন করেছেন। আমরা ইবনে ইসহাক, খলিফা ইবনে

www.pathagar.com

খাইয়াত এবং আল তাবারীর মতো প্রাথমিক যুগের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মুসলিম ঐতিহাসিকগণের ক্ষেত্রেও এদিকটি লক্ষ্য করেছি। তাদের সকলেই হামেশা অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ পেশ করেছেন সেগুলো হয় মুরসাল অথবা মুনকাতি। আল তাবারী, হিশাম ইবনে কালবি, সাইফ ইবনে উমার আল তামিমি, নসর ইবনে মাজাহিমও আরও অনেকের মতো অত্যন্ত দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য বিবরণ দাতাদের বর্ণিত ঐতিহাসিক বিবরণও হরহামেশা বর্ণনা করেছেন।

এতে সন্দেহ নেই যে, প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকগণ হাদীস সমালোচনার কঠোর মানদণ্ড অনুসরণ না করে ঐতিহাসিক বিবরণ গ্রহণ করার ফলে সমসাময়িক মুসলিম ঐতিহাসিকদের ওপর এক গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকগণ সনদে উল্লিখিত বর্ণনাকারীদের উপর আস্থা স্থাপন করে সন্তুষ্ট ছিলেন। এর অর্থ হল, সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণকে কোন ঐতিহাসিক বিবরণ নির্ভুল তা নিরূপণে অত্যন্ত অধ্যবসায়ী হতে হবে। তাদেরকে হাদীসবেত্তাগণের পদ্ধতি অনুধাবন করে হাদীসের ক্ষেত্রে তা যেমনভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে ঐতিহাসিক বিবরণের ক্ষেত্রেও তা প্রয়োগ করতে হবে। খলিফা ইবনে আল খাইয়াত বা আল তাবারীর পক্ষে এ পদ্ধতির প্রয়োগ যতোটা সহজ ছিল এখন তা আর ততোটা সহজ নয়, কেননা এই মনীষীগণ ঐতিহাসিক বিবরণ সমালোচনার ক্ষেত্রে হাদীসবেত্তাগণের পদ্ধতি সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল ছিলেন।

আমরা প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকগণের প্রাপ্য খ্যাতি অথবা তাঁদের অবদানকে খাটো করে দেখতে চাইনা। তাঁরা আমাদের সনদসহ প্রাথমিক তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করে রেখে গেছেন যা কঠিন হওয়া সত্ত্বেও আমাদেরকে তার বিচার-বিশ্লেষণে সক্ষম করে তুলেছে। ত্রুটিপূর্ণ বিবরণ থেকে নির্ভুল বিবরণ পৃথক করার পরে আমাদের কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত?

আমাদের সহীহ বিবরণসমূহ গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর হাসান বিবরণ এবং এরপরে স্বতন্ত্র সনদ দ্বারা সমর্থিত জয়ীফ বিবরণসমূহ গ্রহণ করতে হবে। স্বতন্ত্র সনদ দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় এই রেওয়ায়েতসমূহকে আল মুয়াদ্দাদা বলা হয়। এভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী পুনর্গঠন করা সম্ভব। কোথাও কোন অসঙ্গতি দেখা গেলে সেক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী হাদসীকে গ্রহণ করতে হবে। তবে কোন শূন্যতা পূরণের জন্য সহীহ বা হাসান রেওয়ায়েত পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে অসমর্থিত অথবা অন্য কোনভাবে সংহত নয় এমন জয়ীফ হাদীসও ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশ্য আকিদা বা শরিয়তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

www.pathagar.com

নয় কেবল সেক্ষেত্রেই এ রীতি প্রযোজ্য হতে পারে। সাধারণ নিয়ম অনুসারে সকলকেই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মৌলিক বিশ্বাস ও নীতিমালা বা শরয়ী বিধিবিধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রীতিনীতি পালন করতে হবে। রাসূলের (সা.) জীবদ্দশায় এবং নির্ভুলভাবে পরিচালিত খলিফাগণের ইসলামী শরয়ী বিধানের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল। এবিষয়টি প্রতি আমাদেরকে অবশ্যই দৃষ্টি দিতে হবে। খলিফাগণ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপনের জন্য নিজেদেরকে আল্লাহর পথে পুরোপুরি সোপর্দ করে দিয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন বাস্তব নমুনা। সামরিক বিজয় ও অভিযানের পরবর্তীতে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের সময় উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে তাদের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে অনুসৃত হতে হবে।

ইতিহাস রচয়িতাদেরকে নগর নির্মাণ, স্মৃতিসৌধ তৈরী, সেচ, খাল খনন অথবা যুদ্ধের বিবরণ বা মুজাহিদদের বীরত্ব ও কোরবানীর প্রসঙ্গ বর্ণনায় নমনীয়তা অবলম্বনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

হাদীস সংগ্রহের পদ্ধতির মূলনীতিকে গ্রহণ করে আমরা সীরাত ও সঠিক পথের অনুসারী খলিফাগণের যুগ গবেষণায়ও হাদীস গ্রন্থসমূহকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করবো। এর কারণ সীরাত অথবা সাধারণ ইতিহাসের চেয়ে হাদীসের কিতাবসমূহ সমোলোচকরা অধিকতর গভীরভাবে যাচাই করেছেন। যেমন হাদীস গ্রন্থ বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফকে নির্ভুল বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এই হাদীস গ্রন্থের প্রতিটি হাদীসকে সহীহ বলে গণ্য করা হয়। এই দুটি হাদীস গ্রন্থের উপর বহু গবেষণা হয়েছে। অনন্য ধীশক্তির অধিকারী প্রাচীন ও আধুনিক বিশেষজ্ঞগণ এই গ্রন্থ দুটির উপর বহু গবেষণা চালিয়েছেন এবং এর অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের উপর সমালোচনাও অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে কারণ এর মূল সকলের জানা রয়েছে এবং তা কেবলমাত্র বুখারী শরীফ বা মুসলিম শরীফের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বস্তুত এই বাস্তবতার আলোকে আমরা সীরাত ও সঠিক পথের অনুসারী খলিফাগণের যুগ সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকে নির্ভুল বলে গ্রহণ করতে পারি। এরপর আমরা অপর চারখানা হাদীস গ্রন্থকে বিবেচনা করবো। ইমাম মালিকের আল মুয়াত্তা ব্যাপক আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে তবে এটি উপরোল্লিখিত দুটি সহীহ হাদীস গ্রন্থের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে পারেনি এবং এই হাদীস গ্রন্থ জয়ীফ হাদীস থেকে মুক্ত নয়।

হাদীসের কিতাবে সীরাত সম্পর্কে বিপুল তথ্য ছড়িয়ে রয়েছে তবে এতে সব ঘটনারই উল্লেখ নেই। ফলে সীরাত ও সাধারণ ইতিহাসের ক্ষেত্রে হাদীস

www.pathagar.com

সমালোচনা পদ্ধতির প্রয়োগ গুরুত্ব লাভ করেছে। আইয়ুন আল আসর ফি আল মাগাজী ওয়া আল শামাইল ওয়া আল সাইয়ার গ্রন্থের রচয়িতা আল হাফিজ ইবনে সাঈদ আল নাস এবং তারিখ আল ইসলাম এর প্রণেতা আল হাফিজ আল দাহাবীর মতো বিশিষ্ট হাদীসবেত্তাগণ প্রধানতঃ ছ'খানা হাদীসের কিতাব– বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহর উপর নির্ভর করে সীরাত গ্রন্থ রচনা করেন। তাদের রচনায় সীরাত গ্রন্থ ও সাধারণ ইসলামী ইতিহাস গ্রন্থেরও উল্লেখ রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক কেননা তা উপেক্ষা করলে সীরাত সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রাথমিক যুগের খেলাফত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের ব্যাপারে একটা ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ সৃষ্টি হতে পারে। বস্তুতপক্ষে হাদীস গ্রন্থসমূহে সীরাত গ্রন্থ ও সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থের বিবরণের সমর্থন রয়েছে। বিশেষ করে দুটি প্রাচীনতম সীরাত গ্রন্থ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসের (১৫১ হিঃ) এবং মুসা ইবনে উকবা (২৬ হিঃ) এর ক্ষেত্রে এবিষয়টি যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসেরের গ্রন্থটি সীরাত ইবনে হিশাম নামে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। ইবনে হিশামের অনুরূপ মুসা ইবনে উকবার রচনা মাগাজী আল ওয়াকিদীতে স্থান পেয়েছে। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ তাকে হাদীস জাল করার জন্য দোষারোপ করেছেন। এতে তার নির্ভরযোগ্যতা বহুলাংশে ক্ষুণ্ন হয়েছে। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ অবশ্য সীরাত সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞানের কথা স্বীকার করেছেন। বস্তুত আল ওয়াকিদীকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তার সম্পর্কে হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মন্তব্য যথার্থ, আল ওয়াকিদী যেসকল বর্ণনাকারীর উপর নির্ভর করেছিলেন তাদের অনেকের নাম ইলম আল রিজাল গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়নি।

প্রাচ্যবিদদের অনেকে আল ওয়াকিদীর মাগাজীকে উচ্চতর মর্যাদা দান করেন, এমনকি সীরাত ইবনে ইসহাকের চেয়েও উন্নতর বলে গণ্য করেন। (কিছু সংখ্যক মুসলিম ঐতিহাসিকও এর প্রতি মৌন সমর্থন জানান)। বস্তুতপক্ষে সীরাত ইবনে ইসহাক আল ওয়াকিদীর রচনার চেয়ে অনেক নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য। ইবনে ইহসাক যেসব তথ্য ও ঘটনা বর্ণনা করেছেন হাদীসের কিতাবে তার অনেক বিষয়ের সমর্থন রয়েছে। হাদীস গ্রন্থ ও সীরাত গ্রন্থের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে সীরাত গ্রন্থসমূহে এমন বহু বিবরণ রয়েছে যার সনদ হয় মুরসাল অথবা মুনকাতি, অন্যদিকে এই একই বিবরণ পূর্ণ সনদসহ হাদীসের কিতাবে স্থান পেয়েছে, যাতে সীরাত গ্রন্থে তথ্যের সত্যতা সমর্থিত হয়েছে।

www.pathagar.com

আমাদেরকে অবশ্যই হাদীসের কিতাবের সঙ্গে সীরাত গ্রন্থের তুলনা করতে হবে এবং ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে হাদীস সমালোচনার পদ্ধতির নীতি প্রয়োগ করে সীরাত গ্রন্থসমূহে সংশোধনী আনতে হবে এবং কিছু কিছু বিষয় বর্জন করতে হবে। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে হাদীস সমালোচনার পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করবো। এই বিষয়ে গবেষণার সময় আমার কাছে এই ফলাফল পরিস্ফুট হয় ঃ

১. সীরাতের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আমাদের নিঃসংশয় জ্ঞান

বান্দাদের প্রতি আল্লাহর এক অশেষ রহমত যে তিনি তাঁর রাসূলের সীরাত সংরক্ষণ করেছেন যাতে করে তারা তাঁকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ ও অনুসরণ করতে পারে।

২. নতুন তথ্য সংযোজন

হাদীস গ্রন্থসমূহে ছড়িয়ে থাকা নতুন তথ্য সংযোজন গুরুত্বপূর্ণ কারণ সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহের আলোচনা প্রধানত মাগাজী সংক্রান্ত বিষয়ে সীমিত এবং সীরাতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দিকের অনেক বিষয় তাতে অনুল্লিখিত রয়েছে।

৩. কয়েকটি বিষয়ের ব্যাখ্যাদান

ঐতিহাসিকগণ ও হাদীসবিশারদগণের ভিন্নমত পোষণ, যেমন বানু আল মুস্তালিকের বিরুদ্ধে অভিযানের ঘটনা। বুখারী শরীফের সহীহ রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে মহানবী (সা.) হঠাৎ করে আক্রমণ চালিয়ে তাদের সকলকে বন্দী করেন। আর সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে রাসূল (সা.) তাদেরকে হুশিয়ার করে দেন এবং তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আল মুরাইয়েসি কুপের আশে পাশে লড়াই সংঘটিত হয়।

এধরনের পরিস্থিতিতে দুশমনকে হুশিয়ার জানানো সঠিক ইসলামী নীতি সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত হতে হবে। আমরা এ প্রসঙ্গে ফকীহগণের তিনটি সুস্পষ্ট অভিমত দেখতে পাই ঃ

ক. দুশমনকে আসন্ন আক্রমণ সম্পর্কে জানানো আদৌ কোন প্রয়োজন নেই, এটা বাধ্যতামূলক নয়। আল মাজিরি ও আল কাজী আইয়াদ এই নীতি সমর্থন করেছেন।

খ. ইমাম মালিক ও অন্যান্য ফকীহ সকল পরিস্থিতিতেই দুশমনকে হুঁশিয়ারি জানানো বাধ্যতামূলক, এই অভিমত সমর্থন করেছেন।

গ. যাদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছেনি তাদেরকে হুঁশিয়ারি জানানো বাধ্যতামূলক তবে যাদের কাছে ইসলামের বাণী পৌছে দেয়া হয়েছে, (এবং তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে) তাদেরকে হুঁশিয়ারি জানানো বাধ্যতামূলক নয়। ইমাম

www.pathagar.com

আবু হানিফা, ইমাম শাফি, আহমদ এবং তাদের অনুসারীগণ এই অভিমত সমর্থন করেছেন। এই তিনটি মতের মধ্যে এটিই সবচেয়ে শক্তিশালী।

যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছানো হয়েছিল বানু আল মুস্তালিক তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাই তাদের উপর আকস্মিক আক্রমণ চালানোর বিষয় সবচেয়ে শক্তিশালী এ নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। আল বুখারীর রেওয়ায়েতের চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে যুক্তি দেখিয়ে ইবনে ইসহাক ও অন্যান্য সীরাত রচয়িতার বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রয়োজন নেই, কেননা তা পবিত্র কোরআনের এই আয়াতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, যাতে বলা হয়েছেঃ "কোন সম্প্রদায়ের ধোঁকা দেয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের ভয় থাকে, তাহলে তাদের চুক্তি তাদের দিকেই ছুড়ে ফেলে দাও এমনভাবে যেন তোমরা ও তারা সমান হয়ে যাও" (আনফাল ৮ঃ৫৮)।

৪. সীরাতের কতিপয় বিষয়ে কিছুটা সংশোধনী আনা প্রয়োজন

এতে কেবলমাত্র সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থের ভিত্তিতে সমসাময়িক গবেষণার ক্ষেত্রে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ রয়েছে। যেমন "ভ্রতৃত্বের পদ্ধতি" এবং "হিজরতের শুরুতে মদীনার সনদ হিসেবে রাসূলের প্রণীত দলিল।" তবে সংশোধনীর মাত্রা তেমন বেশী হওয়া উচিত নয় যাতে প্রাচীন সীরাত রচয়িতাদের উপস্থাপিত এবং সুদীর্ঘ ১৪০০ বছর যাবত মুসলমানদের কাছে সুপরিচিত সীরাতের কাঠামোর পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। বরং তুলনামূলক গবেষণা করলে দেখা যাবে যে সীরাত গ্রন্থ ও হাদীসের কিতাবের মধ্যে বিরাট মিল রয়েছে। এতে সকল যুগের ও স্থানের মুসলমানদের পথ নির্দেশনার জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে আল্লাহ যে তার রাসূলের সীরাতকে সংরক্ষণ করেছেন সে আভাসই পরিস্ফুটিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা প্রাথমিককালেই সীরাত রচনার জন্য তাবেয়ীন ও তাদের ছাত্রদের মধ্য থেকে বেশ কয়েকজন অসাধারণ হাদীস বিশেষজ্ঞ গড়ে তোলেন যারা বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষী ও অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের কাছ থেকে অমূল্য হাদীসমূহ সংগ্রহ করেন। এভাবে সীরাতের ঘটনাবলী ও তা লিপিবদ্ধকরণের মধ্যে কোন ব্যবধান সৃষ্টি হতে পারেনি। এরূপ ব্যবধান সৃষ্টি হলে হয়ত অনেক বিবরণ হারিয়ে যেত অথবা বিকৃত হয়ে যেত এবং ঘটনার সঙ্গে অনেক কিছু সংযোজিত হতো। উপরন্তু আমরা সীরাত রচয়িতার পরিচয় খতিয়ে দেখলে দেখতে পাব যে তাদের অধিকাংশ হাদীস বিশারদও, তারা নিছক সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব অথবা গাল্পিক ছিলেন না। অত্যন্ত তাৎপর্যের বিষয় হচ্ছে যে, তারা এই গ্রন্থের বিবরণের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ও সমালোচনামূক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তাদের রচনাশৈলী ছিল পরিমিত এবং অতিরঞ্জন, পান্ডিত্যপনা, পুনরুক্তি ও কাল্পনিক বিষয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

হাদীস বিশারদগণের মূলনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে নমনীয়তা অবলম্বনের আবশ্যকতা

যে কোন ঐতিহাসিক বিবরণ গ্রহণের ক্ষেত্রে হাদীস সহীহ হওয়ার শর্তাবলী প্রয়োগের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদান অবশ্যই সমর্থনযোগ্য হবে না। এই কঠোর শর্ত প্রয়োগ করে যেসব বিবরণ পাওয়া যাবে তা ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের সকল ঘটনা ও বিকাশের পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হবে না এবং আমাদের জাতীয় ইতিহাস বর্ণনায় নিঃসন্দেহে এক বিপুল শূন্যতার পথ প্রশস্ত হবে। আমরা যদি এক্ষেত্রে অন্যান্য জাতির ইতিহাস তুলনা করি তাহলে দেখতে পাব যে, তাতে এধরনের অনেক শূন্যতা রয়েছে, যদিও এসব ইতিহাস প্রায়শঃ ব্যক্তিবিশেষ অথবা অজ্ঞাতনামা বিবরণের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তাই ইসলামের প্রাথমিক যুগ ও পরবর্তী বিভিন্ন যুগের ইতিহাস বর্ণনাকারী ঐতিহাসিকের বিশ্বাসযোগ্যতা ও তার স্মরণশক্তির প্রখরতার ব্যাপারে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে, যাতে করে তার সংগৃহীত দলিল অকাট্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবরণের মধ্যে অসঙ্গতির ক্ষেত্রে হাদীস সমালোচনার মূলনীতি অবশ্যই প্রযোজ্য হতে হবে।

অন্যান্য জাতি সম্পর্কে একজন ঐতিহাসিকের বিবরণ ও তাদের ভূমিকার মূল্যায়ন গ্রহণযোগ্য ও সমুন্নত হবার জন্য যে জিনসিটি অপরিহার্য, তাহল এই ঐতিহাসিককে অবশ্যই বিশ্বাসভাজন, সৎ ও ধার্মিক হবার শর্তাবলী পূরণ করতে হবে। ইসলামী ইতিহাসের সকল পর্যায়কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিশ্লেষণ করতে হবে। সম্প্রতি দেখা গেছে যে, কোন বিশেষ যুগ সম্পর্কে নতুন করে বিশ্লেষণ আমাদের উপলব্ধির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটাতে পারে। যেমন উসমানী শাসনামল। ঐ আমলের রেকর্ডপত্র নতুন করে উন্মোচিত হয়েছে এবং চরশ' জন মুসলিম ঐতিহাসিক তা পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। এতে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, উমাইয়া ও আব্বাসী আমল এবং বর্তমানকালের পূর্ব পর্যন্ত সকল সময় সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যে পরিবর্তন আসবে তা হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.com

এতে আমাদের ইতিহাসে সাধিত ভয়াবহ বিকৃতি উন্মোচিত হবে।

ইসলামী ইতিহাস বিশ্লেষণের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা এবং সমালোচনা পদ্ধতির সঠিক মাত্রা নিরূপণের লক্ষ্যে গভীর গবেষণায় নিয়োজিত হওয়ার জন্য আমি মুসলিম ঐতিহাসিকদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, যে পদ্ধতির আলোকে ইসলামী ইতিহাস অবশ্যই পরীক্ষিত হতে হবে। আমি আমাদের যুব সমাজকে সতর্ক করে দিতে চাই যে তারা যেন ইসলামী ইতিহাসের ঘটনাবলী ও মহান ব্যক্তিবর্গের সম্পর্কে জানার জন্য মুষ্টিমেয় সংখ্যক ইতিহাস গ্রন্থে উল্লিখিত বিবরণের উপর পূর্ণ নির্ভরশীল না হন এবং চুলচেরা বিশ্লেষণ ও সুষ্ঠু সমালোচনা ছাড়া তা গ্রহণ না করেন। তা না হলে তাদেরকে ইসলামী ইতিহাসের বিকৃত চিত্র লাভের ঝুঁকির মধ্যে নিপতিত হতে হবে। আল তাবারী ও আরও অনেকে যেসব ঐতিহাসিকের বিবরণের উপর নির্ভর করেছিলেন তারা ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণা ও সংস্কারে বিশ্বাসী এবং রাজনৈতিক ও জাতিগত পক্ষপাতিত্বের দোষে আচ্ছন্ন ছিলেন, উমাইয়া ও আব্বাসী শাসনামল সম্পর্কে এই ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় তাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ও পক্ষপাতিত্বের দিকটি নগ্নভাবে ফুটে উঠেছে। একারণেই ইসলামের ইতহাস পুনর্লিখনের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে। আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী এবং আমাদের ইতিহাসে ইসলামের প্রভাব, যা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে, সেসম্পর্কে ওয়াকিফহাল ও তার মর্মবাণী অনুধাবনে সক্ষম মুসলিম লেখকদেরকেই এই পুনর্লিখনের দায়িত্ব গ্রহণে এগিয়ে আসতে হবে।

সীরাত গবেষণার উৎসগ্রন্থ

সীরাত অধ্যয়নের বিভিন্ন উৎস রয়েছে। অনেকে যেসব প্রাথমিক সূত্রের কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে আল কোরআন, আল হাদীস, সীরাত সম্পর্কিত গ্রন্থ কিতাবুল শামাইল ও আল দলিল এবং সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থসমূহ। অন্যান্য উৎসকে গৌণ ও পরিপূরক সূত্র হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে, এসব গ্রন্থে সীরাত অথবা ইতিহাস সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনা না করা সত্ত্বেও তাতে সীরাত অধ্যয়নে সহায়ক বিভিন্ন দিকের আলোকপাত করা হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে সাহিত্য ও কবিতার বই, জীবনীগ্রন্থ, ইলম আল রিজাল, ভূগোল, ফিকহ, কুরছিনামা, অভিধান ইত্যাদি। সীরাত গবেষণার ক্ষেত্রে এসব উৎসকে সমন্বিত করলে সীরাত সম্পর্কে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ও সম্ভব সবচেয়ে বিস্তারিত চিত্র লাভ যে সম্ভব হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

আমি এসব উৎসের বিবরণ, মূল্যায়ন ও ব্যবহারের উপায় সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করব। প্রথমতঃ গবেষকদের একথা অনুধাবন করতে হবে যে, এগুলোর সব একই পর্যায়ের নয়। এগুলো মান ও যথার্থতার ব্যাপারে প্রভেদ রয়েছে, তাই এগুলো সমান বলে গণ্য হতে পারে না। কোরআন-এর আয়াত বা হাদীসের রেওয়াতের সঙ্গে ঐতিহাসিক অথবা সাহিত্যিক বিবরণের তুলনা করার প্রশ্নই উঠতে পারে না।[১] তাই এসব উৎসকে অবশ্যই বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে সঠিকভাবে শ্রেণী বিন্যাস করতে হবে।

সীরাতের উৎসগ্রন্থের তালিকার শীর্ষে রয়েছে আল কোরআন। ওহীর মাধ্যমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে পাঠানো ভাবে ও ভাষায় আল্লাহর বাণীই হচ্ছে পবিত্র কোরআন। আল কোরআনের ইসলামী আকিদা-বিশ্বাস ও শরয়ী বিধিবিধান বিধৃত হয়েছে। আল কোরআনের আহকাম সম্পর্কে অনেক আয়াত রয়েছে যা ইসলামী সমাজ ও তার বিশ্লেষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[২] আহকামের আয়াতসমূহে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে বিভিন্ন বিধিবিধান বর্ণিত হয়েছে। এই বিধিবিধান অনুসারে মহানবী (সা.) প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র শাসন করেন।

আমরা পবিত্র কোরআনে মহানবীর জীবনের বহু ঘটনার উল্লেখ দেখতে পাই। যেমন বদর, ওহোদ, খন্দক ও হুনায়ুনের যুদ্ধের ঘটনা।[৩] এসব যুদ্ধ কি পরিস্থিতিতে সংঘটিত হয়েছিল বিশেষ করে এর মনস্তাত্ত্বিক দিকের বিবরণ এতে রয়েছে। এধরনের প্রাণবন্ত, সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ আর কোন সূত্রে পাওয়া সম্ভব নয়।

এছাড়া কোরআন মজিদে হিজাজের মুসলিম ও ইহুদীদের মধ্যকার বস্তুগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংঘাতের যথার্থ বিবরণও পাওয়া যায়।[৪] পবিত্র কোরআনের অতীতের জাতিসমূহের ঘটনা উল্লেখ মুসলমানদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণকে প্রসারিত করেছে। মুসলমানদের ইতিহাস গবেষণায় অতীতের নবীগণ ও জাতিসমূহের ইতিহাসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি কেবলমাত্র আরব উপদ্বীপের মধ্যে সীমিত থাকেনি। যেমন রোমান ও পারস্যবাসীর যুদ্ধ। এ ধরনের ঘটনা মুসলমানদেরকে রোম, পারস্য, তুরস্ক, আবিসিনিয়া ও অন্যান্য জাতির ইতহাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।[৫]

পবিত্র কোরআনে ঐতিহাসিক ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা প্রত্যাশা করা আমাদের জন্য উচিত হবে না, কারণ মূলত আল কোরআন হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান,

www.pathagar.com

কোন ঐতিহাসিক পাঠ্যগ্রন্থ নয়। এছাড়া অনেক আয়াতের প্রাসঙ্গিক বিষয় ও সময় জানাও দূরূহ, কারণ এ ব্যাপারে কোন তথ্য দেয়া হয়নি অথবা যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তাতে প্রায়ই অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়েছে।[৬] প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে এমন সব বিবরণ থেকে নির্ভুল বিবরণগুলোকে প্রথমেই পৃথক করে নিতে হবে। এরপরও কোনরূপ অসঙ্গতি থেকে গেলে তা যাচাই ও সমাধান করতে হবে।

উপরন্তু একথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে প্রখ্যাত তাফসিরসমূহ অধ্যয়ন না করলে আমরা পবিত্র কোরআন থেকে ফায়দা লাভ করতে পারব না। এসব তাফসির-তাফসির বি আল মাশহুর নামে সুবিদিত, যেমন আল তাবারী ও ইবনে কাসির এর তাফসির। এছাড়া আল নাসিখ ওয়াল মানসুখ ও আসবাব আল নুজুল উলুম আল কোরআন সংক্রান্ত অন্যান্য গ্রন্থেরও সহযোগিতাও অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

কয়েকজন সমসাময়িক ঐতিহাসিক এস ব গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিতে অত্যন্ত গর্ববোধ করেন এবং আরবী ভাষাশৈলী ও অর্থের ব্যাপারে তারা তাদের নিজেদের অনুধাবনের উপর নির্ভরশীল হওয়াকেই অধিকতর পছন্দনীয় বলে গণ্য করেছেন। এর ফলে তারা মারাত্মক ভুল করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তাদের একটি আয়াতের অর্থ উপলব্ধির বিষয় তুলে ধরা যেতে পারে। আয়াতটি হলঃ "তিনিই যিনি উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল স্বয়ং তাদের মধ্য থেকে দাঁড় করিয়েছেন" (আল জুমআ ৬২ঃ২) প্রাচ্যবিদগণ এই আয়াতের আল উম্মীয়ীন শব্দের অর্থ করেছেন নিছক লেখা ও পড়ায় অপারগ নয়, দ্বীন সম্পর্কেও অজ্ঞ ব্যক্তি। অথচ পবিত্র কোরআনের প্রায় মুহাম্মদকে (সা.) "আল নবী আল উম্মী" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (আল আরাফ, ৭ঃ১৫৭)। আল্লাহর নবীকে দ্বীন সম্পর্কে শিক্ষা দেয়ার জন্যই দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল, তাই তাঁকে দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ বলে কল্পনা করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।[৭]

গবেষকগণকে প্রমাণপঞ্জীতে সমৃদ্ধ তফসির গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই উপযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তিক ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ করতে হবে। পবিত্র কোরআনের শব্দের সঠিক অর্থ যা তা-ই ব্যবহার করতে হবে। নির্ভরযোগ্য তাফসির গ্রন্থের উদ্ধৃতি ও কোরআনের আয়াতের সঠিক অর্থ প্রদানের জন্য গবেষককে অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে, তবে তিনি কোন বিশেষ মত বা মাজহাবের সমর্থনে এর যথেচ্ছা ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। মহানবী (সা.) তাঁর হাদীসে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেনঃ "যে কেউ পবিত্র কোরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা অথবা যা সে জানেনা তাই আরোপ করবে, তাকে (দোযখের) আগুনে প্রবেশ করতে হবে।"

www.pathagar.com

সীরাত গবেষণার ক্ষেত্রে হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। হাদীসে ইসলামী আকিদা বিশ্বাস ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আল আহকাম সম্পর্কিত হাদীসসমূহে এবাদত বন্দেগী ও আইন কানুনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেমন সিয়াম, সালাত, হজ্জ, যাকাত এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা। হাদীসের জ্ঞান ছাড়া ইসলামের উপযুক্ত চিত্র লাভ কোনক্রমেই সম্ভব নয়। হাদীসে বর্ণিত সকল বিষয়ের সঙ্গে মহানবীর যুগ ও তার পরবর্তীকালের প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের গভীর সংযোগ রয়েছে। কারণ মুসলমানরা তাদের জীবনের সুন্নাহকে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেন। হাদীসের কেতাবসমূহের মাগাজী ও সীরাত সম্পর্কে আলোচনার জন্য পৃথক পৃথক পরিচ্ছেদ রয়েছে। যেমন সহীহ বুখারী শরীফ।[৮]

হাদীসের কিতাবে বর্ণিত সীরাত সংক্রান্ত বিষয় যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহের বর্ণিত বিষয়সমূহ মাগাজী ও সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থের বিবরণের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য। হাদীসবেত্তাগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হচ্ছে এসব কিতাব, তারা হাদীসমূহ আগাগোড়া পর্যবেক্ষণ এবং এর সনদ ও মতন গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে হাদীসের কিতাবগুলো প্রণয়ন করেছেন। হাদীস বিশুদ্ধ কি-না তা নিরূপণ এবং সমালোচনার জন্য যে পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে, সাধারণ ইতিহাসের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, হাদীসের কিতাবের স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুযায়ী তাতে মাগাজী ও সীরাতের ঘটনাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ নেই। এর পরিবর্তে কিছু কিছু বিবরণের মধ্যে তা সীমিত রয়েছে এবং তা হল হাদীসের কিতাব প্রণেতাদের কাছে পৌঁছানো রেওয়ায়েতসমূহ যা হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে তাদের বেঁধে দেয়া মানদন্ডে উত্তীর্ণ। তাই এতে ঘটনাবলীর পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়ার যায়না। একারণে বড় ধরনের সংশয় থেকে মুক্ত থাকতে চাইলে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে সীরাত সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়ার জন্য সুবিখ্যাত সীরাত গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে।[৯]

হাদীস গ্রন্থসমূহ বর্ণনাকারী সাহাবী অথবা বিষয়বস্তু অনুসারে সংকলিত হয়েছে। বর্ণনাকারীর অনুসারে সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহ হল মাসানিদ কিতাবসমূহ। এরমধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত কিতাব হলো ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল সংকলিত মুসনাদ শরীফ। আর বিষয়বস্তু অনুসারে সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহ হচ্ছে ছিয়াছেত্তার কিতাবসমূহ। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রে কালানুক্রমিক বিশ্বাসের দিককে গণ্য করা হয়নি। এ কারণে গবেষকগণ হাদীসের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

সমস্যার সম্মুখীন হন। সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহ অবশ্য কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হওয়ায় এর ত্রুটি অনেকাংশে সংশোধিত হয়েছে। আমরা হাদীসের প্রাচীনতম বিপুলায়তন যেসব সহীহ গ্রন্থ পেয়েছি তা হল ইমাম মালিকের মুয়াত্তা, সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, আল তিরমিজি, আল নাসাঈ ও ইবনে মাজাহর সুনান এবং আল দারামী ও আহমদ ইবনে হাম্বলের মাসনাদ কিতাবদ্বয়।[১০]

আল দলিল ও আল শামাইল[১১] (নবুওতের প্রমাণ পঞ্জী ও নবীর বৈশিষ্ট্য) গ্রন্থসমূহে মু'জেজা বা আলৌলিককত্ব ও অন্যান্য নিদর্শন আলোচিত হয়েছে যা নবীর সত্যতাকে যথার্থ বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

হাদীসের কিতাবসমূহে নবুওতের বৈশিষ্ট্য, নিদর্শন ও প্রমাণপঞ্জীর বিষয়ে বিভিন্ন অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রাথমিক যুগের যেসকল বিশেষজ্ঞ এবিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁরা হলেন ঃ

–হাদীস বিশেষজ্ঞ মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আল ফারায়েবী (২১২ হিঃ)। তার রচিত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ দলিল আল নবুওয়াহ (নবুওতের প্রমাণপঞ্জী)

– আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল মাদানী (২১৫ হিঃ), আয়াত আল নবী (নবীর নিদর্শন)।

– দাউদ ইবনে আলী আল ইস্পাহানী (২৭০ হিঃ), আলম আল নবুওয়াহ (নবুওতের নিদর্শন)।[১২]

–ইবনে কুতাইবাহ (২৭৩ হিঃ), আলম আল রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর রাসূলের নিদর্শন)।

– ইবনে আবু হাতিম (৩২৭ হিঃ), আলম আল নবুওয়াহ (নবুওতের নিদর্শন)।

– আবু বকর ইবনে দুনাইয়া (২৮১ হিঃ)।

– আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মুনদাহ (৩৯৫ হিঃ)

– আবু নুয়াইম আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল ইস্পাহানী (৪১৫ হিঃ) তাসবিত দলিল আল নবুওয়াহ (নবুওতের নিদর্শনের সত্যতা), গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয়েছে।

– আবু আব্বাস জাফর ইবনে মুহাম্মদ আল মুস্তাগফিরী (৪৩২ হিঃ)।

– আবু বকর আহমদ ইবনে আল হুসাইন আল বায়হাকী (৪৫৮ হিঃ) দলিল আল নবুওয়াহ ওয়া মারিফাত আহওয়াল সাহিব আল শরিয়াহ। গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয়েছে। এতে সহীহ ও হাসান হাদীসের সঙ্গে জয়ীফ ও মাওয়াদু হাদীসও সন্নিবেশিত হয়েছে। আল দাহাবী গ্রন্থখানির প্রশংসা করেছেন।[১৩]

www.pathagar.com

– আবু আল হাসান, 'আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল মাওয়ার্দী' (৪৫০ হিঃ)। গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছে।

– আবুল কাসিম ইসমাঈল আল ইস্পাহানী (৫৩৫ হিঃ)

– উমার ইবনে আলী ইবনে আল মুলাক্কিন (৮০৪ হিঃ), খাসাইছ আফজাল আল মাখলুকিন (শ্রেষ্ঠতম মানুষের গুণাবলী)।

–জালাল আলদ্বীন আল সুয়ূতি (৯১১ হিঃ), খাসাইছ আল কুবরা (মহোত্তম গুণাবলী)। মুদ্রিত এই গ্রন্থে সীরাত, দলিল ও শামাইল স্থান পেয়েছে।

বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বা খাসাইছ সম্পর্কে অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে। আমি তার থেকে মাত্র কয়েকখানির কথা উল্লেখ করেছি। এই তালিকায় এসম্পর্কিত সকল গ্রন্থ সংযোজন করা হয়নি, আরও অনেক গ্রন্থ রয়েছে।

শামাইল গ্রন্থে নবীর আখলাক (নৈতিক গুণাবলী), আদব (আচার-আচরণ) এবং সুরতের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাথমিক যুগে এই নির্দিষ্ট বিষয়ে যেসকল বিশেষজ্ঞ গ্রন্থ রচনা করেছেন তারা হলেনঃ-

– দাউদ ইবনে আলী ইস্পাহানী (২৭০ হিঃ), তার গ্রন্থ সিফাত আখলাক আল নবী (নবীর বৈশিষ্ট্যের বিবরণ)[১৪]

– আল হাফিজ আল তিরমিজি (২৭৯ হিঃ), আল শামাইল আল নবুবিয়াহ ওয়া আল খাসাইছ আল মুস্তাফাইয়াহ (মুস্তাফার নবুওয়াতী গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য)। গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছে।

– আবু আল শায়েখ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাইয়ান আল ইস্পাহানী (৩৩৯ হিঃ), আখলাক আল নবী ওয়া আদাবাহ (নবীর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার)। গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছে।

– আবু সাঈদ আব্দুল মালিক মুহাম্মাদ আল নিসাপুরী (৪০৬ হিঃ), কিতাব শারাফ আল মুস্তাফা (মুস্তাফার মহত্বের কিতাব)।

- আবু আব্বাস আল মুস্তাগফিরি (৪৩২ হিঃ), শামাইল আল নবী (নবীর বৈশিষ্ট্য)।

- আল কাজী আইয়াদ (২৪৪ হিঃ), কিতাব আল শিফা বি তারিফ হুকুক আল মুস্তাফা (মুস্তাফার প্রতি কর্তব্য অবগত হওয়ার মাধ্যমে মুক্তি লাভের কিতাব)।

- আল হাফিজ আল সুয়ূতি (৯১১ হিঃ), তিনি তার গ্রন্থ মানাহিল আল সাফা ফি তাখরিজ আহদিস আল শিফা (আল শিফা হাদীসের সূত্র ব্যাখ্যার বিশুদ্ধতার নির্বাচনী) এ শিফা হাদীসের সূত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। এই গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছে।

বহু ওলামায়ে কেরাম আল শিফা হাদীসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেনঃ

www.pathagar.com

- আলী আল কারী (১০১৪ হিঃ) শরহ আল শিফা (শিফার ব্যাখ্যা)। গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছে।

- আল খাফাজি (১০৬৯ হিঃ), নাসিম আল রিয়াদ ফি শরহ আল শিফা লি আল কাজী আইয়াদ (কাজী আইয়াদের আল শিফা ব্যাখ্যার ফুল বাগানের মৃদুমন্দ বাতাস)

– আল হাফিজ ইবনে কাসির (৮৮৪ হিঃ), শামাইল আল রাসূল (রাসূল চরিত্র)। গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছে।

বিশুদ্ধতার দিক থেকে কোরআনুল করীম ও হাদীস শরীফের পরেই সীরাত সম্পর্কিত মশহুর গ্রন্থসমূহের স্থান। ইসলামের অতি প্রাথমিক যুগে রচিত হওয়ার কারণে সীরাত গ্রন্থসমূহের আদর্শগত গুরুত্ব অপরিসীম। তাবেয়ীনের জামানায় এই গ্রন্থগুলো যখন রচিত হয় তখনও বহু সাহাবী (রাঃ) জীবিত ছিলেন এবং তাঁরা সীরাত রচয়িতাদের কোন সমালোচনা করেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে তারা যা লিখেছিলেন সাহাবীগণ তা অনুমোদন করেছিলেন। সীরাত সম্পর্কে সাহাবীগণের বিপুল ও বিশদ জ্ঞান ছিল কারণ তারা রাসূলের জামানায় বসবাস করেন এবং নিজেরা সীরাতের বহু ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তারা মহানবীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পোষণ করতেন এবং হালাল-হারামের বিধানের মতোই নিজেদের জীবনে সুন্নাহর অনুসরণ, অনুকরণ ও প্রতিপালনে গভীর আগ্রহী ছিলেন। আর একারণেই সীরাত সম্পর্কিত তথ্য প্রচার লাভ করে এবং তার উপর গবেষণা করা হয় এবং তা সংরক্ষণ করা হয়। এটি ছিল ইসলামী শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ।

তাবেয়ীন ও তাদের অনুসারীদের মধ্যে যারা সীরাত সম্পর্কে গ্রন্থ রচনায় অগ্রণী ছিলেন, তাদের সম্পর্কে অনেকগুলো আধুনিক গবেষণা গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে।[১৫] তবে এসব গ্রন্থে আল জারহ ওয়াল তাদিল সম্পর্কিত তাদের মর্যাদার বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়নি, তাদের রচনা হাদীস গবেষণার থেকে ভিন্ন ধরনের এবং তাতে মুস্তালাহ আল হাদীসের বিধি অনুসৃত হয়নি। এক্ষেত্রে যারা অগ্রণী ছিলেন তাঁরা হলেনঃ

– আব্বান ইবনে উসমান ইবনে আফফান (১০১-১০৫ হিঃ) তিনি হলেন নির্ভরযোগ্য হাদীস বিশেষজ্ঞ তাবেয়ী।

– উরওয়া ইবনে আল জুবায়ের ইবনে আল আওয়াম[১৬] (৯৪ হিঃ)। তিনিও নির্ভরযোগ্য হাদীস বিশেষজ্ঞ তাবেয়ী এবং মদীনার অন্যতম প্রখ্যাত ফকীহ ছিলেন।

www.pathagar.com

– আমীর ইবনে শারাহিল আল শা'বী (১০৩ হিঃ), একজন হাদীস বিশেষজ্ঞ। তিনি মাগাজীর উপর একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন।[১৭]

– আসিম ইবনে উমার কাতাদাহ (১১৯ হিঃ) একজন নির্ভরযোগ্য হাদীস বিশেষজ্ঞ।

– মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব আল জুহুরী (১২৪ হিঃ)। তার সময়ের অন্যতম বিশিষ্ট হাদীস বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আল জারহ ওয়া আল তা'দিলের প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞগণ প্রমাণ করেছেন যে, তিনি ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য হাদীসবেত্তা। একইস্থানে সনদ সংগ্রহের পদ্ধতি প্রথম প্রয়োগকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। সনদের ক্রমধারা ব্যাহত না করে যাতে ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে সেজন্য এই পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। আল জুহুরী তাঁর বহু উস্তাদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন কিন্তু তাঁর কোন্ উস্তাদ কোন্ হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি তার উল্লেখ করেননি। এজন্য তিনি অবশ্য সমালোচিত হয়েছেন। তবে প্রাথমিক কালের বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতি দিয়ে কাজী আইয়াদ তাঁর যে সমালোচনা করেছেন আল নববী ও আল ইরাকীর মতো বিশিষ্ট আলেমগণ তা খন্ডন করে দিয়ে বলেছেন যে আল জুহুরীর কাজের মধ্যে কোন ত্রুটি ছিল না কারণ তিনি তার কাজকে সুস্পষ্টভাবে অবহিত করেছেন, এছাড়া তাঁর উস্তাদগণের সকলেই ছিলেন নির্ভরযোগ্য।[১৮]

– ইয়াজিদ ইবনে রুমান আল আসাদী আল মাদানী (১৩৫ হিঃ) একজন তাবেয়ী। তিনি 'উরওয়াহ ও আল জুহুরীর' উপর ভিত্তি করে একখানি মাগাজী গ্রন্থ সংকলিত করেন। ইবনে ইসহাক তার গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেছেন।[১৯]

-আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর ইবনে আমর ইবনে হাজাম (১৩৫ হিঃ) একজন নির্ভরযোগ্য হাদীস বিশেষজ্ঞ তাবেয়ী।

- মুসা ইবনে উকবা (১২৬ হিঃ) একজন হাদীস বিশেষজ্ঞ ও আল জুহুরীর ছাত্র। ইমাম মালিক মাগাজী সম্পর্কিত তার গ্রন্থের প্রশংসা করে বলেছেন, তিনি হচ্ছেন মাগাজী সম্পর্কে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞ।[২০]

ইয়াহিয়া ইবনে মাঈন বলেন, "আল জহুরী থেকে বর্ণিত মুসা ইবনে উকবার গ্রন্থটি এই ধারার সবচেয়ে সহীহ গ্রন্থ।"[২১]

ইমাম শাফি বলেন, "আকারে ছোট ও অন্যান্য গ্রন্থে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা এড়িয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মাগাজী সম্পর্কে মুসা ইবনে ইকবার গ্রন্থের মতো এতো সহীহ গ্রন্থ আর দ্বিতীয়টি নেই।"[২২]

www.pathagar.com

আল দাহাবী বলেন, "মুসা ইবনে উকবার মাগাজী কিতাবখানা আকারে বড় নয়। আমরা গ্রন্থটি পাঠ করতে শুনেছি। এর অধিকাংশ সহীহ ও মুরসাল জাঈদ তবে গ্রন্থখানি খুবই সংক্ষিপ্ত, তাই এর আরও ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজন পূরণ করতে হবে।"[২৩]

- মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে নওফেল (১৩১ হিঃ)। এর গ্রন্থের নাম আল মাগাজী।[২৪]

- সোলায়মান ইবনে তারখান আল তিরী (১৪৩ হিঃ) একজন নির্ভরযোগ্য হাদীস বিশেষজ্ঞ তাবেয়ী।

– মু'য়ামার ইবনে রশীদ (১৫৩ হিঃ) একজন নির্ভরযোগ্য হাদীস বিশারদ ও জুহুরীর ছাত্র। "সত্যনিষ্ঠা, অনুসন্ধান, পরহেজগারী, মহত্ত্ব ও জ্ঞানের শ্রেণী বিন্যাসের বিরল গুণের অধিকারী মু'য়ামার ইবনে রশীদ ছিলেন জ্ঞানের এক বিশাল আধার।"[২৫]

- মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (১৫১ হিঃ) জুহুরীর ছাত্র এবং মাগাজীর ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। তার বিবরণ সহীহ পর্যায়ে উপনীত হতে পারেনি, হাসান পর্যায়ের। কেউ তার কাছে কোন রেওয়ায়েত পেশ করলে তিনি তার সনদ ব্যাখ্যা করতেন, কারণ তিনি ছিলেন একজন মুদাল্লিস। তার সীরাত গ্রন্থে হাসান ও জয়ীফ উভয়বিধ হাদীস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইবনে আদী বলেন, "আমি তাঁর হাদীসসমূহ পরীক্ষা করেছি এবং সেগুলো জয়ীফ বলে পরিগণিত হতে পারে এমন কোন কিছু দেখতে পাইনি। তিনি হয়ত কোথায় ভুল করেছেন অথবা বিভ্রান্ত হয়েছেন। এমনিটি অন্যদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। নির্ভরযোগ্য আলেম ও ইমামগণের কেউই তাঁর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিতে দ্বিধা করেননি এবং তার সম্পর্কে কেউ কোনরূপ আপত্তিও উত্থাপন করেননি।"

ইবনে আ'দীর উচ্চ মর্যাদা ও সত্যতা যাচাইয়ে তাঁর কঠোরতা অবলম্বনের কারণে এই সাক্ষ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা নয়, বর্ণনাসমূহ গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে তিনি এই মন্তব্যে উপনীত হয়েছেন। প্রাথমিক যুগের সমালোচকদের বক্তব্যের নিছক পুনরুল্লেখ তিনি করেননি। এসব সমালোচক ইবনে ইসহাককে কাদরী, শিয়া পন্থী তাদলিস ও সত্য গোপনকারী বলে অভিযুক্ত করেন।[২৬] তারা অন্যত্র হিশাম ইবনে উরওয়া ইবনে আল জুবায়েরের পত্নী ফাতিমার থেকে কথিত মিথ্যা বর্ণনার জন্য তাকে দোষারোপ করেছেন। তার মিথ্যা বর্ণনার বিষয় প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলসহ অনেক সমালোচক ইমাম তাঁর বিরুদ্ধে আনীত এসব অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছেন। আল হাফিজ আল

www.pathagar.com

দাহাবী বলেন, "এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, তিনি বংশ বৃত্তান্তের বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার জন্য অনেকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হন, যাতে কোন কিছু বাদ না পড়ে। এ বিষয়টি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় উত্তম ছিল। তিনি কবিতাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন যা আবশ্যক ছিলনা। এগুলো পরিহার করলেই ভাল হতো।

তিনি যাচাই ছাড়াই অনেক বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এরপরও বিপুল পরিমাণ সহীহ রেওয়ায়েত তিনি বাদ দিয়েছেন, যা তার হস্তগত ছিলনা। তাই তার গ্রন্থখানি সংস্কার, সংশোধন এবং তিনি যেসকল বিষয় বাদ দিয়ে গেছেন সেগুলো সংযোজন করা প্রয়োজন।"[২৭]

ইবনে ইসহাকের হাদীসের মর্যাদা নিরূপণের ক্ষেত্রে আল হাফিজ আল দাহাবী অত্যন্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ইবনে ইসহাক সম্পর্কে বলেন, "বিশেষ করে সীরাতের ক্ষেত্রে তিনি অতি উচ্চমর্যাদার অধিকারী, তবে হালাল-হারাম সম্পর্কিত তার বর্ণিত হাদীসসমূহ সহীহ থেকে হাসান পর্যায়ে নেমে এসেছে। এছাড়া যেসব রেওয়াতের ক্ষেত্রে তিনিই একমাত্র রাবী ছিলেন অথবা তাতে কিছু কিছু অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে, সেসব হাদীসকে মুনকার (অগ্রহণযোগ্য) বলে গণ্য করা হয়েছে।"[২৮]

এরফলে সীরাত সংক্রান্ত তার গ্রন্থের সকল বিবরণ সহীহ পর্যায়ে উপনীত হতে পারেনি কারণ তাতে কিছু কিছু মুনকার ও মুনকাতি হাদীস রয়েছে। এজন্য আল হাফিজ আল দাহাবী তার মিজান আল ইতিদাল (পরিমিতির মাত্রা) গ্রন্থে লিখছেন, "ইবনে ইসহাক হাদীস বর্ণনার সিহা পন্থা অনুসরণ করেছেন এবং তাঁর সীরাত গ্রন্থে মুনকার ও মুনকাতি রেওয়ায়েত ছাড়া আমি আর কোন ত্রুটি দেখতে পাইনি।"[২৯]

- আবু মা'শার আল সিন্দি (১৭১ হিঃ) মাগাজী বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তবে হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন জয়ীফ। এই আপেক্ষিক দুর্বলতা সত্ত্বেও তাঁর হাদীস সমূহ বিশেষকরে মুহাম্মাদ ইবনে ক্বাব ও মুহাম্মদ ইবনে কায়েসের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ হলো মধ্যপন্থী সমালোচকদের অভিমত। কঠোর সমালোচকদের অভিমতের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হলে হাদীস বিশেষজ্ঞদের পদ্ধতি অনুসারে তাজরিহর ক্ষেত্রে মধ্যপন্থী সমালোচকদের মতামত গ্রহণযোগ্য হতে পারে।[৩০]

- আব্দুল মালিক ইবনে মুহাম্মদ ইবনে বকর ইবনে হাজাম আল মাদানী (১৭৬ হিঃ) একজন নির্ভরযোগ্য হাদীস বিশারদ। তার গ্রন্থের নাম "আল মাগাজী"।[৩১]

www.pathagar.com

– ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ আল উমাইয়ী (১৯৪ হিঃ) একজন নির্ভরযোগ্য হাদীস বিশারদ। তিনি মাগাজী সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছেন।

– আল ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম আল দামেস্কী (১৯৬ হিঃ) একজন হাদীস বিশেষজ্ঞ।

– ইউনুস ইবনে বুকাইর (১৯৬ হিঃ) ইবনে ইসহাকের সীরাতের অন্যতম বর্ণনাকারী। তিনি মাগাজী সংকলন করেন বলে ইবনে হাজর উল্লেখ করেছেন।

– মুহাম্মাদ ইবনে উমার আল ওয়াকিদী (২০৭ হিঃ) অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও হাদীসবেত্তাগণের দৃষ্টিতে জয়ীফ। তার বিবরণে মৌলিক ঈমান, মূলনীতিমালা ও শরয়ী বিষয়ে যুক্তির অবতারণা করা হয়নি, মৌলিক বিশ্বাস, নীতিমালা ও শরিয়তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণের ক্ষেত্রে তার বর্ণনা খুবই সহায়ক। তাঁর মাগাজী গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে তিনি বিভিন্ন সূত্র থেকে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে এমন বহু ব্যক্তির নাম উল্লেখ রয়েছে, ইলম আল রিজাল গ্রন্থে আমরা তাদের জীবনী দেখতে পাইনি। ইবনে সা'দ আল ওয়াকিদীর থেকে কিছু বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন তাঁর তিনি সেগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নির্বাচন করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়েছে কারণ আমরা ইলম আল রিজাল গ্রন্থে উল্লিখিত ব্যক্তিদের জীবনীর উল্লেখ দেখতে পেয়েছি। প্রকৃতপক্ষে আল ওয়াকিদীর সনদে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ হাদীসের বর্ণনাকারী হিসেবে পরিচিতি নন, আর সেকারণে ইলম আল রিজল গ্রন্থে তাদের জীবনীর উল্লেখ নেই। এগুলো হয়ত আল ওয়াকিদী অথবা তাঁর কয়েকজন শিক্ষকের উদ্ভাবিত ভুয়া নাম।

হাদীস বিশেষজ্ঞ সমালোচকগণ মিথ্যা বলা ও হাদীস জাল করার জন্য অভিযুক্ত করে অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন কেন, তা আমরা উপরোক্ত আলোচনা থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছি। একজন রাবীর বিবরণ সংগ্রহ ও পর্যালোচনা এবং এই বিবরণের ভিত্তিতে তার মূল্যায়ন করা যে বহু সমালোচক ইমামের পদ্ধতি ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং তারা এই পদ্ধতির মানদন্ডে অধিকাংশ হাদীস বর্ণনাকারীর মূল্যায়ন করেছেন।

- মুহাম্মাদ ইবনে আইজ আল দিমস্কী (২৩৪ হিঃ) একজন নির্ভরযোগ্য হাদীস বিশেষজ্ঞ। ইবনে হাজর তার মাগাজীর কিছু নির্বাচিত অংশ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। (যেমন আল মুজাম আল মুফাররাস, পৃষ্ঠা ২৭)।

– আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল মাদানী (২২৫ হিঃ)। ইবনে আদী বলেছেন যে, তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে শক্তিশালী (কাওয়ী) ছিলেন না। ইবনে হাজর লিসান আল

www.pathagar.com

মিজান (বক্তব্যের পরিধি) গ্রন্থে তাঁর জীবনী উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটিতে প্রধানত দুর্বল বর্ণনাকারীদের জীবনী আলোচিত হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয়েছে যে ইবনে হাজর তাকে একজন নির্ভরযোগ্য হাদীসবেত্তা মনে করতেন না। তিনি অবশ্য তার জীবনী গ্রন্থে কিছু কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে তিনি হাদীস নয়, আখবারের (প্রতিবেদন) ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য ছিলেন। তবে আল মাদানী সীরাতের কতিপয় বিষয় আলোচনার জন্য খ্যাতি অর্জন করেছেন। তার একটি গ্রন্থে এই দিকটি স্থান পেয়েছে। সীরাতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় তার আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ।

–আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে নুফাইল (২৩৪ হিঃ) একখানি মাগাজী গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ও হাফিজ। তিনি বহু হাদীস মুখস্থ করেছিলেন।[৩২]

– সালিহ ইবনে ইসহাক আল জুরামী আল নাহবী (২২৫ হিঃ) হাদীস ও আখবারে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন এবং সীরাত সম্পর্কে একখানা প্রশংসনীয় গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৩৩]

– ইসমাঈল ইবনে জুমাই (জামি) (২২৭ হিঃ), আখবার আল নবী ওয়া মাগাজিহি ওয়া সারাইয়াহু (নবীর জীবনী, মাগাজী ও সারাইয়ার বিবরণ)[৩৪]

– আহমদ ইবনে আল হারিস আল খারাজ (২৫৮ হিঃ), মাগাজী আল নবী ওয়া সারাইয়াহু ওয়া আজওয়াজুহু (নবীর মাগাজী, সারাইয়া ও পত্নীগণ)।

– আব্দুল মালিক ইবনে মুহাম্মাদ আল রাকাশি আল বসরী (২৭৬ হিঃ), আল মাগাজী, তিনি সাদুক (সত্যবাদী) কিন্তু তার কিছু কিছু ভুলত্রুটিও হয়েছে।

–ইব্রাহীম ইবনে ইসমাইল আল আনবারী আল তুসী (২৮০ হিঃ), আল মাগাজী।

– ইসমাঈল ইবনে ইসহাক আল কাজী (২৮২ হিঃ) একজন আল মাগাজী প্রণেতা।

জীবনী গ্রন্থসমূহের সীরাত সম্পর্কে অবগত এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক তাবেয়ী, তাদের ছাত্র ও পরবর্তীতে আগত ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখ রয়েছে। তাদের অন্যতম হলেনঃ

– আবু ইসহাক আমর ইবনে আব্দুল্লাহ আল সাবী (১২৭ হিঃ)।

– ইয়াকুব ইবনে উতবা ইবনে আল মুগিরা আল মাদানী (১২৮ হিঃ)।

– দাউদ ইবনে আল হুসাইন আল উমাইয়ী (১৩৫ হিঃ)।

– আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল আজিজ আল হানিফী (১৬২ হিঃ)।

– মুহাম্মদ ইবনে সালিহ ইবনে দিনার (১৬২ হিঃ)।

www.pathagar.com

– আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর আল মাখরিমী আল মাদানী (১৭০ হিঃ)

এসব সূত্র তাদের রচনাকে সীরাত গ্রন্থ বলে দাবী করেননি তবে তারা সীরাত সম্পর্কে আলোচনাকালে এ প্রসঙ্গে তাদের অভিমতের কথা উল্লেখ করেছেন।[৩৫] একারণে আমি সীরাত রচয়িতাগণের নামের তালিকার মধ্যে তাদের নাম অন্তর্ভুক্তি করিনি।

এই বিশেষজ্ঞগণ প্রাথমিককালে সীরাত সম্পর্কে রচনার ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন। হাদীস সমালোচকগণ তাদের অধিকাংশকে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। বিশেষকরে আদালা ও জাবৃত্ (নির্ভরযোগ্য ও যথার্থতা) এর ভিত্তিতে তারা তাদের সম্পর্কে এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য কি-না তা নির্ণয়ের জন্য উলামাগণ এই দুটি শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ বর্ণনাকারীগণকে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করলে তাদের রচিত সীরাত গ্রন্থসমূহ অপরিসীম শিক্ষণীয় গুরুত্ব লাভ করে, কারণ হাদীস রিশেষজ্ঞগণ কাউকে নির্ভরযোগ্য হিসেব গণ্য করার জন্য কঠোর পদ্ধতি অনুসরণ করেন।[৩৬]

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের সীরাতকে হারিয়ে যাওয়া, পরিবর্তন ও অতিরঞ্জনের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। ঐতিহাসিক ও গাল্পিকদের হাতে পড়ার অনেক আগেই মহান আল্লাহ হাদীস বিশেষজ্ঞগণকে সীরাতের প্রতি যত্নবান করে প্রথম দিককার সূত্রসমূহ লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে সীরাতকে সংরক্ষণ করেন। এটি সীরাত সূত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা অন্য কোন ইতিহাস বা আখবার গ্রন্থে পাওয়া যায়না।

বর্ণনার ক্ষেত্রে হাদীস বিশেষজ্ঞগণের বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে। এই বিশেষজ্ঞগণ ছিলেন বিজ্ঞ "আলেম" যারা হাদীসের সনদ ও মতন সমালোচনার জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তাদের এই পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত নির্ভুল ও ঐকান্তিক এবং যেকোন সংযোজন বা অতিরঞ্জন থেকে মুক্ত।

আমি এই মহান সীরাত বিশেষজ্ঞগণের যেসব রচনার কথা উল্লেখ করেছি তার বেশীর ভাগই হারিয়ে গেছে কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের কাছে যেসব সূত্র পৌঁছেছে তা তাদের রচনার উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে এবং তার অধিকাংশই সনদের সঙ্গে এসেছে। পরবর্তী রচনাসমূহ প্রাথমিক রচনাসমূহের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে এবং তাতে কেবল বিষয়বস্তুই নয় তার বিন্যাস পদ্ধতিও অনুসৃত হয়েছে। আমাদের কাছে যেসব সীরাত গ্রন্থ পৌঁছেছে তার অন্যতম হলো সীরাত ইবনে হিশাম।

www.pathagar.com

ইবনে হিশামের সীরাত হচ্ছে ইবনে ইসহাক রচিত সীরাত গ্রন্থের একটি সংশোধিত রূপ। ইবনে হিশাম এই গ্রন্থে বহু ইসরাইলিয়াত ও কবিতা বাদ দিয়েছেন এবং ভাষা ও বংশবৃত্তান্ত সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংযোজন করেছেন। এই সংশোধনীর পর গ্রন্থখানি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। ইবনে হিশামের পরবর্তী লেখকগণ তার গ্রন্থের উপর নির্ভর করেন। বস্তুতপক্ষে তাঁর মাগাজী গ্রন্থে মহানবীর (সা.) জীবনের যে নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠেছে তা হাদীসের সহীহ কিতাবের খুবই কাছাকাছি পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এই সীরাত গ্রন্থখানি অত্যন্ত বিশুদ্ধ। আল হাফিজ আল সুহাইলী (৬৮১ হিঃ) তাঁর আল রুয়াদ আল আনিফ (গুলিস্তানের গৌরব) গ্রন্থে সীরাত ইবনে হিশামের ব্যাখ্যা করেছেন।

অন্যান্য সূত্রের মধ্যে রয়েছে মুহাম্মাদ ইবনে উমার আল ওয়াকিদীর (২০৭ হিঃ) মাগাজী আল ওয়াকিদী। তিনি অনেক ক্ষেত্রে সীরাতে ইবনে হিশামের কলেবর বৃদ্ধি করেছেন।[৩৭] আল ওয়াকিদী বিভিন্ন বিষয়ে নিজস্ব অভিমত প্রদান এবং কোনটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য তা উল্লেখ করেন।[৩৮] তিনি যে সীরাত সম্পর্কে বিপুল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন আলেমগণ সে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন তবে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ তাকে জয়ীফ বলে গণ্য করেছেন।[৩৯]

আল নাসাঈ বলেছেন, "তিনি (আল ওয়াকিদী) হাদীস জাল করেছেন।" ইমাম শাফী, আবু দাউদ, ইবনে আবু হাতিমও হাদীস জাল করার জন্য তাকে অভিযুক্ত করেন। ইমাম আহমদ বলেন, "তিনি একজন কাজজাফ (মিথ্যুক)।"

ইবনে আদী বলেন, "তাঁর হাদীসসমূহ মশহুর নয় এবং তাতে বহুবিধ সমস্যা রয়েছে।"

ইবনে হাজর বলেন, "তিনি বিপুল জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মাতরুক (অগ্রহণযোগ্য)।"[৪০]

ইবনে সাঈদ আল নাস তাকে সমর্থন করেন তবে অন্যদের ব্যাখ্যা ও যুক্তির কাছে এই সমর্থন অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

– মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ (২৩০ হিঃ) আল তাবাকত আল কুবরা (উচ্চতর শ্রেণী) এর প্রথম দুখন্ডে সীরাত প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। ইবনে সা'দ নির্ভরযোগ্য এবং তিনি আল ওয়াকিদীর শ্রেষ্ঠ রেওয়ায়েতসমূহ নির্বাচন করেন। (আল খতিব আল বাগদাদী এবং ইবনে হাজরও অনুরূপভাবে তা নির্বাচন করেন। তিনি আল ওয়াকিদীর মতো জয়ীফ বর্ণনাকারীগণের থেকে বর্ণনা করেন)। আল ওয়াকিদী থেকে তিনি এতো বিপুল পরিমাণ বর্ণনা করেন যে, ইবনে আল নাদিম তাকে আল ওয়াকিদীর লেখা থেকে চুরি করার জন্য দোষারোপ করেন। পূর্ণাঙ্গ গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে ইবনে সা'দের রচনার একটা নিজস্ব পদ্ধতি ছিল এবং তাঁর অন্যান্য

www.pathagar.com

উস্তাদের মতো আল ওয়াকিদীর থেকে বিপুল সংখ্যক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন। তাঁর এই উস্তাদগণের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন আফফান ইবনে মুসলিম, ওবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা এবং আল ফজল ইবনে দাকিন। তাঁরা সকলেই ছিলেন হাদীস বিশেষজ্ঞ।[৪১]

– খলিফা ইবনে খাইয়াত (২৪০ হিঃ), তারিখ। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য হাদীস বিশেষজ্ঞ এবং সহীহ বুখারী শরীফের ইমাম বুখারীর অন্যতম উস্তাদ। তাঁর এই গ্রন্থটি একখানি সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ। এর শুরুতে সীরাতের ঘটনাবলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে তিনি ইবনে ইসহাকের উপর সমধিক নির্ভরশীল ছিলেন।[৪২]

– আহমদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে জাবির আল বালাদুরী (২৭৯ হিঃ) আনসাব আল আশরাফ (মহোত্তম ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত)। এই সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থখানি বংশবৃত্তান্ত গ্রন্থের শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আল বালাদুরী এর প্রথম খন্ডে প্রধানত সীরাত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। হাদীস বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টিতে আল বালাদুরী একজন জয়ীফ বর্ণনাকারী। ইবনে হাজর দুয়াফা (লিসান আল মিজান) সংক্রান্ত গ্রন্থে তাঁর জীবনীর উল্লেখ করেছেন।[৪৩]

–মুহাম্মদ ইবনে জারির আল তাবারী (৩১০ হিঃ), তারিখ আল রাসূল ওয়া আল মুলুক (নবী-রাসূল ও বাদশাহদের ইতিহাস)। এই ইতিহাসগ্রন্থের এক খন্ডে কেবল সীরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আল তাবারী নির্ভরযোগ্য এবং তিনি অধিকাংশ বিবরণের জন্য ইবনে ইসহাকের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি

– ইবনে আব্দুল বার আল কুরতুবী (৪৬৩ হিঃ), দুরার ফি ইখতিসার আল মাগাজী ওয়াল সাইয়ার (মাগাজী ও সাইয়ারের সংক্ষিপ্ত রত্নরাজী)। তিনি ছিলেন তার যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশেষজ্ঞ। তিনি ইবনে আবু কাতামের সীরাত এবং হাদীসের কিতাবসমূহের উপর নির্ভর করেছেন।[৪৪] তিনি মাত্র একটি স্থানে আল ওয়াকিদীর রচনা থেকে বর্ণনার কথা উল্লেখ করেছেন।[৪৫] তবে তিনি তার মাগাজী থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন বলে আভাস দিয়েছেন।[৪৬] ইবনে আব্দুল বার আল কুরতুবী বলেছেন যে, তিনি তার গ্রন্থের কাঠামোর ক্ষেত্রে ইবনে ইসহাকের অনুসরণ করেন[৪৭] কিন্তু সনদের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত করেননি।

- ইবনে হাজম আল জাহিরী (৪৪৫ হিঃ), জাওয়ামী আল সিরাহ (সীরাত সংগ্রহ) গ্রন্থে সনদ উল্লেখের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণের অনুসৃত বিশ্লেষণী পদ্ধতি উপেক্ষা করেন এবং সূত্র সম্পর্কে কোন আভাস দেননি।[৪৮] যেসব রেওয়ায়েত অধিকতর নির্ভরযোগ্য ইবনে হাজম আল জাহিরী সেগুলো বর্ণনা করেন এবং তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ

www.pathagar.com

করেন।[৪৯] তার বর্ণনার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এর সংক্ষিপ্তরূপ। এজন্য তিনি সীরাত গ্রন্থের কবিতা ও কাহিনীসমূহ পরিহার করেন।[৫০]

– ইবনে আল আসির আল জাজারী (৬৩২ হিঃ), আল কামিল ফি আল তারিখ। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক। তাঁর গ্রন্থটি একটি সাধারণ ইতহাস গ্রন্থ এবং এর এক খণ্ডে একান্তভাবেই সীরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

– ইবনে সাঈদ আল নাস (৭৩৪ হিঃ), আইয়ূন আল আসর ফি ফুনুন আল মাগাজী ওয়া আল শামাইল ওয়া আল সাইয়ার (মাগাজী, শামাইল ও সাইয়ার সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শনের উৎস)। ইবনে সাঈদ আল নাস একজন নির্ভরযোগ্য হাদীস বিশেষজ্ঞ। আল দাহাবী ও ইবনে কাসির তাঁর রচনার বিশুদ্ধতা প্রমাণ করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় সূত্রের পরিচিতি তুলে ধরেছেন।

– ইবনে কাইয়ুম আল জাওজিয়াহ (৭৫০ হিঃ) ছিলেন তাঁর সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তি। তাঁর রচিত গ্রন্থ জাদ আল মা'দ ফি হাদায়ী খায়ের আল ইবাদ (শেষ পরিণতির পাথেয় সম্পর্কে মহানবীর হেদায়েত) তাঁর গ্রন্থখানি শামাইল, আদব, ফিকহ ও মাগাজীর ক্ষেত্রেও মূল্যবান; কারণ এতে এবিষয়গুলোও আলোচিত হয়েছে।

– আল হাফিজ আল দাহাবী (৭৪৮ হিঃ), আল সিরাহ আল নাবুবিয়াহ। তিনি ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য লেখক ও অসাধারণ সমালোচক, বিশেষ করে হাদীস বিশেষজ্ঞগণের পদ্ধতি প্রয়োগে তার কৃতিত্ব সমধিক। মূলবক্তব্য অনুসন্ধানে যারা পুরোপুরিভাবে এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখিত রেওয়ায়েতের মাত্র দু'একটির সমালোচনা করেছেন।

– আল হাফিজ ইবনে কাসির (৭৭৪ হিঃ), আল বিদাইয়া ওয়া আল নিহাইয়া (শুরু ও শেষ) একটি সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ। এর একাংশ জুড়ে রয়েছে সীরাত প্রসঙ্গ। ইবনে কাসির ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য ইমাম এবং তিনি রেওয়ায়েতসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেছেন। আল দাহাবী, ইবনে হাজর এবং ইবনে ইমাদ আল হাম্বলী তাঁর বিশুদ্ধতা প্রমাণ করেছেন।

– আল মাকরিজী, ইম্‌তা আল আসমা (শ্রুতির পরমানন্দ)। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। আল মাকরিজী সংক্ষিপ্তকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন এবং সনদ

www.pathagar.com

উল্লেখের বিষয় অগ্রাহ্য করেন। আল সাখাবী তার গ্রন্থে আল ইমতা সম্পর্কে বলেন, "এতে সমালোচনা করার মত অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।"[৫১]

- আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ আল কাস্তালানী (৯২৩ হিঃ), আল মাওয়াহিব আল লাদুনিয়াহ বি আল মিনাহ আল মুহাম্মাদিয়া [মুহাম্মাদকে (সা.) নিবেদিত অলৌকিক উপহার]।

- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল বাকী আল জারকাহী (১১২২ হিঃ), শরহ্ আল মাওয়াহিব আল লাদুনিয়াহ (আল মাওয়াহিব আল লাদুনিয়ার ব্যাখ্যা)। শামাইল ও সীরাত সংক্রান্ত বিপুলায়তন গ্রন্থসমূহের অন্যতম এই গ্রন্থে আল মাওয়াহিব ও এর ব্যাখ্যা আলোচিত হয়েছে।

- বুরহান আল দ্বীন আল হালাবী (৮৪১ হিঃ), আল সিরাহ আল হালাবাইয়াহ। এই গ্রন্থে ইসরাইলিয়াত থেকে অনাবশ্যক বিস্তারিত বিবরণ ও কাহিনী সংযোজিত করা হয়েছে।[৫২] রচয়িতার বর্ণনার সনদ বাদ দিয়ে কেবল রাবী ও খবরের কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা গরীব হাদীসের কিছু সংখ্যকের ব্যাখ্যা করেছি এবং অন্যান্য বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেছি।

- মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আল দিমাস্কী আল শামী (৯৪২ হিঃ), সুবুল আল হুদা ওয়া আল রাশাদ ফি সিরাহ খায়ের আল ইবাদ (সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের সীরাতের দিক নির্দেশনা ও জ্ঞানের পন্থা)। লেখক তিন শতাধিক গ্রন্থ থেকে তার গ্রন্থের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করেন।

সীরাত সম্পর্কে আমরা যেসমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসের সন্ধান লাভ করেছি উপরে উল্লেখিত গ্রন্থসমূহ তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কোরআন শরীফ ও হাদীসের কিতাবসমূহের পরে এসব গ্রন্থের স্থান। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে সীরাত গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়ই সহীহ পর্যায়ের। সকল সীরাত গ্রন্থ যে সহীহ তা নয়, সহীহ ও জয়ীফ উভয় ধরনের সীরাত গ্রন্থ রয়েছে। সীরাত অধ্যয়নকালে আমাদেরকে সর্ব প্রথমে সহীহ গ্রন্থের উপর নির্ভরশীল হতে হবে, এরপর হাসান অথবা হাসানের নিকটবর্তী বিবরণের সাহায্যে একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করতে হবে এবং মৌলিক ঈমান, শরিয়ত অথবা তাশরি সম্পর্কিত বিষয়ে কোন জয়ীফ বর্ণনা গ্রহণ করা যাবে না। উচ্চতর নৈতিক মান অর্জনে উৎসাহ প্রদান অথবা ভবন নির্মাণ হস্তশিল্প, কৃষিকাজ, ইত্যাদি সম্পর্কে শক্তিশালী বর্ণনা না পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে সীরাত গ্রন্থের বিবরণ প্রয়োগ দূষণীয় হবে না।

www.pathagar.com

নিম্নে হাদীস বিশেষজ্ঞগণের অনুসৃত পদ্ধতি বিধৃত হল। আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী (১৯৭ হিঃ) বলেন, "আমরা মহানবীর (সা.) হালাল, হারাম ও আহকাম সম্পর্কিত হাদীসমূহ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সনদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করি এবং সনদে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমালোচনার ক্ষেত্রেও অধিকতর কঠোর পন্থা অনুসরণ করি। নৈতিক উৎকর্ষ, সওয়াব (পুরস্কার) ও ইকাব (শাস্তি) সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আমরা সনদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করিনি এবং সনদে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের প্রতিও নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছি।"[৫৩]

হাদীস বিশেষজ্ঞগণের হাদীস সমালোচনার পদ্ধতি অনুসারে সীরাতের সনদ ও মতনকে গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। এরূপ করা হলে তা আমাদের জন্য সহায়ক হবে কারণ বস্তুত প্রতিটি বর্ণনার সনদের সঙ্গে সীরাতের সকল গুরুত্বপূর্ণ সূত্র যুক্ত রয়েছে। এছাড়া অধিকাংশ সীরাত বর্ণনাকারী হাদীস বিশেষজ্ঞ এবং কুতুব আল রিজালে তাদের জীবনীর উল্লেখ রয়েছে। এসব কিতাবে তাদের মর্যাদা নিরূপণ এবং জারহ ও তাদিল হিসেবে তাদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বর্তমানে কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ হাদীস বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন না। তারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ও তাদের মর্যাদা জানা, তা পরীক্ষা করা, উলুম আল হাদীসে পারদর্শিতা অর্জন এবং ঐতিহাসিক বিবরণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগের অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রচেষ্টাকে কঠিন ও অলঙ্ঘ্য বলে গণ্য করেন। আরেকদল বিশেষজ্ঞ ভিন্ন কারণে এই পদ্ধতিকে উপেক্ষা করেন। তারা অন্যদেরকে এর গুরুত্বের ব্যাপারে সংশয়ের মধ্যে নিপতিত করে এর কল্যাণের দিককে লঘু করে উপস্থাপন এবং নগণ্য ত্রুটি বিচ্যুতিকে বড় করে দেখিয়ে এই পদ্ধতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন।

কয়েকজন বিশেষজ্ঞ যে উলুম আল হাদীসের বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। আসাদ রুস্তম খৃস্টান হওয়া সত্ত্বেও কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব ছিল না। তিনি হাদীস বিশেষজ্ঞগণের সমালোচনার পদ্ধতির ব্যাখ্যা করেন এবং প্রমাণ করেন যে, হাদীস বিশেষজ্ঞগণ সর্বপ্রথম এই পদ্ধতির প্রয়োগ করেন এবং তারা এক্ষেত্রে অতুলনীয় সাফল্য অর্জন করেন। রুস্তম তার মুস্তালাহ আল তারিখ (ইতিহাসের পরিভাষা) গ্রন্থে এই বিষয়টি উল্লেখ করেন। কেউ সীরাত ও ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করতে চাইলে তাকে অবশ্যই এই সমালোচনার পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে আকিদা, শরিয়ত ও ইসলামী ব্যক্তিত্বের বিনির্মাণের বিষয় নিষ্পত্তি

www.pathagar.com

করা হয়েছে। এছাড়া খোলাফায়ে রাশেদা এবং উমাইয়া ও আব্বাসী শাসনের ইতিহাস অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতির প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। ইতহাস হচ্ছে আখবারীদের নির্বাচিত বিবরণের মিশ্র সংকলন। আখবারীগণের ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক ও গোষ্ঠীগত উদ্দেশ্য থাকে এবং তারা পার্থিব স্বার্থের দ্বারাও প্রভাবিত হয়ে থাকেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কেউ কেবল আবু মিখনাফের রচনা থেকে উমাইয়া শাসনামল সম্পর্কে একটা চিত্র তুলে ধরতে চাইলে তার এই চিত্র আওয়ানা ইবনে আল হাকাম অথবা আবু আল ইয়াকজান আল নাসাবাহ কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হবে।

সম্পূরক উৎস

বিশুদ্ধতা ও বিন্যাসের গুরুত্বের দিক থেকে পবিত্র কোরআন, হাদীস ও শ্রেষ্ঠ সীরাত গ্রন্থসমূহের পরেই হচ্ছে সম্পূরক উৎসের স্থান। এই উৎস একটি পরিপূর্ণ চিত্র উপস্থাপন করে এবং মূল উৎস ব্যবহারের পর যে শূন্যতা থেকে যায় তা পূরণ করে।

সাহিত্যকর্মে মহানবীর (সা.) আমলের সাংস্কৃতিক জীবন, জীবনযাত্রার মান, পোশাক, খাদ্য সামগ্রী ও আচার আচরণের ধরন এবং জীবনের অন্যান্য দিকের যে চিত্র পাওয়া যায়, বিশেষ করে কবিতাকে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয় কারণ এতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সমাজ জীবনের প্রতিফল এবং যুদ্ধের বীরত্বের নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠেছে। এখানে সীরাতের কতিপয় দিকের এরূপ চিত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে হাসান ইবনে সাবিত, কাব ইবনে মালিক ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার ভূমিকার উল্লেখই যথেষ্ট। তবে আমাদেরকে সাহিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত শাদদ (বিরোধপূর্ণ), গারীব (অস্বাভাবিক) ও তারিফ (কৌতূহল) সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। এই সাহিত্যকর্মে জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার বর্ণনার পরিবর্তে এ ধরনের বিষয় অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে বিবৃত হয়েছে। এথেকেই এসব রচনার বিষয়বস্তুকে সার্বজনীন রূপ দেয়ার বিপজ্জনক দিকটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সাহাবীগণ (রাঃ) সম্পর্কিত গ্রন্থে রাসূলের (সা.) জীবদ্দশায় বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গের জীবনী পাওয়া যায়। এতে সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য রয়েছে তবে তা সীমিত ও বিক্ষিপ্ত। এই তথ্যের অনেকগুলিতে তাদের সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়েছে। সাহাবীগণ সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহ কুতুব আল রিজাল ও অন্যান্য জীবনীগ্রন্থে সীরাত গ্রন্থের উল্লিখিত সনদের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের চমৎকার বিবরণ রয়েছে। এই গ্রন্থসমূহ সীরাতের সূত্র গবেষণার উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার এবং বিশেষজ্ঞগণকে সনদ সমালোচনায় সক্ষম করে তুলেছে।

www.pathagar.com

ভূগোল সম্পর্কিত ইতিহাস গ্রন্থসমূহে সীরাতের ঘটনাবলীর স্থান ও আরব উপদ্বীপের ভূপ্রকৃতির বিবরণ রয়েছে। এসব গ্রন্থে জীবনযাত্রার মান, কৃষি উৎপাদন, বিভিন্ন স্থানের মধ্যকার দূরত্ব এবং বিভিন্ন গোত্রের আবাসস্থলের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

তাই দেখা যাচ্ছে যে, সম্পূরক উৎসগুলো সীরাত সম্পর্কিত বিষয়ের পূর্ণতা প্রদান এবং ছোট ছোট ঘটনা স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে সহায়ক।

এখানে সীরাতের উৎস সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পেশ করা হলো। উপসংহারে আমি ইতিহাস সমালোচনা ও ব্যাখ্যার জন্য আমাদের যে একটি ব্যাপকভিত্তিক পদ্ধতি জরুরী সে কথাটিই তুলে ধরতে চাই। ইতিহাস সমালোচনা ও ব্যাখ্যার পদ্ধতি সঠিক না হওয়া পর্যন্ত ইসলামী ইতিহাস গবেষণা সীমাবদ্ধতার গণ্ডি অতিক্রম করতে পারবে না এবং আমাদের উম্মাহর ইতিহাসের যথার্থ জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম হবেনা।

ইউরোপীয় চিন্তাধারা ইতিহাসের প্রকৃতি এবং ইতিহাস সমালোচনা ও ব্যাখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে বিপুল সংখ্যক গবেষণাকর্মের জন্ম দিয়েছে। তার কিছু কিছু আরবী ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে।[৫৪] কিন্তু ইউরোপীয় জীবন দর্শন, ইউরোপীয় ইতিহাসের প্রকৃতি এবং গবেষণার ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিশেষ সমস্যাসমূহ মোকাবেলার উপর ভিত্তি করে সম্পাদিত এসব গবেষণায় পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। ইউরোপীয় ইতিহাস থেকে এই গবেষণার প্রাসঙ্গিক বিষয় গ্রহণ করা হয়েছে। আকিদা এবং আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীলতার ভিত্তিতে আমাদের অনুরূপ পর্যায়ে গবেষণা প্রয়োজন যাতে পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের ইতিহাসকে বিবেচনা করা হবেনা।

একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বেশ কয়েকজন মুসলিম বিশেষজ্ঞ প্রাথমিক গবেষণা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।[৫৫] এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস রচনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাদের এই অভিমত অবশ্য উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত হতে এবং গবেষণার উপযোগী একটি পদ্ধতি উপস্থাপন করতে পারেনি। এছাড়া যথার্থ ইসলামী নীতিমালার আলোকে ইসলামী ইতিহাস বিশ্লেষণের ভিত রচনার জন্য একটি ব্যাপকভিত্তিক ও গ্রহণযোগ্য তত্ত্বও এসব গবেষণায় যথার্থরূপ লাভ করতে পারেনি।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র ঃ

১. এ ধরনের ত্রুটি যারা করেছেন তাদের একজন হলেন আবু রায়হান। তার গ্রন্থের নাম আদওয়া আলা আল সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়া।

২. মুহাম্মদ দারওয়াজা রচিত সীরাত আল রাসূল গ্রন্থে সীরাত সম্পর্কিত কোরআনের আয়াত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩. সূরা আনফাল (৮) এ বদরযুদ্ধ, সূরা আল ইমরান (৩) এ ওহুদ যুদ্ধ, সূরা আল আহজাব (৩৩) এ খন্দকযুদ্ধ এবং সূরা আত তাওবা (৯) এ হুনায়নের যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য সূরাতেও এসব ঘটনা উল্লেখ রয়েছে।

৪. সূরা আল বাকারা (২) এ বুদ্ধিবৃত্তিক সংঘাত এবং সূরা হাশর ও সূরা আহজাবে বস্তুগত সংঘাতের উল্লেখ রয়েছে।

৫. আল দুরি, নাশা'ত ইলম আল তারিখ ইন্দ আল আরাব, পৃষ্ঠা ১৮, ৫১। সালেহ আল আলী, মুহাদারারত ফি তারিখ আল আরাব কাবল আল ইসলাম।

৬. সালেহ আল আলী, মুহাদারাত ফি তারিখ আল আরাব কারল আল ইসলাম।

৭. ইবনে কাসিরের তাফসিরের ভূমিকা

৮. দেখুন, সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল মাগাজী (মাগাজী অধ্যায়)।

৯. বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন ধরনের পূর্ব সতর্কীকরণ ছাড়াই রাসূল (সা.) বানু-মুস্তালাক গোত্রের উপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন। আয়াত অনুসারে সাধারণ আচরণের সঙ্গে এই পদক্ষেপের অসঙ্গতি রয়েছে। সীরাত গ্রন্থসমূহে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বানু মুস্তালাক গোত্রকে সতর্ক করেছিলেন, তাই দেখা যাচ্ছে যে, শত্রুকে সতর্কীকরণ সংক্রান্ত ইসলামী শরয়ী আইন উপলব্ধি না করেই আমরা যদি সহীহ হাদীসের রেওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ি তা হলে ভুল করবো এবং সংশয়ে নিপতিত হবো। দেখুন, মুহাম্মদ আল গাজালী, ফিকহ আল সীরাত (সীরাত অনুধাবন), চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১০, ৩০৮।

১০. মুফতাহ্ কুনুজ আল সুন্নাহ (সুন্নাহের রত্নভান্ডারের চাবি) গ্রন্থখানি সীরাতের ঘটনাবলী সংক্রান্ত গুরুত্বপর্ণ হাদীসের ব্যাপারে একটি ধারণা প্রদান করেছে। আল মুজাম আল মুফাহরাস ফি আল ফাজ (Concondonce et Indices de to Tradition Musulmone) রচয়িতা Wensinck এবং অন্য কয়েকজন প্রাচ্যবিদও সীরাত সম্পর্কিত হাদীস অনুসন্ধানে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন।

১১. সহীহ আল বুখারী, ২! খণ্ড পৃষ্ঠা ২৬, বুলাক সংস্করণ। সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থ।

১১. সহীহ আল বুখারী ২! খন্ড পৃষ্ঠা ২৬, বুলাক সংস্করণ। সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থ।

১২. আল নাদিম, আল ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা ১১৩।

১৩. সায়ার আলাম আল নূবালা (সেরা জীবনী), ৬/১১৬।

১৪. আল নাদিম, ফিহরিস্ত, পৃষ্ঠা, ২৭২।

১৫. সীরাত সংক্রান্ত ব্যাপক গবেষণাগ্রন্থের মধ্যে রয়েছেঃ হরোভিতজ, আল মাগাজী আল উলা ওয়া মুয়ালি-ফুহা (প্রথম মাগাজী ও তার লেখক), মারগোলিউথ, দিরাসাত আন মুয়ারিখিন আল আরাব (আরব ইতিহাস গবেষণা), আব্দুল আজিজ আল দুরি, নাশাত ইলম আল তারিখ ইন্দ আল আরাব (আরবদের মধ্যে ইতিহাস জ্ঞানের উন্মেষ)।
সালেহ আল আলী, মুহাদারাত ফি তারিখ আল আরাব কাবল আল ইসলাম অধ্যায় (প্রাক ইসলামী আরব ইতিহাস সম্পর্কিত বক্তৃতামালা)। জাওয়াদ আলী, তারিখ আল আরব ফি আল ইসলাম আল সীরাহ আল নবুবিয়াহ; (ইসলামী যুগে আরব ইতিহাসঃ সীরাতুন্নবী)।

www.pathagar.com

সাঈদ ইসমাঈল কাসিফ, দিরাসাহ ফি মাসাদির আল তারিখ আল ইসলামী (ইসলামী ইতিহাস গবেষণার উৎস)। হুসাইন নাসের, নাশাত আল তাদবিন আল তারিখ ইন্দ আল আরাব (আরবদের ইতিহাস রচনার বিকাশ)।

আল মাগাজী গ্রন্থ রচনায় অগ্রণী লেখকদের সম্পর্কে বিশেষ গবেষণা কর্মের উদাহরণঃ আল দুরি, দিরাসাহ ফি সীরাহ আন নবী ওয়া মু'য়াল্লিফুহা ইবনে ইসহাক (নবীর সীরাত ও তার লেখক ইবনে ইসহাক সম্পর্কে গবেষণা। ফার্কস, স্ট্যাডি এবাউট মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক। খালিদ আল মাসাইলী এর নিবন্ধ "আলী আল মাদাইনী" আকরাম আল উমরির নিবন্ধ "মুসা ইবনে উকবাহ"।

১৬. সম্প্রতি ডঃ মুহাম্মাদ মুস্তাফা আল আযমী উরওয়াহর বিবরণগুলো সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছেন।

১৭. আল খতিব, তারিখ আল বাগদাদ ১২/২৩০।

১৮. আল নওয়াবী, শারহ সহীহ মুসলিম (সহীহ মুসলিম শরীফের তাফসির) ৫/৬২৩ এবং আল ইরাকী, তারহ আল তাসরিব (দোষ খন্ডন) ৮/৪৭।

১৯. ইবনে হাজারী, তাহজীব আল তাহজীব (সংশোধনীর সংশোধনী, ৯/২১৫।

২০. আল দাহাবী, সাইয়ার আল আলাম, ৬/১১৫।

২১. প্রাগুক্ত, ৬/১১৭।

২২. আল খতিব, আল জামিলি আখলাক আল রাবী ওয়া আদাব আলসামী (বর্ণনাকারীর বৈশিষ্ট্য ও শ্রোতার আদব সম্পর্কিত গ্রন্থ), পৃষ্ঠা, ২২৫।

২৩. আল দাহাবী, সাইয়ার আল আলাম, ২/১১৫-৬।

২৪. আনসাব আল আশরাফ (মহৎ ব্যক্তির বংশবৃত্তান্ত), ১/১১২, ৩১৫।

২৫. আল দাহাবী, সাইয়ার আলাম, ৭/৬।

২৬ প্রাগুক্ত, ৭/১৩৯।

২৭. প্রাগুক্ত, ৭/১৩৯।

২৮. আল দাহাবী, সাইয়ার আলাম ৭/২৭। তারহ আল তাসরিব শারহ আল তারিক (দোষ খন্ডন ও অনুমানের ব্যাখ্যা, ৮/৭২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছেঃ বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক ইবনে ইসহাকের হাদীস গ্রহণ করার বিষয় সুবিদিত তবে তিনি মুদাল্লিস। প্রাপ্ত হাদীসের সনদ বর্ণনা করলে তাঁর বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতো।

২৯. মিজান আল ইতিদাল, ৩/৪৬৯।

৩০. দেখুন, ইবনে হিব্বান, আলমাজরুহুন (অনির্ভরযোগ্য রাবীবৃন্দ), ৩/৬০। আল বুখারী, আত তারিখ আল কবীর (বৃহদায়তন ইতিহাস গ্রন্থ), ৮/১১৪, আল খতিব, তারিখ আল বাগদাদ, ১৩/৪২৭, আলদাহাবী, সাইয়ার আলম, ৭/৪৩৫-৪৪০, ইবনে হাজর, তাহজিব ১০/৪২০-৪২১।

৩১. আল নাদিম, আল ফিহরিস্ত, ২৮২।

৩২. আল ইসাবাহ ফি তামিজ আল সাহাবা (সাহাবাদের জীবনের সত্য কাহিনী), ১/২৪২।

৩৩. আল খতিব, তারিখ বাগদাদ, ৯/৩১৪।

৩৪. আল নাদিম, আল ফিহরিস্ত, ১১২।

৩৫. দেখুন, ইবনে আবু হাতিম, তারাজুমুহুম ফি আল জারহ ওয়া আল তাদিল (জারহ ওয়া আল তাদিল-এ তাদের জীবনীসমূহ) ২/২/২৬০; আল খতিব, তারিখ বাগদাদ, ১২/২৩০; ইবনে হাজর, তাহাজিব, ১/৩৬৩-৭, ৫/১৭২, ৬/৩৮৮. ১১/২৯৩; তারিখ আল তুরাস আল আরাবী (আরবদের দুর্দশার ইতিহাস), ২/৪৫৬।

www.pathagar.com

৩৬. আকরাম আল উমরী, খলিফা ইবনে খাইয়াত রচিত তারিখ-এর ভূমিকা, ২৪-২৫।
৩৭. মার্সডেন জন্স, মাগাজী আল ওয়াকিদীর ভূমিকা, ৩৪, আল দুরি, নাশাত ইলম আল তারিখ ইন্দ আল আরাব, ৩১।
৩৮. মার্সডেন জন্স, মাগাজী আল ওয়াকিদীর ভূমিকা, ৩৪।
৩৯. আল খতিব, তারিখ বাগদাদ, ৩/২১।
৪০. ইবনে হাজরের তাহজিব এবং তাকরিব আল তাহজিব-এ তার জীবনী দেখুন।
৪১. আকরাম আল উমরী, বুহুস ফি তারিখ আল সুন্নাহ আল মুশাররাফাহ (মহত্তম সুন্নাহর ইতিহাস গবেষণা।
৪২. আকরাম আল উমরী, তারিখে খলিফা ইবনে খাইয়াত-এর ভূমিকা, ২৬-২৭।
৪৩. আল তাবারী, তারিখ আল রাসূল ওয়া আল মুলুক, আবুল ফজল ইব্রাহীম, ১/৮।
৪৪. শাউকি দায়াফ, আল দুরার এর ভূমিকা, ৮।
৪৫. ইবনে আব্দুল বার, আল দুরার, ৩৯।
৪৬. প্রাগুক্ত, ২৭৬।
৪৭. প্রাগুক্ত ২৯। আরও দেখুন শাউকি দায়াফ এর আল দুরার এর ভূমিকা, ১২।
৪৮. জাওয়ামী আল সিরাহ গ্রন্থের তিনটি স্থানে খলিফা ইবনে খাইয়াত, অনুরূপ স্থানে আবু হাসান আল জাওয়াদীর ইতিহাস, এবং একটি স্থানে আব্দুল বারীর আল দুরার থেকে উদ্ধৃতি দেয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এই গ্রন্থখানি যারা গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন তারা এতে কিছুটা পরিবর্তন সাপেক্ষে আল দুরার থেকে বিপুল পরিমাণ বর্ণনা উদ্ধৃত করার বিষয় উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। শাউকী দায়াফের জাওয়ামী আল সিরাহ-এর ভূমিকা, ১৫ এবং আল দুরার-এর ভূমিকায়, ১৫, এ বিষয়টির সমর্থন রয়েছে।
৪৯. জাওয়ামী আল সিরাহ-এর ভূমিকা, ১০।
৫০. প্রাগুক্ত, ১৩।
৫১. আল শাউকী, আল ইলান বি আল তাওয়ারিখ (পুনঃপ্রমাণের ঘোষণা), রোজেন্থাল, ইলম আল তারিখ ইন্দ মুসলিমুন (মুসলিম ইতিহাস রচনার ইতিহাস) এর সংশোধনী, ৩০।
৫২. জাওয়াদ আলী, তারিখ আল আরব কাবল আল ইসলাম আল সিরাহ আল নবুবিয়া, ১০।
৫৩. ফাতহ আল মুগিস, ১/২৮৪।
৫৪. উদাহরণস্বরূপ দেখুন: কলিং উড, দি আইডিয়া অব হিস্টরি, এডওয়ার্ড কার, হোয়াট ইজ হিস্টরি?; এ, এল, রাউস, হিস্টরি, ইটস ইনফ্লুয়েন্স এন্ড বেনিফিট; ফ্রেডারিক এঞ্জেলস, সোশ্যালিষ্ট ইন্টারপ্রিটেশন অব হিস্টরি, ল্যাঞ্জিলয়েস উইসিনবোস, হিস্টরিক্যাল ক্রিটিসিজম; আর্নেস্ট ক্যাসিরার, কলার্নিং হিস্টরিক্যাল নলেজ; জোনেফ হর্স, দি ইম্পরটান্স অব হিস্টরি, এমারি নাফ, হিসটরিয়াল এন্ড দি স্প্রিট অব পয়েট্রি।
৫৫. সাইয়েদ কুতুব, ফি আল তারিখ ফিকরা ওয়া মিনহাজ (ইতিহাস; দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি); ফাতহী উসমান, আদওয়া আলা আল তারিখ আল ইসলামী (ইসলামী ইতিহাসের আলো); আব্দুর রহমান আল হাজী, নাজারাত ফি দিরাসাত আল তারিখ আল ইসলামী (ইসলামী ইতিহাস গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি); ইমাদ আল দ্বীন খলিল, আল তাফসির আল ইসলামী লি আল তারিখ (ইতিহাসের ইসলামী ব্যাখ্যা); আব্দুল হামিদ সিদ্দিকী, তাফসির আল তারিখ (ইতিহাসের ব্যাখ্যা)।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

মহানবীর আমলে মদীনার সমাজ ঃ বৈশিষ্ট্য ও প্রাথমিক কাঠামো

হিজরতের আগে মদীনার সমাজ

মদীনা আল মনোয়ারার প্রাচীন নাম ইয়াসরিব। এই মরুদ্যানে রয়েছে উর্বর জমি ও পর্যাপ্ত পানি। এর চতুর্দিকে ঘিরে রয়েছে কালো বর্ণের আগ্নেয় শিলাময় প্রান্তর। এই অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হলো পূর্ব দিকে হারাহ ওয়াকিম এবং পশ্চিমে হারাহ আল ওয়াবারাহ। হারাহ ওয়াকিম হারাহ ওয়াবারাহর চেয়ে অধিকতর উর্বর এবং লোকসংখ্যাও বেশী। মদীনার উত্তরে ওহুদ পর্বত এবং দক্ষিণ পশ্চিমে আসির পর্বত অবস্থিত। মদীনায় বহু উপত্যকা রয়েছে, তারমধ্যে ওয়াদী বাগান, মুদায়েনিব, মাহজুর ও আল আকিক সবচেয়ে বিখ্যাত। উপত্যাকাগুলো দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে বিস্তৃত এবং এগুলো রুম'হ নামক স্থানে এসে একত্রে মিলিত হয়েছে।

প্রাচীনতম মাইনী লিপিতে ইয়াসরিব নাম উল্লেখ রয়েছে, যা নগরীর প্রাচীনতার স্বাক্ষর বহন করছে।[১] এই নগরীর প্রাক-ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে আমরা অপর্যাপ্ত ও বিক্ষিপ্ত তথ্য জানতে পেরেছি। ইসলামী যুগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা এ নগরীর ইতিহাস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করেছি।

ইহুদী

ইহুদীরা কোথা থেকে এবং কোন সময়ে মদীনায় অর্থাৎ হেজাজে আগমন করেছিল সে সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মতবাদে বলা হয়েছে, তারা আল শ্যাম (বৃহত্তর সিরিয়া) থেকে এসেছিল। খৃস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে সিরিয়া ও মিসর এবং দ্বিতীয় শতাব্দীতে নাবাতিয়া রোমানদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ার পর তারা ঈসায়ী প্রথম শতাব্দীতে এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে আরবে আগমন করে। রোমানদের উপস্থিতির কারণে ইহুদীরা আরব উপদ্বীপে পাড়ি জমিয়েছিল, তারা যে রোমান প্রভাবের আশংকা করেছিল আরব উপদ্বীপ তার থেকে অনেক দূরে ছিল।

www.pathagar.com

রোমানদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর হেজাজে ইহুদী আগমন বৃদ্ধি পায়। রোমান সম্রাট তহিতুস ৭০ খৃস্টাব্দে এই ইহুদী বিদ্রোহ দমন করেন। অভিবাসনকারী এই ইহুদীদের একটা দল ইয়াসরিবে আগমন করে। পরে ১৩২ থেকে ১৩৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে সম্রাট হাদরিয়ান এর আমলে অপর এক ইহুদী বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর ইহুদীদের আরেকটি দল এখানে আগমন করে। এই দু'টি দল মদীনা ও হেজাজে ইহুদী সম্প্রদায় গড়ে তোলে।[২]

বানু আল নাজির ও বানু কুরায়জা ইহুদী গোত্রদ্বয় অন্য জায়গা থেকে ইয়াসরিবে আসে। এখানকার উর্বর জমি এবং স্থানটি সিরিয়ার সঙ্গে মরু বাণিজ্য পথের পাশে অবস্থিত হওয়ার কারণে তারা এখানে বসতি স্থাপন করে। তারা ইয়াসরিবের সবচেয়ে উর্বর এলাকা হারাহ ওয়াকিমে বসতি গড়ে তোলে।[৩] বানু কায়নুকা হলো সুপরিচিত অপর ইহুদী গোত্র। তাদের শিকড় সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ রয়েছে। তারা বাইরে থেকে হেজাজে এসেছিল অথবা তারা ইহুদী ধর্মগ্রহণকারী আরব। আরব সূত্রে উল্লিখিত অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইহুদী গোত্র সম্পর্কেও অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। এসব গোত্রের মধ্যে রয়েছে বানু আকরিমা, বানু মুহাম্মার, বানু জাওরা, বানু আল শাতিবা, বানু জাশাম, বানু মুয়াইয়া, বানু মুরিদ, বানু আল ওয়াসিম ও বানু সালামাহ।[৪]

এই সূত্রে ইহুদীদের সংখ্যা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি, তবে সীরাত গ্রন্থসমূহে তাদের যোদ্ধাদের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণত এই যোদ্ধারা ছিল প্রত্যেক গোত্রের পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ লোক। বানু কায়নুকার সাতশ' বানু নজিরেরও অনুরূপ সংখ্যক এবং বানু কুরায়জার সাতশ' থেকে নয়শ' যোদ্ধা ছিল।[৫] তিনটি ইহুদী গোত্রের মোট যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল দু'হাজারেরও বেশী। ইয়াসরিবের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী অন্যান্য ক্ষুদ্র ও অপেক্ষাকৃত অখ্যাত ইহুদী গোত্রের যোদ্ধাদের এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আল সামহুদী বিশটিরও বেশী ক্ষুদ্র ইহুদী গোত্রের কথা উল্লেখ করেছেন।[৬]

এতে কোন সন্দেহ নেই যে আরব উপস্থিতি শক্তিশালী হবার আগে মদীনার সমাজ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে পুরোপুরিভাবে ইহুদী প্রভাবিত ছিল। ইহুদীরা সমাজের উপর তাদের প্রভাবের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছিল। একইভাবে ইয়াসরিবের চতুর্দিকে অবস্থিত আরব গোত্রগুলোও সব দিক থেকে তাদেরকেও প্রভাবিত করেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় ইহুদীরা ইয়াসরিবে শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপনের ধারণা সিরিয়া থেকে গ্রহণ করেছিল। এধরনের ঘাঁটির

www.pathagar.com

সংখ্যা ছিল ৫৯।[৭] ইহুদীরা কৃষি ও হস্তশিল্পে দক্ষ ছিল। তারা এই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ইয়াসরিবে খেজুর, আঙ্গুর, আপেল ও দানাদার শস্য চাষের উন্নতি সাধন করে। হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশুর খামারও নতুন করে গুরুত্ব লাভ করে, বুনন শিল্পীর আবির্ভাব ঘটে এবং কৃষি নির্ভর সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তারা তৈরি করে। মদীনার সমাজে ইহুদীদের প্রভাব যেমন ছিল তেমনি তারাও আশে পাশের আরবদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ইহুদীদের মধ্যে গোত্রীয় সংহতির বৈশিষ্ট্য আসাবিয়াহ, উদারতা, কবিতার প্রতি অনুরাগ এবং অস্ত্রচালনা শিক্ষার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। তাদের মধ্যে গোত্রীয় ভাবাবেগ এতই গভীর ছিল যে তারা কখনও একই ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে একত্রে বসবাস করতে পারেনি। তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্র হিসেবে অবস্থান করে; এমনকি মহানবীর যুগে নির্বাসিত হওয়ার সময়ও তারা ঐক্যবদ্ধ বা ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি।

অবশ্য তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলে ছিল ইউজারী (সুদ)। মক্কার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কাছেও সুদ বা রিবা অজ্ঞাত ছিল না।

আরব

আওয়াস ও খাজরাজ গোত্র ইয়াসরিবে বসবাস করতো। তাদের আগে ইহুদীরা সেখানে আগমন করে এবং সবচেয়ে উর্বর ও মিষ্টিপানি এলাকায় বসতি স্থাপন করে। এই কারণে আওয়াস ও খাজরাজ গোত্র ইয়াসরিবের পার্বত্য এলাকায় বাস করতে বাধ্য হয়। বিখ্যাত ইয়ামেনী গোত্র আজ্‌দের সঙ্গে আওয়াস ও খাজরাজ গোত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তারা বিভিন্ন সময়ে ইয়ামেন থেকে উত্তরদিকে সরে যেয়ে বসতি স্থাপন করে। তাদের প্রথম দলটি সম্ভবত ২০৭ খৃস্টপূর্বে ইয়ামেন ত্যাগ করে। এই সময়ে খুজা গোত্র মক্কা শরীফে যেয়ে বসতি স্থাপন করে।

ঐতিহাসিকগণ আজ্‌দ্ গোত্রের দেশ ত্যাগের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশের মতে মা'রিব বাঁধ ধ্বংস ও আল আরীমের বন্যার কারণে তারা দেশ ত্যাগ করে। তবে অন্যরা এই মত সমর্থন করতে পারেননি, তারা বলেন, লোহিত সাগরে রোমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সৃষ্ট রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক দূরবস্থার কারণে আজ্‌দ্ গোত্র ইয়েমেন থেকে চলে যায়। এটিই তাদের অভিবাসনের সম্ভাব্য কারণ হতে পারে। রোমানরা আজ্‌দ্‌সহ এই এলাকার অধিবাসীদের উপর সুদূর প্রসারি প্রভাব বিস্তার করেছিল। আজ্‌দ্ গোত্রের অধিকাংশ সদস্য মা'রিব বাঁধের কাছে বসবাস করতো।[৮]

www.pathagar.com

আজ্‌দ্‌ গোত্রের অভিবাসনকারী সদস্যদের মধ্যে আওয়াস ও খাজরাজ ইয়াসরিবে ইহুদীদের পাশাপাশি বসতি স্থাপন করে।

আওয়াস কুরায়জা ও আল নজির গোত্রের পাশাপাশি আওয়ালী (উচ্চভূমি) এলাকায় বসবাস করতো এবং খাজরাজ গোত্র নীচু এলাকায় বানু কায়নুকা গোত্রের কাছে বাস করতো। আওয়াস গোত্র যে এলাকায় বাস করতো সে এলাকায় জমি খাজরাজ গোত্রের এলাকার জমির চেয়ে উর্বর ছিল যা দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৯]

সিদাইউ তাদের অভিবাসনের তারিখ ৩০০ খৃস্টপূর্ব এবং ইয়াসরিবে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার তারিখ ৪৯২ খৃস্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। আরবদের অনুকূলেও যে কিছু অর্থনৈতিক ও জনসংখ্যাগত পরিবর্তন ঘটেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সংখ্যা ও সম্পদ বৃদ্ধির কারণে এই পরিবর্তন ঘটে।[১০] আওয়াস ও খাজরাজ গোত্রের লোকসংখ্যার সার্বিক পরিসংখ্যান জানা যায়নি তবে অষ্টম হিজরীতে মক্কা মুক্ত করার জন্য পাঠানো ইসলামী সেনাবাহিনীতে তারা চার হাজার মুজাহিদ সরবরাহ করেছিল।[১১] এতে কোন সন্দেহ নেই যে পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে ইয়াসরিবের উপর তাদের প্রাধান্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত হয়। এর আগে সেখানে ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল। ইহুদীরা আওয়াস ও খাজরাজ গোত্রের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা করতো। তারা এই দুই আরব গোত্রের মধ্যে সংঘাত বাধানোর জন্য উস্কানী দিতো। ইহুদীরা এই দু'গোত্রের মধ্যে শত্রুতার বীজ বপন করতে এবং লড়াই বাধিয়ে দিতে সক্ষম হয়। তাদের মধ্যকার শেষ লড়াই ছিল বুয়াসের যুদ্ধ। তিন বছর ধরে এই যুদ্ধ চলে এবং হিজরতের পাঁচ বছর আগে তা শেষ হয়। এই যুদ্ধে আওয়াস গোত্রের শক্তিশালী বাহিনী খাজরাজ গোত্রের বাহিনীকে পরাজিত করে। এর আগের প্রায় সবকটি যুদ্ধে খাজরাজ গোত্র জয়ী হয়। আওয়াস ইহুদী গোত্র আল নাজির ও কুরায়জার সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে বুয়াসের যুদ্ধে খাজরাজ বাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হলেও তারা খাজরাজ গোত্রকে ধ্বংস করার বিপদ সম্পর্কে সজাগ ছিল। কারণ তাহলে ইয়াসরিবের উপর ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। তাই উভয় গোত্র নিজেদের মধ্যকার বিরোধ নিরসন ও সমঝোতায় পৌঁছানোর চেষ্টা করে। তারা খাজরাজ গোত্রের একজন সদস্যকে ইয়াসরিবের বাদশাহ মনোনীত করতেও সম্মত হয়। তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল। তিনি বুয়াসের যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এ থেকে

www.pathagar.com

প্রতীয়মান হয় যে, বুয়াসের যুদ্ধের পরও আরবরা ইহুদীদের উপর তাদের প্রাধান্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আওয়াস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে সংঘর্ষ যেমন উভয় পক্ষের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি করেছিল তেমনি শান্তিতে বসবাসের তীব্র আকাঙ্ক্ষাও যে সৃষ্টি করেছিল; তাতে কোন সন্দেহ নেই। পরবর্তীতে ইয়াসরিবের ইসলাম গ্রহণ এবং ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির অগ্রদূত হিসেবে আত্মপ্রকাশের পশ্চাতে এই অনুভূতির একটা গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা লোকদের ইসলাম গ্রহণের উপর এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"রাসূলুল্লাহর আগমনের আগে বুয়াসের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন আওয়াস ও খাজরাজ গোত্র প্রতিদ্বন্দ্বী উপদলে বিভক্ত ছিল এবং দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে তাদের কৃতি সন্তানেরা প্রাণ হারাচ্ছিল ও যখম হচ্ছিল। তারা যাতে ইসলাম গ্রহণের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে থাকে সেজন্য আল্লাহ রাসূলুল্লাহর আগমনের আগেই এরূপ করেছিলেন।"

তথ্যসূত্র ঃ

১. জাওয়াদ আলী, তারিখ আল আরব কাবল আল ইসলাম, ৩/২৯৫।

২. জাওয়াদ আলী, আল মুফাচ্ছাল ফি তারিখ আল আরব কাবল আল ইসলাম (প্রাক ইসলামী আরবদের বিশদ ইতিহাস), বৈরুত, ১৯৬৮-৭১, ২/৫১৩-৪; মুহাম্মাদ বুইয়মী মাহরান, দিরাসাত ফি তারিখ আল আরব আল কাদিম (আরবদের প্রাচীন ইতিহাস অধ্যয়ন), রিয়াদ : ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৯৭/১৯৭৭, ৪৪৮-৪৫০।

৩. আহমদ ইব্রাহীম আল শরীফ, মক্কা ওয়াল মদীনা ফি আল জাহেলিয়া ওয়া আহদ আল রাসূল (জাহেলিয়াত ও মহানবীর আমলে মক্কা ও মদীনা), ২৮৮।

৪. আরব আল কাদিম (আরবদের প্রাচীন ইতিহাস শিক্ষা), রিয়াদ : ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৯৭/১৯৭৭, ৪৪৮-৪৫০।

৫. আহমদ ইব্রাহীম আল শরীফ, মক্কা ওয়াল মদীনা ফি আল জাহেলিয়া ওয়া আহদ আল রাসূল (জাহেলিয়াত ও মহানবীর আমলে মক্কা ও মদীনা)।

৬. আল সামহুদী, ওয়াফা আল ওয়াফা (পূর্ণতার পূর্ণতা), ১/১২২-৬; সীরাত ইবনে হিশাম, ২/২৫৯।

৭. মুহাই আল দ্বীন সম্পাদিত সীরাত ইবনে হিশাম, ২/৪২৮, ৩/২৫৯, এছাড়া আহমদ ইব্রাহীম, মক্কা ওয়া আল মদীনা, ২৯৪, দ্রষ্টব্য।

৮. ওয়াফা, ১/৯২।

৯. প্রাগুক্ত, ১/১১৬।

১০. ওয়াফা, ১/১২৫/৬।

১১. আহমদ ইব্রাহীম, মক্কা ওয়া আল মদীনা, ৩৪৩।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

মদীনার সমাজে ইসলামের প্রভাব

প্রত্যেক সভ্যতা, দর্শন ও ধর্মের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে। সভ্যতার অধিকতর গভীর ও ব্যাপক শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য তার সীমার মধ্যে অবস্থিত ব্যক্তিবর্গের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কতিপয় আদর্শ রয়েছে যা পরস্পরের অনুরূপ এবং কেবল নির্দিষ্ট পদ্ধতির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সমসাময়িক বিশ্বে কর্তৃত্বকারী বস্তুবাদী দর্শনের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে এক মতবাদ থেকে অন্য আদর্শে পরিবর্ত্তনের জন্য ব্যক্তি জীবনে কোন পূর্ণাঙ্গ বা আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। এ ধরনের কোন একটি মতবাদ থেকে অন্য মতবাদ গ্রহণের জন্য যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হল পূর্বের মতবাদটি পরিত্যাগ এবং পরবর্তীটির প্রতি আস্থা ব্যক্ত করা। এ জন্য বড় ধরনের প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়না, কেননা তা প্রাত্যহিক আচার-আচরণ ও দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত স্বভাবের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করেনা। আর একারণেই ব্যক্তির বাস্তব জীবনে তার কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়না।

এধরনের বাহ্যিক বিষয় ইসলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়না। সূচনালগ্ন থেকেই এই ধর্ম ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধন করে আসছে। এতে ব্যক্তির দৈনন্দিন আচার-আচরণ ও দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত স্বভাবের পুরোপুরি পরিবর্তন ঘটে ফলে মহাবিশ্ব, জীবন ও মানুষ সম্পর্কে তাদের বিবেচনার মানদণ্ড, বিচার ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। অনুরূপভাবে সমাজ কাঠামোয় সুস্পষ্ট পরিবর্তন ঘটে, অনেক বিষয় অন্তর্ধান হয় এবং নতুন নতুন বিষয় আবির্ভূত হয়।

ইসলাম যেসব পরিবর্তন সাধন করে তা গভীর ও ব্যাপক। মৌলিক বিশ্বাস ও নীতির ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, যেমন মূর্তি ও নক্ষত্রের উপাসনার অবসান ঘটিয়ে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর এবাদত প্রবর্তন করে। আল্লাহ অদৃশ্য ও নিরাকার এবং তাঁর সঠিক প্রকৃতি জানাও সম্ভব নয়: "কোন কিছুই তাঁর মতো নয়।" (আল শুরা ৪২ঃ১১), "কোন দৃষ্টি তাকে দেখতে পায়না কিন্তু তার দৃষ্টি সকলের উপর রয়েছে।" (আল আনাম ৬ঃ১০৩)। তিনি তাঁর মহাগ্রন্থ আল কোরআনে নিজের সম্পর্কে যতটুকু অবহিত করেছেন এবং তাঁর প্রিয় নবীগণের মাধ্যমে যতটুকু জানিয়েছেন, তাঁর সম্পর্কে কেবল এতটুকুই জানা সম্ভব। তামসিল

www.pathagar.com

(প্রতিরূপ) তাশবিহ (উপমা), নাফি (নিষ্ক্রিয়তা), কিংবা তাতিল (আল্লাহ সিফাত সমূহ অস্বীকৃতির ধারণা) আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

ইসলাম ব্যক্তি জীবনের দৈনন্দিন আচার-আচরণে আমূল পরিবর্তন ঘটায়। কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর তার পূর্ব জীবনের সঙ্গে পরবর্তী জীবনের ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আরবরা সামাজিক আচার-আচরণ ও আত্মীয়তার ক্ষেত্রে সুশৃঙ্খল ছিলনা। তাদেরকে শরয়ী বিধিবিধানের আওতায় এনে সুশৃঙ্খল করা হয়। এই বিধিবিধান জীবনের সর্বক্ষেত্রে নৈতিক আচরণ, অভ্যাস, নিদ্রা-জাগরণ, পান-ভোজন, বিয়ে-তালাক, কেনাবেচাসহ সকল বিষয়ে পরিব্যাপ্ত হয়। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে স্বভাব ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পুরানো অভ্যাস থেকে মুক্তি লাভ এবং নতুন অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্য অর্জন খুবই কঠিন। কিন্তু ইসলাম নও মুসলিমদের চিত্তে এক সুগভীর ঈমানী চেতনা সঞ্চার করে যা তাদের চরিত্রের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সকল অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্যের অপনোদন ঘটিয়ে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে তাদের ব্যক্তিত্ব ঢেলে সাজায়। তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর এবাদতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন এবং তাদের সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আল্লাহর পথে পরিচালিত হয়। ইসলামে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পাদিত সকল তৎপরতা ও প্রচেষ্টাই এবাদত হিসেবে পরিগণিত হয়। তারা সালাত (নামাজ) আদায়ে অভ্যস্ত হয়। ইসলামের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ নামাজ দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করতে হয়।

এতে সন্দেহ নেই যে প্রকৃতিগত কারণে মানুষ মাঝে মাঝে আলস্যে আক্রান্ত হয়ে কর্তব্য ও প্রতিশ্রুতি পালনে গাফিল হয়ে পড়ে কিন্তু মুসলমানরা নিজেদেরকে আল্লাহর কাছে পুরোপুরি সমর্পণ করায় তারা কর্তব্য পালনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। নামাজে কি ধরনের সংযম ও নিষ্ঠা প্রয়োজন সে সম্পর্কে আল্লাহ এরশাদ করেছেন: "তোমার পরিবার পরিজনকে নামাজ শিক্ষা দাও। আর তুমি নিজেও উহা দৃঢ়তার সাথে পালন করতে থাক।..." (ত্বো-হা ২০:১৩২)।

অনুরূপভাবে সিয়াম (রোজা) পালনে তারা অভ্যস্ত হয়। মাসব্যাপী রোজা পালনকালে খানাপিনার অভ্যাসে আমূল পরিবর্তন ঘটে। রোজা পালনের জন্য প্রয়োজন হয় দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও গভীর সংকল্প। বছরে অর্জিত অর্থের একটা অংশ দান করার মাধ্যমে জাকাত আদায় করতে হয়। জাকাত আদায়ের মাধ্যমে মুসলমানরা লোভ-লালসা ও অর্থলিপ্সার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে। একজন মুসলমান অর্থের চেয়ে আল্লাহকে যে বেশী ভালবাসেন, জাকাত আদায়ের মাধ্যমে তিনি তা প্রমাণ করেন। একারণে খলিফা আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর শাসন-আমলে অনেক মুরতাদ ঘোষণা করেছিল যে জাকাত থেকে অব্যাহতি দিলে তারা মুসলমান থাকতে প্রস্তুত আছে।

www.pathagar.com

নতুন নতুন বিধিবিধানে অভ্যস্ত এবং তা পালনে বাধ্য হওয়ার ফলে মুসলমানদেরকে মদ্যপান, ইসলামী রীতি বহির্ভূত বিবাহ এবং রিবা বা সুদের মতো গভীর প্রোথিত অভ্যাস পরিত্যাগ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিলনা। মক্কা ও অন্যান্য নগরীর অর্থনীতির মূলভিত্তি ছিল সুদ। মুসলমানরা সুদ ও অন্যান্য অভ্যাস থেকে নিজেদের মুক্ত করেন আল্লাহর এই নির্দেশে ঃ

"হে ঈমানদারগণ শরাব, জুয়া, মূর্তি ও এর আস্তানা ও পাশা এসবই নাপাক শয়তানী কাজ। তোমরা তা পরিহার কর। আশা করা যায় যে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। শয়তান চায় যে শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে সে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি করবে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে বিরত রাখবে। এখন তোমরা কি এসব জিনিস থেকে বিরত থাকবে?" (আল মায়েদা ৫ঃ৯০, ৯১)

আনসারগণ মদ ভর্তি বড় বড় কলসি নিয়ে রাস্তায় নেমে আসেন এবং মদ ঢেলে ফেলে দিয়ে ঘোষণা করেন ঃ "হে আল্লাহ আমরা (মদ পান) বর্জন করলাম।" মদ ছিল ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রোথিত এক গভীর অভ্যাস এবং তারা যে মদ ঢেলে নষ্ট করলেন তা ছিল সম্পদও। বিশ্বজাহানের মালিক এ ত্রাণকর্তা আল্লাহর প্রতি গভীর ভালবাসা ও আত্মসমর্পণের জন্য তারা তা বর্জন করেন।

আরবরা ছিল অত্যন্ত স্বাধীনচেতা। তারা স্বেচ্ছায় কোন রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করতো না। তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক একক ছিল গোত্র। ইসলামের আবির্ভাবের বহু পূর্বে আরব উপদ্বীপ জুড়ে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়েছিল তার বিলুপ্তি ঘটেছিল। সমগ্র আরব উপদ্বীপ জুড়ে গোত্রীয়বাদ ও যাযাবরের জীবনধারা প্রচলিত হয়, যার বৈশিষ্ট্য ছিল গোত্রীয় সংহতি, সংঘাত ও অনৈক্য। ইসলামের আগমনের পর রাষ্ট্র ধারণার উন্মেষ ঘটে এবং সকল গোত্র ও ব্যক্তি তার আওতাধীনে আসতে বাধ্য হয়। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে মদীনায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইসলামের পতাকাতলে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো গোটা আরব উপদ্বীপকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তা সম্প্রসারিত করা হয়। আরব উপদ্বীপের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ ছিল এক বিরাট সাফল্য।

ইসলামের গভীরতা ও ব্যাপকতা এবং জীবনের সকল দিককে প্রভাবিত করার সামর্থের কারণে ইসলাম মদীনার ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধন করে ঃ "বল, খোদার রং ধারণ কর, তাঁর রং ছাড়া আর কার রং উৎকৃষ্ট হতে পারে? এবং বল, আমরা তারই দাসত্ব করে থাকি" (আল বাকারা ২ঃ১৩৮) পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা পূর্ণাঙ্গ পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করবো।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

হিজরত ও মদীনার সমাজ কাঠামোয় তার প্রভাব

মুহাজিরগণের আগমনের পর ইয়াসরিব নগরীর নামকরণ করা হয় মদীনা মনোয়ারা। প্রথমদিকে আগত মুহাজিরগণের সকলেই ছিলেন কুরাইশ বংশের বিভিন্ন শাখার সদস্য। হিজরত অব্যাহত থাকে এবং আরব উপদ্বীপের সকল এলাকার নওমুসলিমগণের জন্য মদীনায় হিজরত করা জরুরী কর্তব্যে পরিণত হয়। অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধের নির্দেশ দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত হিজরত অব্যাহত ছিল।

হিজরতের ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একারণেই হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হিজরতের সময় থেকে হিজরী সনের প্রবর্তন করেন। হিজরতের ঘটনার দিন থেকে হিজরী বর্ষের সূচনা হয়।

ঈমান ও আদর্শের প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও ত্যাগের এক অনুপম নিদর্শন হচ্ছে হিজরত। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) আহ্বানে মুহাজিরগণ তাদের মাতৃভূমি, সম্পদ, পরিবার পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবকে ত্যাগ করে মদীনায় আগমন করেন। কুরাইশরা সুয়ায়েব আল রূমীকে হিজরত করা থেকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে বলেছিল যে মক্কায় আসার আগে তাঁর কোন সম্পদ ছিলনা এবং মক্কাতে কাজ করে তিনি সমস্ত সম্পদ উপার্জন করেছেন। সোয়ায়েব আল রূমী তাদের কাছে তার সকল সম্পদ ফেলে রেখে খালি হাতে হিজরত করেন। আল্লাহর রাসূল (সা.) একথা শোনার পর বললেন, "সোয়ায়েব (এই বিনিময়ে) লাভবান হয়েছে।"[১] কাফের কুরাইশরা আবু সালামাকে হিজরত করা থেকে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই বাধা সৃষ্টি আবু সালামাকে স্ত্রী-সন্তান ফেলে রেখে একাকী হিজরত করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। এর পর তার স্ত্রী উম্মে সালামা প্রতিদিন ভোরে কাঁদতে কাঁদতে আবাতাহ পর্যন্ত যেতেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতেন। এভাবে প্রায় একটি বছর কেটে যায়। তারপর তিনি ছেলেকে নিয়ে মদীনায় এসে স্বামীর সঙ্গে পুনরায় মিলিত হন।[২] এরূপ কঠিন অবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হিজরতের ঘটনায় ঈমানদারদের ঈমানী জজবা এবং পার্থিব সুখ-সুবিধা, স্বার্থ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের উর্ধ্বে

www.pathagar.com

ঈমানকে স্থান দেয়ার এক সুকঠিন ঈমানী পরীক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। হিজরতের ঘটনাবলীতে সাহাবীগণের প্রতি রাসূলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গভীর প্রভাবও প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা পৃথিবীতে আল্লাহর খেলাফতের দায়িত্ব পালন, আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন, তাঁর আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন এবং তার পথে চলার নিরন্তর সংগ্রামের যোগ্যতা অর্জন করেন। ".... জমীনে তোমাদের প্রভাবপ্রতিপত্তিহীন মনে করা হতো এবং তোমরা ভয় করছিলে যে লোকেরা তোমাদেরকে না নিশ্চিহ্ন করে দেয়..." (আনফাল ৮ঃ২৬)। এই পরিস্থিতি উত্তরণের পরেই তারা মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা অর্জন করেন।

আল্লাহ মুসলমানদের হিজরতের জন্য মদীনা মনোয়ারাকে নির্বাচন করেন। আল্লাহর নবীর (সা.) সহীহ রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে 'তোমাদের হিজরতের স্থান আমাকে দেখানো হয়েছে। আমি দুই পর্বতের মাঝে অবস্থিত খেজুর বৃক্ষ সুশোভিত দুইটি হারার লবনাক্ত স্থানটি দেখেছি।" (মুসলিম ও বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেন)।

মহানবী (সা.) হিজরতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন এবং হযরত আবু বকরকেও (রাঃ) অনুরূপ অপেক্ষায় থাকতে বলেন। এরপর তিনি আল্লাহর তরফ থেকে হিজরতের অনুমতি লাভ করেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, "আল্লাহর রাসূল আবু বকরকে বললেন, মদীনা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকুন, তাড়াহুড়া করার দরকার নেই। আমি আশা করছি যে আমি (আপনাকে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করার) অনুমতি পাবো। হিজরতের অনুমতি পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের ছাড়া আর কাউকে তা জানাননি। মুসলমানদের হিজরত করার ঘটনায় ক্রুদ্ধ কাফেররা আল্লাহর রাসূলকে (সা.) হত্যার চক্রান্ত করে। আল্লাহ এরশাদ করেছেন, "সেই সময়ও স্মরণীয়, যখন সত্যের অমান্যকারীরা তোমার বিরুদ্ধে নানা কৌশল চিন্তা করছিল যে তোমাকে বন্দী করবে কিংবা হত্যা করবে অথবা দেশ হতে নির্বাসিত করবে। তারা নিজেদের ষড়যন্ত্রের চাল চালছিল আর আল্লাহ তাঁর নিজের চাল চালছিলেন; অবশ্যই আল্লাহর চাল সবচেয়ে বড়" (আনফাল ৮ঃ৩০)

অবশেষে মহানবী (সা.) ও আবু বকর (রাঃ) একদিন সওর পর্বতের পথ ধরে মক্কা ছেড়ে মদীনার দিকে রওনা হলেন। তাঁরা এই পর্বতের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। কাফেররা তাদের পিছু নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলো। গুহার বাইরে

www.pathagar.com

দাঁড়িয়ে মহানবী (সা.) ও আবু বকর (রাঃ) এর পায়ের পাতা দেখা যেতে পারে, কাফেররা এমন দূরত্বে এসে উপস্থিত হয়। আবু বকর (রাঃ) বললেন, "কেউ যদি তার পায়ের দিকে নজর করে তা হলে সে আমাদেরকে দেখে ফেলবে।" রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "হে আবু বকর, আপনি কি মনে করেছেন আমরা কেবল দু'জন, আমাদের সঙ্গে আরেকজন রয়েছেন, তিনি হলেন মহান আল্লাহ।"[৩] আল্লাহ তাদের থেকে মুশরিকদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দিলেন তাই তারা তাঁদেরকে দেখতে পারলোনা। তিনদিন পর তারা গুহা থেকে বেরিয়ে আসেন এবং মরুভূমির মধ্যদিয়ে মদীনার দিকে অগ্রসর হলেন।[৪] সে সময়ে রাসূল (সা.) এর বয়স ছিল ৫৩ বছর এবং আবু বকর (রাঃ) এর ৫১ বছর। তা সত্ত্বেও কোন প্রতিবন্ধকতাই আল্লাহর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত তাদের হৃদয়কে লক্ষ্যে পৌছাতে অথবা তাঁর বাণীর বাস্তবায়ন থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। ইসলামের মর্মবাণী হচ্ছে এবাদতের আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা করা এবং আন্তঃমানবিক সম্পর্ক (মুয়ামেলাত) বিনির্মাণ করা। এগুলো হচ্ছে জীবনযাপনের বিধিবিধান বা আইন যার বাস্তব রূপায়ন প্রয়োজন। এরজন্য প্রয়োজন একটি ভৌগোলিক ভিত্তি ও একটি জনগোষ্ঠী (উম্মাহ)। মদীনায় অবতীর্ণ কোরআনের আয়াতসমূহ এবং সুন্নাহ বা রাসূল (সা.) এর কথা, কাজ ও নির্দেশের ভিত্তিতে এই আইন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এই আইনে একটি আদর্শ রাষ্ট্রের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে যার ভিত্তিতে মানব ইতিহাসের সর্বকালের সর্বোত্তম আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সকল যুগের ও সকল স্থানের সকল মুসলমানকে দুনিয়ায় সুখ ও শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি সুনিশ্চিত করতে এবং চতুর্দিক থেকে আক্রমণকারী জাহেলিয়াতের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হওয়ার দুর্ভোগ ও দুর্দশা থেকে নিস্কৃতির লক্ষ্যে অবশ্যই এই আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। তাদের জন্য আল্লাহর পথে প্রত্যাবর্তন ও তাঁর রাসূলের নির্দেশনা অনুসরণ করা ছাড়া মুক্তির আর কোন বিকল্প নেই।

হিজরতের নির্দেশ পাওয়ার পরে হিজরতে সক্ষম সাহাবীগণের অধিকাংশ মদীনা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মহানবী (সা.) হিজরত করা থেকে বিরত থাকেন। হিজরতে উৎসাহ প্রদান এবং হিজরতকারীদের গুণাবলীর স্বীকৃতি দিয়ে অব্যাহতভাবে কোরআনের আয়াত নাজিল হতে থাকে।

মদীনার বিকাশমান ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য মুহাজিরদের প্রয়োজন ছিল। ইহুদী, মূর্তিপূজক ও মুনাফিকরা ইসলামী শক্তিকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল। এই প্রেক্ষিতে মূর্তিপূজক বেদুইন অধ্যুষিত অঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত মদীনায় ইসলামী শক্তি বৃদ্ধির জন্য ঈমানদার মুজাহিদদের উপস্থিতি জরুরী হয়ে পড়েছিল।

www.pathagar.com

হিজরতের ঘটনায় কুরাইশরা অত্যন্ত বিব্রতবোধ করে এবং মদীনার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে। তারা এই শিশু ও বিকাশমান ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একের পর এক ষড়যন্ত্র করতে থাকে। এই কারণেই হিজরতের নির্দেশ দিয়ে কোরআনের বহু আয়াত নাজিল হয় এবং তাতে এর গুণাবলী ও পুরস্কারের কথা বর্ণনা করা হয়। দুশমনদের সঙ্গে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ মুহাজিরদেরকে হেফাজত করার অঙ্গীকার এবং তাদের জন্য অফুরন্ত নেয়ামতেরও সুসংবাদ দিয়েছেন।

"যে কেউ আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগ করে, সে এর বিনিময় অনেক স্থান ও স্বচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ হতে বের হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশ্যে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়।...." (নিসা ৪ঃ১০০)।

তাই যিনি হিজরতের নিয়তে রওনা হন এবং পথে মৃত্যুবরণ করেন আল্লাহ তাকে হিজরতকারীর ন্যায় পুরস্কারে ভূষিত করবেন।

"যারা আল্লাহর পথে গৃহ ত্যাগ করেছে, এরপর নিহত হয়েছে অথবা মরে গেছে, আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন..." (হজ্ব ২২ঃ৫৮)।

এখানে আল্লাহ তাঁর পথে হিজরতকারীগণকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করার গ্যারান্টি দিয়েছেন। তারা জিহাদের সময় শাহাদাৎ বরণ অথবা নিজ গৃহে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করুননা কেন, উভয় ক্ষেত্রে তাদেরকে উত্তম পুরস্কারের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে হিজরত করতে সক্ষম মুসলমানদেরকে কাফের কুরাইশদের মধ্যে অবস্থান করতে নিষেধ করা হয়েছিল। আল্লাহ এরশাদ করেন ঃ

'যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলেঃ এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলেঃ আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলনা যে তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম এবং অত্যন্ত মন্দস্থান। কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায় তারা কোন উপায়ে করতে পারেনা এবং পথও জানেনা। অতএব আশা করা যায়, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন, আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।" (নিসা ৪ঃ৯৭-৯৯)

কাফেরদের মধ্যে বসবাস করা আপত্তিজনক কেননা এতে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং মুসলিম হস্তশিল্প ও কৃষি থেকে তারা লাভবান হয়। উপরন্তু কাফেররা

www.pathagar.com

মুসলমানদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করে, বদরযুদ্ধে এরূপ হয়েছিল। এছাড়া কাফেররা মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মবিশ্বাস থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য নির্যাতন চালানোর সুযোগ পায়। স্পষ্টত ইসলামী রাষ্ট্র থেকে মুসলমানদের দূরে অবস্থান করার অর্থ হচ্ছে যুদ্ধ পরিচালনা, মুসলিম স্বার্থ রক্ষায় রাষ্ট্র কোন ফায়দা অর্জন করতে পারেনা। এবং মুসলমানদের সংখ্যাগত শক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তারা কোন ভূমিকা পালন করতে পারে না। আর একারণেই আল্লাহর নবী (সা.) বলেছেন, "যে কোন অমুসলিমের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করবে এবং তার সাথে বসবাস করবে সে তার মতো বলে গণ্য হবে।" (আবু দাউদ)

মুসলমানদের অনেকে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের চাপের কারণে মক্কা থেকে হিজরত করতে বিলম্ব করেন। তারা হিজরত করার পর দেখতে পেলেন যে, তাদের আগের হিজরতকারীগণ দ্বীন সম্পর্কে অনেক কিছু শিখে ফেলেছেন, তখন তারা স্ত্রী ও সন্তানদের শাস্তি দিতে চাইলেন। এই প্রেক্ষাপটে পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হয়ঃ

'হে মুমিনগণ, তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক..." (তাগাবুন ৬৪ঃ১৪)

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলামের সূচনা লগ্ন থেকেই মুসলমানদের জন্য হিজরত করা বাধ্যতামূলক ছিল এবং পঞ্চম হিজরিতে খন্দকের যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত তা বলবৎ ছিল। এ সময় নয়া ইসলামী রাষ্ট্র সম্মিলিত শত্রু বাহিনীর হামলা মোকাবেলার ও নিরাপত্তা বিধানের শক্তি অর্জন করায় এই রাষ্ট্রে আর কোন নতুন মুহাজিরের আগমনের দরকার ছিলনা। ইসলামী রাষ্ট্রের নীতি আত্মরক্ষা থেকে পরিবর্তন করে আক্রমণাত্মক করা হয়। মহানবী (সা.) এই নীতির ঘোষণা দিয়ে বলেন ঃ "এখন আমরা তাদেরকে আক্রমণ করবো, তারা আর কখনও আমাদের উপর হামলা করতে পারবে না।"

উপরন্তু মদীনা মনোয়ারা বর্ধিত জনসংখ্যা এবং তাদের বাসস্থান ও আহারের সংস্থানের সমস্যা সমাধানে হিমশিম খাচ্ছিল। একারণেই খন্দকের যুদ্ধের পরে মহানবী (সা.) কিছু সংখ্যক মুহাজিরকে বাড়ী ফিরে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বলেনঃ "তোমাদের হিজরত হচ্ছে তোমাদের উটের জীন।" বস্তুত মদীনায় তাদের অবস্থান করার আর প্রয়োজন ছিলনা এবং মদীনার বাইরে দাওয়াতী কাজের উদ্যোগ গ্রহণ ও ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে নিজ নিজ গোত্রের মধ্যে বসবাস করাই তাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর ছিল।

www.pathagar.com

এই ঘটনাকে অবশ্য হিজরতের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘোষণা হিসেবে গণ্য করা হয়নি। মক্কা মোয়াজ্জমা মুক্ত হবার পরই আনুষ্ঠানিকভাবে হিজরত বন্ধের ঘোষণা দেয়া হয়। এই ঘোষণা দিয়ে আল্লাহর নবী বলেন ঃ "এই বিজয়ের পর (মক্কা থেকে মদীনায়) হিজরতের আর দরকার নেই তবে জিহাদ ও 'আগ্রহ' বজায় থাকছে এবং যুদ্ধের জন্য (মুসলিম শাসক) আহ্বান জানালেই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যেতে হবে।" তাই মদীনায় হিজরত করা আর বাধ্যতামূলক থাকলো না। কিন্তু যারা দায়িত্ব গ্রহণ করবে অথবা শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হবে তাদের জন্য জিহাদ করা ও আগ্রহ পোষণ আগের মতো বাধ্যতামূলক থাকবে। অবশ্য কাফের নিয়ন্ত্রিত এলাকার ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ যদি ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে জুলুমের ফিতনা শিকার হওয়ার আশঙ্কাবোধ করে এবং সামর্থ্য থাকলে তাদের জন্য সেখান থেকে হিজরত করা একটি কার্যকর আইন হিসেবে এখনো বহাল রয়েছে।

অব্যাহত হিজরতের ফলে মদীনা বিভিন্ন ধরনের লোকের বসতি হিসেবে গড়ে উঠেছে। মদীনা কেবল আওয়াস, খাজরাজ ও ইহুদীদের নিয়ে গঠিত সমাজ নয় কুরাইশ ও অন্যান্য আরব গোত্রের মুহাজিরগণ তাদের সঙ্গে বাস করার জন্য মদীনায় এসে সমবেত হন। মদীনার নতুন সমাজের কাঠামো মৌলিক ঈমান ও শরিয়তের মূলনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় যা গোত্রীয় সংহতি (আসাবিয়াহ) বা অন্যান্য সকল সম্পর্কের চেয়ে অনেক অনেক শক্তিশালী ও উন্নততর। এখানে উম্মাহর ধারণা বিকশিত হয়। মদীনার সংবিধান অধ্যয়নের সময় এই বিষয়টি আমাদের স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে। ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে লোকদেরকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ মুমিন, মুনাফিক ও ইহুদী।

মুহাজিরগণের বিপুল সমাগমের ফলে মদীনায় যে তীব্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে এই সমস্যার সমাধান করতে হয়েছিল। আর এই প্রেক্ষিতেই মুয়াখাহর (ভ্রাতৃত্বের) পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছিল।

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল হাকিম, আল মুস্তাদরাক, ৩/৩৯০। মুসলিমের মানদন্ড অনুসারে তিনি একে সহীহ বলে বর্ণনা করেন।

২. দেখুন, আল ইসাবাহ, ৮/১২২।

৩. সহীহ আল বুখারী, ৭/২১৭; সহীহ মুসলিম, ৭/১০৯।

৪. আহমদ আল মুসনদ নং-৩৫১; আরও দেখুন, ইবনে কাসির, আল বিদাইয়া, ৩/১৮৭-৮।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহানবীর (সা.) মুয়াখাহর (পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের) বিধান

ইসলামের দৃষ্টিতে মুমিনরা একে অপরের ভাই। আল্লাহ এরশাদ করেছেন : "মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই..." (হুজরাত ৪৯ঃ১০)। এছাড়া ইসলাম পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সৎ কাজে একে অপরকে সহায়তা করাকে কর্তব্য হিসেবে ধার্য করেছে। এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বিশেষ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রবর্তনের ফলে যে বিশেষ অধিকার ও কর্তব্য বর্তায় তা ছিল সামগ্রিকভাবে সকল মুমিনের সাধারণ অধিকার ও কর্তব্য থেকে ভিন্ন প্রকৃতির।

আল বালাদুরী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজরতের পূর্বে মক্কাতে সত্যের প্রতি আনুগত্য ও পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলেন। তিনি হামজা ও জায়েদ ইবনে হারিস, আবু বকর ও উমার, উসমান ইবনে আফ্ফান ও আব্দুর রহমান ইবনে আওয়াফ, আল জুবায়ের ইবনে আল আওয়াম ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, উবায়েদ ইবনে আল হারিস ও বিলাল আল হাবসী, মুসা'ব ইবনে উমায়ের ও সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, আবু ওবায়দা ইবনে জাররা ও সলিম, আবু হুজাইফাহর স্বাধীন ব্যক্তি সাঈদ ইবনে সায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল ও তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ এবং নিজের ও আলী ইবনে আবু তালিবের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন।[১]

মক্কায় মুয়াখাহর ব্যবস্থার কথা যারা উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে আল বালাদুরীকে প্রাচীনতম বিশেষজ্ঞ হিসেবে গণ্য করা হয়। ইবনে আব্দুল বার (৪৬৩ হিঃ) তাকে অনুসরণ করে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি অবশ্য আল বালাদুরীর কাছ থেকে এ বিষয়টি গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করেননি।[২] অনুরূপভাবে ইবনে সাঈদ আল নাসও তাদের দেয়া পরিসংখ্যানের উল্লেখ করেছেন। তিনিও এই দুইজনের কার কাছ থেকে তা উদ্ধৃত করেছেন কি-না তা উল্লেখ করেননি।[৩] ইবনে উমায়ের থেকে জামি ইবনে উমায়েরের ধারাবাহিক বিবরণ দিয়ে আল হাকিম তার মুস্তাদরাক এ লিখেছেন : "আল্লাহর নবী (সা.)

www.pathagar.com

আবু বকর ও উমার, তালহা ও যুবায়ের এবং আব্দুর রহমান ইবনে আওয়াফ ও উসমান (রাঃ) এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলেন।"

আল হাকিম ও আব্দুল বার ইবনে আব্বাস সমর্থিত আবুল শাথার হাসান সনদসহ বর্ণনা করেন : "মহানবী জুবায়ের ও ইবনে মাসুদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলেন।"

ইবনে আল কাইয়ুম ও ইবনে কাসির মনে করেন যে মক্কাতে মুয়াখাহ অনুষ্ঠিত হয়নি। ইবনে আল কাইয়ুম লিখেছেন ঃ

> মহানবী (সা.) মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলেন এবং আলীকে নিজ ভাই হিসেবে গ্রহণ করেন বলে জানা গেছে। মুয়াখাহ যে মদীনাতেই অনুষ্ঠিত হয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইসলামের সাধারণ ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক আত্মীয়তার বন্ধন এবং একই শহর থেকে আগমন করার কারণে মুহাজিরদের মধ্যে মুয়াখাহ স্থাপন করার প্রয়োজন ছিল না, তবে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে মুয়াখাহর প্রয়োজন ছিল।[৪]

ইবনে কাসির বলেন, ইবনে কাইয়ুম যে কারণ উল্লেখ করেছেন, সেই একই কারণে কোন কোন মুসলিম বিশেষজ্ঞ মুয়াখাহ অস্বীকার করেছেন।[৫] ইবনে কাইয়ুম ও ইবনে কাসিরের অভিমত অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে কারণ সীরাত সংক্রান্ত প্রাচীনতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহে মক্কাতে মুয়াখাহ স্থাপনের কোন উল্লেখ নেই। প্রাচীন সূত্রের মধ্যে একমাত্র আল বালাদুরী এই বিবরণ বা তথ্যের উল্লেখ করেছেন এবং তিনি কোন সনদ ছাড়াই কাউলু (কথিত আছে) শব্দ ব্যবহার করে এর উল্লেখ করেন। এ কারণেই এই বিবরণ জয়ীফ। সমালোচকগণ স্বয়ং আল বালাদুরীকে জয়ীফ বলে বিবেচনা করেন। মক্কাতে যে মুয়াখাহ স্থাপিত হয়নি, একথা বলা যায়। ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ দু'জনের মধ্যে পরস্পরিক সাহায্য ও সদুপদেশের মধ্যে এই সম্পর্ক সীমাবদ্ধ ছিল, উত্তরাধিকারী হবার কোন অধিকার এতে ছিল না।

মদীনায় মুয়াখাহ

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকারী মুহাজিরগণ বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত সমস্যার সম্মুখীন হন। একথা সুবিদিত যে মুহাজিরগণ তাদের পরিবার পরিজন এবং অধিকাংশ সহায়সম্পদ মক্কাতে ফেলে রেখে মদীনায় চলে আসেন। তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্যে দক্ষ ছিলেন। কুরাইশরা এক্ষেত্রে অত্যন্ত

www.pathagar.com

কুশলী হলেও কৃষি ও হস্তশিল্পে তারা পারদর্শী ছিলেন না। অথচ মদীনার অর্থনীতি এই দু'টি খাতের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল।

ব্যবসার জন্য দরকার মূলধন। এই মূলধনের অভাবে মুহাজিরগণ নতুন সমাজে সহজে নিজস্ব জীবিকার উপায় অবলম্বন করতে সমর্থ হচ্ছিলেন না। নবগঠিত রাষ্ট্র তাদের জন্য জীবিকা নির্বাহের সুযোগ সৃষ্টি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হিমশিম খাচ্ছিল। নতুন সমাজের সঙ্গে মুহাজিরদের সম্পর্কের কেবল সূচনা হয়েছিল তখন। মুহাজিরগণ মক্কাতে পরিবার-পরিজন ও বন্ধুবান্ধব ছেড়ে চলে আসেন এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে যায়। এরফলে মুহাজিরগণ একাকীত্ব বোধ করেন এবং মাতৃভূমি-মক্কার জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করেন। এছাড়া মক্কা ও মদীনার আবহাওয়াও ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। ফলে মুহাজিরদের অনেকে জ্বরে আক্রান্ত হন। এই অবস্থায় তাদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া এবং স্বাভাবিক মেহমানদারীর অতিরিক্ত সাময়িক সমাধান করা জরুরী হয়ে পড়েছিল। আনসারগণ নিঃসঙ্কোচে তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তারা ত্যাগ ও নিঃস্বার্থতার এক অনুপম নজীর স্থাপন করেন যা আল্লাহ্‌ কিতাবে চিরকালের জন্য অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে : "তাঁরা (আনসারগণ) নিজেদের তুলনায় অন্যদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করে, নিজেরা যতোই অভাবগ্রস্ত হউক না কেন..." (আল হাশর ৫৯ঃ৯)।

আনসারদের উদারতা এতোই মহৎ ছিল যে তাঁরা নিজেদের খেজুর গাছগুলো মুহাজিরদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন যদিও তাদের অনেকেরই আয়ের উৎস ছিল এই খেজুর বৃক্ষ। মহানবী (সা.) আনসারদেরকে খেজুর বাগান নিজেদের কাছে রেখে দেখাশুনা করার এবং উৎপন্ন খেজুর মুহাজিরদের সঙ্গে ভাগ করে নেয়ার পরামর্শ দেন।[৬] খেজুর বণ্টন ব্যবস্থা উৎপাদিত খেজুরের অর্ধেকের মতো কোন সুনির্দিষ্ট পরিমাণের ভিত্তিতে অথবা ঐ পর্যায়ে মুহাজিরদের প্রতি আনসারদের সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল কিনা তা আমরা জানিনা। দৃশ্যত মুহাজিরগণ কৃষিতে কাজ করুক রাসূলুল্লাহ তা চাইতেন না কারণ দাওয়াত ও জিহাদের জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল, উপরন্তু তারা কৃষি কাজে অভ্যস্ত ছিলেন না।[৭] এর অর্থ হচ্ছে মদীনায় চাহিদা অনুযায়ী কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়নি।

আনসারগণ তাদের সকল অতিরিক্ত জমি রাসূলের (সা) এর কাছে দিয়ে বললেন, 'আপনি চাইলে আমাদের বাড়ীঘরও নিতে পারেন।" রাসূল (সা.)

www.pathagar.com

তাদেরকে ধন্যবাদ জানালেন। তিনি আনসারদের দেয়া জমি ও মালিকানাহীন অন্যান্য জমিতে তার সঙ্গীদের জন্য বাড়ীঘর নির্মাণ করেন।[৮]

এই উদার আচরণ ও মহানুভবতায় মুহাজিরগণ অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন এবং তারা খোলাখুলিভাবে আনসারদের এই উদারতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আনাস (রাঃ) আনসারদের সম্পর্কে বলেনঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কখনো এমন (আনসারদের) মানুষের সাক্ষাত পাইনি। আমরা কখনো এমন লোকদের দেখিনি যারা সামান্য কিছু থাকলে তাই নিয়ে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। বেশী কিছু থাকলে তাও দিয়ে দেন। আমাদের সব প্রয়োজন তারা পূরণ করেছেন। তারা তাদের আনন্দ ও সুখও আমাদের সাথে ভাগ করে নিচ্ছেন, আমার ভয় হচ্ছে তারা আল্লাহর কাছ থেকে সকল পুরস্কার ছিনিয়ে নেবেন।" রাসূলুল্লাহ উত্তরে বললেন ঃ "না তা নয়। তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের প্রশংসা করবে এবং তাদের জন্য দোয়া করবে ততক্ষণ পর্যন্ত এরূপ হবে না।"[৯]

মুয়াখাহর বিধান প্রণয়ন

আনসারদের ত্যাগ ও উদারতা সত্ত্বেও আইনের মাধ্যমে মুহাজিরদের সুন্দর জীবনযাপনের গ্যারান্টি দেয়ার জন্য বিধান প্রণয়নের প্রয়োজন থেকেই যায়, বিশেষ করে মুহাজিরদের গৌরব ও মর্যাদার স্বাভাবিক দাবী ছিল যে তাদের সমস্যা এমনভাবে সমাধান করা হোক যাতে তারা যে আনসারদের উপর নির্ভরশীল, একথা তাদেরকে ভাবতে না হয়। এই কারণে মুয়াখাহর বিধান প্রণীত হয়েছিল। এই বিধান প্রণয়নের ইতিহাস সম্পর্কিত বিবরণের ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। হিজরতের পর প্রথম বছরে মুয়াখাহ প্রবর্তনের ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই, তবে মদীনায় মসজিদ নির্মাণের সময়ে না তার পরে তা চালু হয় এনিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।[১০] ইবনে আব্দুল বার এই বিধান প্রবর্তনের সময় হিজরতের ৫ মাস পরে বলে উল্লেখ করেছেন।[১১] ইবনে সা'দ অবশ্য এই বিধান প্রণয়নের সুনির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ না করে বলেছেন যে, হিজরতের পরে ও বদর যুদ্ধের আগে মুয়াখাহ প্রবর্তন করা হয়।[১২]

বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, আনাস ইবনে মালিকের বাড়ীতে এই বিধান প্রবর্তনের কথা ঘোষণা করা হয়।[১৩] দুই পক্ষের মধ্যে মুয়াখাহ অনুষ্ঠিত হয় তারা হলেন, মুহাজির ও আনসার। রাসূলুল্লাহ (সা.) উভয় পক্ষ থেকে একজন করে নিয়ে দুইজনের মধ্যে মুয়াখাহ স্থাপন করেন।

www.pathagar.com

৯০ জনের মধ্যে মুয়াখাহ স্থাপিত হয়। তাদের ৪৫ মুহাজির ও অপর ৪৫ জন আনসার। বর্ণিত হয়েছে যে, কোন আনসারের সঙ্গে মুয়াখাহ সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি এমন কোন মুহাজির ছিলেন না।[১৪] মদীনায় যে মুয়াখাহ স্থাপিত হয়েছিল তা ছিল মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে। বিভিন্ন সূত্রে এব্যাপারে একই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে তবে ইবনে সা'দ উল্লেখ করেছেন যে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে মুয়াখাহর পাশাপাশি মুহাজিরদের নিজেদের মধ্যেও মুয়াখাহ স্থাপিত হয় কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে বিস্তারিত আর কিছু জানাননি যাতে মুহাজিরদের নিজেদের মধ্যে মুয়াখাহর উদ্দেশ্য এবং এ থেকে কি সুফল পাওয়া (অধিকার ও কর্তব্য) গিয়েছিল তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অন্যান্য সূত্রে এই উদ্ধৃতিকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়নি।[১৫]

মুয়াখাহর বিধান প্রণয়নের ফলে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ দুই ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার মতো বিশেষ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সহযোগিতা কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না, জীবনের সমস্যা মোকাবেলায় সব ধরনের বস্তুগত সাহায্য ও সহযোগিতার সর্বব্যাপী ব্যবস্থা ছিল, হোক সে সাহায্যদান বা পরিচর্যা করা, উপদেশ প্রদান, পারস্পরিক মেহমানদারী ও ভালবাসা। মুয়াখাহর ফলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ দুই ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়াই পরস্পরের উত্তরাধিকারীও হতে পারতেন। এই ব্যবস্থা দুই ব্যক্তির মধ্যে এমন উচ্চতর ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রচনা করেছিল যে তা রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে স্থাপিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের চেয়ে অনেক মজবুত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল।

আনসারগণ তাদের মুহাজির ভাইদের জন্য ত্যাগের সুযোগ পেয়ে আনন্দিত হন। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে মুয়াখাহর বিধানের প্রতি তাদের গভীর আস্থা এবং তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদের ত্যাগের অবিস্মরণীয় চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। মুয়াখাহর এক অনুপম উদাহরণ হলো সা'দ ইবনে আল বার (আনসার) এবং আব্দুর রহমান ইবনে আওয়াফের (মুহাজির) মধ্যকার ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। সা'দ আব্দুর রহমানকে বললেন, "আমার যে সম্পত্তি রয়েছে আমি তা আমাদের দুইজনের মধ্যে ভাগ করে নিতে চাই। আমার দুইজন স্ত্রী আছে, আপনি তাদের কাকে পছন্দ করবেন, দেখুন, আমি তাকে তালাক দেব, যাতে আপনি যথাসময়ে তাকে বিয়ে করতে পারেন।" আব্দুর রহমান বললেন, "আল্লাহ আপনার স্ত্রী ও সম্পদকে আপনার জন্য রহমতে রূপান্তরিত করুক। আমাকে বাজারের দিকে

www.pathagar.com

নিয়ে চলুন। ফেরার সময় তিনি বিশুদ্ধ মাখন ও গৃহে তৈরি পনির নিয়ে আসেন। তিনি যে ব্যবসা করলেন এটি ছিল তার মুনাফা। আব্দুর রহমান বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার গায়ে হলুদ বর্ণ দেখে বললেন, কি ব্যাপার?" আমি বললাম, "আমি একজন আনসার রমনীকে বিয়ে করেছি।" তিনি বললেন, "একটি বকরী দিয়ে হলেও ওলিমার ব্যবস্থা কর।"[১৬]

গভীর ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক স্বার্থ ত্যাগের এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে যে কেউ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়বেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমরা অন্য কোন জাতির ইতিহাসে কখনও এমন ঘটনার কোন নজীর দেখতে পাইনি।

ইবনে আওয়াফের মর্যাদাপূর্ণ আচরণ, মহৎ চরিত্র ও তার ভাইয়ের কোনরূপ ক্ষতিসাধন না করার অভিপ্রায় ইবনে আল রাবীর নিঃস্বার্থতার চেয়ে কোন অংশে কম বিস্ময়কর নয়। ইবনে আওয়াফ ছিলেন একজন দক্ষ ব্যবসায়ী এবং নতুন জীবনে তিনি নিজস্ব চলার পথ তৈরি করে নিতে সক্ষম হন। কিছু দিন পরে তিনি বিবাহ করতে সমর্থ হন এবং মহরানা হিসেবে একশত স্বর্ণ প্রদান করেন।[১৭]এরপর থেকে তার ব্যবসায়ে অব্যাহতভাবে বরকত হতে থাকে এবং মুসলিমদের মধ্যে তিনি অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত হন। কেবল দান করা, গ্রহণ করা নয়, এমন "উচ্চ মর্যাদার" অধিকারী হওয়ার প্রস্তাব ছাড়া আর কিছুই তিনি গ্রহণ করেননি।[১৮]

ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ মুসলিমদের উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা

নবগঠিত রাষ্ট্রের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য ঈমানের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ দুই মুসলিমের মধ্যে উত্তরাধিকারী ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল। পরে মুহাজিরগণ মদীনার জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন এবং জীবিকা নির্বাহের উপায় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বদর যুদ্ধের গণিমতের মালের একটা অংশ তারা লাভ করেন যা তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। এরপর উত্তরাধিকারী ব্যবস্থা পূর্বের ন্যায় মানব স্বভাবের স্বাভাবিক ধারার রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে পুনরায় চালু হয়। কোরআনের আয়াত নাজিলের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ দুইজনের মধ্যকার উত্তরাধিকারী ব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা করা হয়।[১৯] "বস্তুত যারা আত্মীয়, আল্লাহর বিধান মতে তারা পরস্পর বেশী হকদার..." (আনফাল ৮:৭৫)।[২০]

www.pathagar.com

এই আয়াতে মুয়াখাহর ব্যবস্থা ভিত্তিক উত্তরাধিকার বাতিল করা হয়েছে। ইবনে আব্বাসের মতে, "আমরা উত্তরাধিকারী (মাওয়ালী)... নির্ধারণ করে দিয়েছি আর যাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছো।..." (নিসা ৪ঃ৩৩), আওয়াতখানিতেও মুয়াখাহ ভিত্তিক উত্তরাধিকারী বাতিল করা হয়েছে। ইবনে আব্বাসের অভিমত হচ্ছে ঃ এই আয়াতে রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে উত্তরাধিকারীদেরকে 'মাওয়ালী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং "যাদের সঙ্গে অঙ্গীকারবদ্ধ" বলতে মুয়াখাহর ভিত্তিতে উত্তরাধিকারী মুহাজিরদের বুঝানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন, মুয়াখাহর বিধান থেকে উত্তরাধিকারী হওয়ার বিষয় বাতিল করা হয়েছে তবে এর আওতায় সাহায্য-সহযোগিতা ও পরামর্শ দেওয়ার বিষয় একটি নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে বহাল রয়ে গেছে। ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ দুইজন মুসলমান উইলের মাধ্যমে পরস্পরের সম্পদের অংশীদার হতে পারেন।[২১] তবে উইল ছাড়া তাদের পক্ষে তা হওয়া সম্ভব নয়। ইমাম আল নববী একই অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, "উত্তরাধিকারী বিধান অনুযায়ী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ দু'জনের পরস্পরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না হওয়াই উত্তম। অধিকাংশ মশহুর আলেমের অভিমতও এই। তবে আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, ধর্মীয় বিষয়ে পরস্পরকে সাহায্য করা, সৎকাজ ও খোদাপরস্তিতে সহযোগিতা করা এবং হক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামে মুয়াখাহর বিধান এখনো বহাল রয়েছে, বাতিল হয়নি।[২২] একমাত্র ইবনে সা'দ বর্ণিত উরওয়াহ ইবনে আল জুবায়েরের সনদসহ একটি রেওয়ায়েতে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ দুইজনের মধ্যকার উত্তরাধিকারী হওয়ার বিষয় বাতিলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। "যারা আত্মীয়, আল্লাহর বিধানমতে তারা পরস্পর বেশি হকদার..." (আল আনফাল ৮ঃ৭৫), এই আয়াতের সঙ্গে এই রেওয়ায়েত সঙ্গতিপূর্ণ। ওহুদ যুদ্ধের পর এই আয়াত নাজিল হয়।[২৩] তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে যে, ইবনে হাজর[২৪] আল হাতাত আল তামিমি ও মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের মধ্যে মুয়াখাহর বন্ধনের উল্লেখ করে বলেন যে, মুয়াবিয়ার শাসনামলে আল হাতাত ইন্তেকাল করলে এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের ভিত্তিতে মুয়াবিয়া তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। ইবনে হাজর শুধুমাত্র বিস্ময় প্রকাশের মাধ্যমে এই বর্ণনার ব্যাপারে মন্তব্য প্রকাশ করেন, কারণ আল হাতাতের

www.pathagar.com

উত্তরাধিকারী হিসেবে কয়েকটি ছেলে ছিল।[২৫] তিনি মুয়াখাহর ভিত্তিতে উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যবস্থা বাতিলের কথা উল্লেখ করেননি যা দ্বিতীয় হিজরীতে কার্যকর হয়েছিল। আল হাতাত যদি তার সম্পত্তির সম্পূর্ণ নয়, একটি অংশমাত্র মুয়াবিয়ার নামে উইল করে যেতেন তাহলেই কেবলমাত্র এই রেওয়ায়েত সত্য বলে গণ্য হতে পারতো।

উত্তরাধিকার ব্যতীত মুয়াখাহ অব্যাহত

মহানবী (সা.) পারস্পরিক সাহায্য, সহযোগিতা ও পরামর্শের ক্ষেত্রে সাহাবীদের মধ্যে মুয়াখাহ স্থাপন অব্যাহত রেখেছিলেন বলে মনে করা হয় কিন্তু তাতে সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যবস্থা ছিলনা। অনুরূপভাবে আবু আল দারদা ও সালমান আল ফারসীর মধ্যে রাসূল (সা.) মুয়াখাহ স্থাপন করিয়েছিলেন বলে কোন বর্ণনা আমরা দেখতে পাইনি।[২৬] ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে সালমান ফারসী ইসলাম গ্রহণ করেন আর একারণেই আল ওয়াকিদী ও আল বালাদুরী এধরনের রেওয়ায়েত গ্রহণ করেননি।[২৭] অনুরূপভাবে ইবনে কাসির জাফর ইবনে আবু তালিব ও মুয়াজ ইবনে জাবালের মধ্যকার মুয়াখাহ তারা নাকচ করে দিয়েছেন কারণ জাফর খায়বর বিজয়ের সময় সপ্তম হিজরীর গোড়ার দিকে মদীনায় আগমন করেন।[২৮] একইভাবে আল হাতাত ও মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের মধ্যকার মুয়াখাহ বিবরণ গ্রহণ করা হয়নি কারণ মুয়াবিয়া অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হন। উত্তরাধিকার ব্যবস্থা ছাড়া মুয়াখাহ অব্যাহত ছিল বলে আমরা যদি মনে করি তাহলে এই বিবরণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের তরফ থেকে আপত্তি উত্থাপন ও অস্বীকৃতি জানানোর কোন কারণ থাকতে পারেনা। বদর যুদ্ধের পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ দুই ব্যক্তির পরস্পরের উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়।

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে মুয়াখাহর বিধান স্থাপিত হওয়ার আগে ও পরে উত্তরাধিকার ছাড়া আমরা মুয়াখাহ স্থাপনের বিষয়কে মেনে নিলে ইবনে ইসহাকের মুয়াখাহ স্থাপনকারীদের তালিকা সংক্রান্ত বিবরণ প্রশ্নে সৃষ্ট সংশয়ের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। তার বিবরণ মহানবী (সা.) ও আলী এবং হামজা ও জায়েদ ইবনে হারিসার মধ্যে মুয়াখাহ স্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া তার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত মুয়াখাহ স্থাপনকারীদের সকলেই ছিলেন আনসার ও মুহাজির।[২৯] ইবনে কাসির মহানবী (সা.) ও আলী এবং হামজা ও জায়েদের মধ্যকার মুয়াখাহ স্থাপনের ব্যাপারে তার মন্তব্যে বলেছেন, রাসূল (সা.) আলীর (রাঃ) পরিচর্যার দায়িত্ব অন্য কারোর উপর ন্যস্ত করতে না চাওয়া ছাড়া তাদের

www.pathagar.com

মধ্যে মুয়াখাহ স্থাপনের কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়না, কেননা শৈশব থেকে রাসূল (সা.) যাদেরকে সাহায্য করেছেন ও দেখাশুনা করেছেন তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। অনুরূপভাবে হামজা তাদের মক্কেল জায়েদ ইবনে হাবিসার পরিচর্যার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করতে না চাইলে তাদের মধ্যকার মুয়াখাহ স্থাপনরেও কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়না। আর এই কারণেই রাসূল (সা.) তাদের মধ্যে মুয়াখাহ স্থাপন করেছিলেন।

ইবনে কাসির যে কারণ উল্লেখ করেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয় কেননা অন্যান্য সূত্রে হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ও কুলসুম ইবনে আল হাজাম বা অন্য কারোর মধ্যে মুয়াখাহ স্থাপন এবং জায়েদ ইবনে হারিসা ও উসায়েদ ইবনে হুজায়েরের মধ্যে মুয়াখাহ স্থাপনের কথা উল্লিখিত হয়েছে।[৩০]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ও আলীর মধ্যকার মুয়াখাহর ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারিত্বের অধিকার থাকা প্রয়োজন কিন্তু হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী কেউই রাসূলের উত্তরাধিকারী হতে পারেন না। এছাড়া আল বালাদুরী আলী ও সাহল ইবনে হানিফের মধ্যে মুয়াখাহর কথা উল্লেখ করেছেন।[৩১] আল বালাদুরী মক্কাতে মহানবী (সা.) ও আলী এবং হামজা ও জায়েদের মধ্যে মুয়াখাহ স্থাপিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন।[৩২]

এ থেকে যে কেউ এই উপসংহারে উপনীত হতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ও আলী এবং হামজা ও জায়েদের মধ্যকার মুয়াখাহ যদি সত্যই স্থাপিত হয়ে থাকে তাহলে তা ছিল পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা ও পরিচর্যার ভিত্তিতে স্থাপিত মুয়াখাহও উত্তরাধিকারবিহীন এবং আনাস ইবনে মালিকের বাড়ীতে মুয়াখাহর ব্যবস্থা ঘোষণার পর বিভিন্ন সময়ে তাদের মধ্যে এই সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

উপসংহারে একথা বলা যায় যে মুমিনদের মধ্যে স্থাপিত মুয়াখাহর বিধান উত্তরাধিকার ব্যবস্থা ব্যতিরেকে বহাল রয়েছে, এর উত্তরাধিকার বিধি বাতিল করা হয়েছে। সকল যুগের মুমিনদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা, পারস্পরিক পরিচর্যা ও পরামর্শের ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে মুয়াখাহ স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং এই মুয়াখাহ থেকে কতিপয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যা মুমিনদের সাধারণ ভ্রাতৃত্বের অধিকারের চেয়ে অধিকতর সুস্পষ্ট।

মুসলমানরা যখন মৌলিক ঈমান ও ইসলামের বিধিবিধান পালনের প্রয়োজনে তাদের সামাজিক, আঞ্চলিক ও জাতীয়তার সম্পর্ক অবলীলায় ছিন্ন করেন তখন আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল বালাদুরী, আনসাব, ১/২৮০।

২. ইবনে আব্দুল বার, আল দুরার, ১০০।

৩. ইবনে সাঈদ আল নাস, আইয়ুন আল আসর, ১/১৮৯।

৪. জা'দ আল মা'দ, ২/৭৯। ইতিপূর্বে ইবনে আল কাইয়ুমের উস্তাদ ইবনে তাইমিয়া মুহাজিরদের মধ্যে বিশেষ করে মহানবী ও আলীর মধ্যে মুয়াখাহ স্থাপনের কথা অস্বীকার করেন কারণ মুমিনরা যাতে একে অপরের যত্ন নিতে পারেন এবং তাদের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠে সেজন্য মুয়াখাহ প্রবর্তন করা হয়েছিল। মুহাজিরদের কারোর সঙ্গে মহানবীর অথবা দু'জন মুহাজিরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপনের বিষয় বোধগম্য নয়। ইবনে তাইমিয়া, মিনহাজুল সুন্নাহ আল নবুবিয়া, (মহানবীর সুন্নতের পন্থা), ৪/৯৬৭।

ইবনে হাজর বলেন, "এ হলো একটি রেওয়ায়েতের (নাস) অস্বীকৃতিজ্ঞাপনঃ এটি কিয়াসের (কোরআনুল করীম ও সুন্নাহর আলোকে গৃহীত যৌক্তিক সিদ্ধান্ত যা ইসলামী আইনের উৎস) উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে মুয়াখাহ স্থাপনের বিচক্ষণতাকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে কারণ কিছু সংখ্যক মুহাজির সম্পদ, বংশ মর্যাদা ও দৈহিক শক্তির দিক থেকে অন্যদের চেয়ে দুর্বল ছিলেন। তাই মহানবী (সা.) বলবান ও দুর্বলের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলেন যাতে একজন অপরজনকে সাহায্য করতে পারেন। মহানবী (সা.) নিজে কেন আলী (রাঃ) এর সঙ্গে মুয়াখাহ স্থাপন করেন তার ব্যাখ্যায় বলা যায়, নবুওয়াতের আগে আলী যখন শিশু ছিলেন তখন থেকেই তিনি রাসূলের প্রতি যত্ন নিতেন এবং তা অব্যাহতভাবে করে যান। অনুরূপভাবে হামজা ও জায়েদ ইবনে হারিসার মধ্যে মুয়াখাহ স্থাপিত হয়, কারণ জায়েদ তার পোষ্য ছিলেন। তাদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের বিষয় একটি প্রমাণসিদ্ধ ঘটনা এবং উভয়েই ছিলেন মুহাজির, ফাতহুল বার, ৭/২৭১।

৫. আল সিরাহ আল নবুবিয়া, ২/৩২৪।

৬. আল বুখারী, ৫/৩৯।

৭. প্রগুক্ত, ২/৩২৮।

৮. আল বালাদুরী, আনসার আল আশরাফ, ১/২৭০।

৯. ইবনে সাঈদ আল নাস, আইয়ুন আল আসর, ১/২০০, ইবনে কাসির, আল সিরাহ আল নবুবিয়াহ, ২/৩২০।

১০. ইবনে আব্দুল বার, আল দুরার, ৯৬; ইবনে সাঈদ আল নাস, আইয়ুন আল আসর, ১/২০০।

১১. ইবনে আব্দুল বার, আল দুরার, ৯৬।

১২. ইবনে সা'দ, আল তাবাকাত, প্রথম খন্ড, অধ্যায়, ২/৯।

১৩. প্রাগুক্ত, ইবনে কাইয়ুম, জাদ আল মা'দ, ২/৭৯; ইবনে সাঈদ আল নাস, আইয়ুন আল আসর, ১/২০০; ইবনে কাসির, আল সীরাহ আল নবুবিয়াহ, ২/৩২৪।

১৪. আল বালাদুরী, আনসাব, ১/২৭০; আল তাবাকাত, প্রথম খন্ড, অধ্যায় ২/৯।

www.pathagar.com

১৫. ইবনে সা'দ, আল তাবাকত, প্রথম খন্ড, অধ্যায় ২/৯।

১৬. সহীহ বুখারী, ৩/১১৯, ৬/৫৫-৬, ৮/১৯০-১; সহীহ মুসলিম, ৪/১৯৬০, ইবনে সা'দ, আল তাবাকত, প্রথম খন্ড, অধ্যায় ২/৯; আল বালাদুরী, আনসাব, ১/২৭০; ইবনে আব্দুল বার, আল দুরার, ৯৬; ইবনে কাইয়ুম, জা'দ আল মা'দ, ২/৭৯; সাঈদ আল নাস, আইয়ুন আল আসর, ১/২০০।

১৭. আল নাসাঈ, সুনান, ৬/১৩৭।

১৮. সহীহ আল বুখারী, ৫/৩৯।

১৯. ইবনে সা'দ, আল তাবাকাত, প্রথম খণ্ড, অধ্যায় ২/৯; আল বালাদুরী, আনসাব, ১/২৭০, ২৭১; ইবনে কাইয়ুম, জা'দ আল মা'দ, ২/৭৯; ইবনে সাঈদ আল নাস, আইয়ুন আল আসর, ১/২০০।

২০. আরও দেখুন, এই আয়াতের তফসির, আল্ শাউকানী, ফাতহ আল কদির ২/৩৩০-১ এই আয়াতের সাবাব আল নুজুল (নাজিল উপলক্ষ) জানার জন্য দেখুন, আল তাইয়ালিসি, মসনাদ, ২/১৯; আল হায়াসামি, মাজমা আল জাওয়াইদ, ২/২৮ (তিনি বলেন যে হাদীসটি বর্ণনাকারী ব্যক্তিবর্গ নির্ভরযোগ্য ছিলেন)।

২১. সহীহ বুখারী, ৩/১১৯, ৬/৫৫-৬, ৮/১৯০-১।

২২. সহীহ মুসলিম, ৪/১৯৬০, আল হাশিয়াহ।

২৩. আল সুয়ুতি, লুবাব আল নুকুল ফি আসবাব আল নুজুল (নাজিল কাল সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ঠ বিবরণ), ২৬০, ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত; আল শাওকানী, ফাতহ আল কাদির, ২/৩৩০-১। (তিনি বলেন, "ইবনে সা'দ, ইবনে আবু হাতিম, আল হাকিম এটি বর্ণনা করেন ও এটি যে সহীহ তারা তা প্রমাণ করেন এবং ইবনে মারদাওয়া")

২৪. ইবনে আব্দুল বার থেকে এটি বর্ণনা করেন। আর ইবনে আব্দুল বার ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম ও ইবনে কালবীর উপর নির্ভরশীল ছিলেন।

২৫. ইবনে হাজর, আল ইসাবাহ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৩০।

২৬. সহীহ বুখারী, ৫/৮৮, ৩/৪৭।

২৭. আল বালাদুরী, আনসাব, ১/২৭১।

২৮. ইবনে কাসির, আল সীরাহ আল নবুবিয়াহ, ২/৩২৬।

২৯. ইবনে হিশাম, আল সীরাত, ৪/২২২।

৩০. ইবনে হিশাম, আল সীরাত, ১/৫০৪-৭।

৩১. আল বালাদুরী, আনসাব, ১/২৭০।

৩২. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

মানব সম্পর্কের বুনিয়াদ হচ্ছে ধর্মবিশ্বাস

বিচিত্র ধরনের সম্পর্কের বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে মানুষ একত্রে বসবাস করছে। লোকের গোত্র, জাতি, দেশ ও জাতীয়তার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়। বিভিন্ন জাতীয়তার লোকেরা ধর্ম বিশ্বাস অথবা স্বার্থের কারণে একই পতাকাতলে একতাবদ্ধ হতে পারে। আত্মীয়তার সম্পর্ক অথবা একই পূর্ব পুরুষের উত্তরসূরী হবার বিষয়টিকে সম্পর্কের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয় যার উপর ভিত্তি করে প্রাচীনতম মানব সমাজ গড়ে উঠেছিল। ইসলামের অভ্যুদয়ের সময়ে আরব উপদ্বীপে গোত্রের ভিত্তিতে, পারস্যে জাতীয়তা এবং বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ধর্মের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ছিল। ইসলাম মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ধর্ম বিশ্বাস বা ঈমানকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদে পরিণত করেছে। ইসলাম অবশ্য তার মূলনীতির পরিপন্থী নয় এমন সকল সম্পর্ককে কেবল অনুমোদনই করেনি, উৎসাহিত করেছে, যেমন পারিবারিক সম্পর্ক। এরই ভিত্তিতে ইসলাম সামাজিক নিরাপত্তা ও উত্তরাধিকারী এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক ও তদানুযায়ী প্রতিবেশীর হকের মতো বিভিন্ন বিষয়ে বিধিবিধান প্রবর্তন করেছে। এছাড়া ইসলামী আইন উপজাতীয় গোত্রের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক ও মুক্তিপণ পরিশোধে সহযোগিতা এবং নগরীর লোকদের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ও নিয়ন্ত্রণ করে। নগরীর ধনাঢ্য লোকদের কাছ থেকে আদায়কৃত যাকাত বন্টনের ক্ষেত্রে নগরবাসীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। তবে এইসব সম্পর্ক ঈমানী সম্পর্কের পরিপন্থী হতে পারবে না এবং তাতে যদি ঈমানী সম্পর্ক লংঘিত বা ক্ষুণ্ন হয়, তা হলে তার কার্যকারিতা আর থাকবে না। ইসলামে পারস্পরিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। এই প্রবল আকর্ষণ কোন ব্যক্তিকে তার পিতা, ছেলে, স্ত্রী অথবা গোত্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে ফেলতে পারে। এই কারণে আবু উবায়েদা তার মুশরিক পিতার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং বদরযুদ্ধের সময়ে তাকে হত্যা করেন। আবু উবায়েদা বদরে আল কাবিল কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করার জন্য তার কাফির পিতার লাশ টেনে নেয়ার দৃশ্য দেখতে পান এবং এতে তিনি অস্থিরতা বোধ করেননি।[১]

www.pathagar.com

ইবনে ইসহাক বলেন, "বানু আব্দুল দারের মিত্র ইবনে ওহাব আমাকে জানান যে (বদরের) যুদ্ধবন্দীদের রাসূলুল্লাহর কাছে আনার পর তিনি তাদেরকে সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে বললেন ঃ এদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করবে।" মুসা'ব ইবনে উমায়েরের আপন ভাই আবু আজিজ ইবনে উমায়ের ইবনে হিশাম যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে ছিল। আবু আজিজ বলল, "ভাই মুসা'ব আমাকে তুমি নিয়ে যাও। মুসা'ব তাকে আটককারী আনসারীকে বললেন ঃ ওকে মুক্তি দেবেন না। ওর মা ধন্যাঢ্য মহিলা এবং সম্ভবতঃ ওর মুক্তির জন্য তিনি আপনাকে মুক্তিপণ প্রদান করবেন।"[২]

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেনঃ আবু আজিজ মুশরিকদের নিশানবরদার ছিল। আল নজর ইবনে আল হারিস নিহেত হবার পর সেই দায়িত্ব গ্রহণ করে। তার ভাই (মুসা'ব) যখন তাকে গ্রেফতারকারী আবু আল ইয়াসেরকে একথা বলছিলেন তখন আবু আজিজ তাকে বলল, "হে ভাই, আমার জন্য এই কি তোমার সুপারিশ?" মুসা'ব উত্তরে বলেন, তিনি (আবু আল ইয়াসের) আমার ভাই, তুমি নও।"

আল তিরমিজি[৩] একটি সনদ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সনদটি হাসান সহীহঃ "ইবনে আবু উমার আমাদেরকে বলেন, আমর ইবনে দিনার আবু সুফিয়ানকে জানান যে, তিনি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেন, "আমরা এক যুদ্ধে (গাজওয়া) নিয়োজিত ছিলাম। আবু সুফিয়ান বলেন ঃ সম্ভবত এটি ছিল বানু মুস্তালিকের বিরুদ্ধে। এ সময় একজন মুহাজির একজন আনসারকে ধাক্কা দেয়। .... আব্দুল্লাহর ইবনে উবাই ইবনে সালূল এই ঘটনা শুনে বলেন ঃ "পরিস্থিতি এতোদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে? আল্লাহর কসম, আমরা মদীনায় ফেরার পর শক্তিবানরা সেখান থেকে দুর্বলদেরকে বহিষ্কার করবে।" তার ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ তাকে বলেন ঃ "আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসূল বলবান এবং আপনি দুর্বল, একথা স্বীকার না করা পর্যন্ত আপনি ফিরে যেতে পরবেন না এবং তার পিতা তাই করেছিলেন।"

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই সব সময় পিতার সঙ্গে সদাচরণ ও তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন,[৪] কিন্তু তার কাছে ঈমানী আকর্ষণ ছিল এরচেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আর একারণে তিনি যখন দেখতে পেলেন যে তার পিতা মুসলমানদের অমর্যাদা করেছেন তখন তিনি নিজ পিতাকে হত্যা করে তার মস্তক রসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে হাজির করার প্রস্তাব দেন।[৫]

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআনে নূহ (আঃ) ও তাঁর ছেলেদের কাহিনীতে ঈমানের বিষয়কে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রসঙ্গ এভাবে বিবৃত হয়েছে ঃ

> "আর নূহ তার পালনকর্তাকে ডেকে বললেন, হে পরওয়ারদেগার, আমার পুত্রতো আমার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত, আর আপনার ওয়াদা নিঃসন্দেহে সত্য আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী। আল্লাহ বলেন, হে নূহ! নিশ্চয় সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয় সে দুরাচার। সুতরাং আমার কাছে এমন দরখাস্ত করবেন না যার খবর আপনি জানেন না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে আপনি অজ্ঞদের দলভুক্ত হবেন না" (আল হুদ ১১ঃ৪৫-৪৬)।

আল্লাহর পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে, রক্তের সম্পর্কের দিক থেকে নূহের ছেলে তার পরিবারের অংশ হওয়া সত্ত্বেও সত্য বর্জন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসের কারণে সে বস্তুতপক্ষে তার পরিবারের অংশ ছিল না। পবিত্র কোরআন নূহ ও তার ছেলের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করার স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে এরশাদ করেছেনঃ 'তার আচরণ সঠিক ছিল না।' ঈমানের পরিপন্থী হওয়ার কারণে এমন গভীর সম্পর্কও যদি ছিন্ন হতে পারে, তাহলে ঈমানের দাবীর পরিপন্থী হলে রক্ত, গোত্র, জাতি ও বর্ণগত সম্পর্কও যে ছিন্ন হতে বাধ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইসলাম কেবলমাত্র মুমিনদের মধ্যেই ভ্রাতৃত্ব ও গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। আল্লাহ এরশাদ করেছেন, 'মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই..." (আল হুজরাত ৪৯ঃ১০)। ইসলাম ঈমানদার ও কাফেরদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ করেছে, হোক সে মুশরিক, ইহুদী বা খৃস্টান, এমন কি তারা পিতা, ভাই অথবা সন্তান হলেও। কোন মুমিন অনুরূপ না করলে ভুল করবেন। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, একজন মুমিনের পক্ষে কোন কাফেরকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা মারাত্মক গুনাহের কাজ। আল্লাহ এরশাদ করেছেনঃ

> "হে ঈমানদারগণ, তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করোনা যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে বেশী ভালবাসে। আর তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমা লংঘনকারী।" (আত তাওবা ৯ঃ২৩)

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআন মুসলমানদের সকল পার্থিব স্বার্থ ও সম্পর্ককে নিক্তির একদিকে রেখেছে আর অন্যদিকে রেখেছে আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ভালবাসা ও ঈমানের পথে সংগ্রাম করাকে। কোরআন মুমিনদেরকে ঈমানের চেয়ে সামাজিক স্বার্থ ও সম্পর্ককে অধিকতর গুরুত্ব দেয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছে। আল্লাহ এরশাদ করেন ঃ

> "বল, তোমাদের কাছে তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধনসম্পদ, তোমাদের ব্যবসা, যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান, যাকে তোমরা পছন্দ কর– আল্লাহ, তার রাসূল ও তার পথে জিহাদ করা থেকে তা অধিকতর প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না।" (আত তাওবা ৯ঃ২৪)

সূরা তাওবার এই আয়াতসমূহে মদীনার নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য সেখানে হিজরত করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হয়। মহান সাহাবীগণ ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারা তাদের প্রিয় পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য মদীনায় হিজরত করেন। অতঃপর ইসলাম মদীনায় একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। ঈমানের ভিত্তি ও ইসলামের প্রতি অঙ্গীকারের বুনিয়াদের উপর গড়ে উঠে এ সমাজ। যেখানে কেবলমাত্র আল্লাহ তার রাসূল ও মুমিনদের পক্ষ থেকে বন্ধুত্ব ও নিরাপত্তার পূর্ণ স্বীকৃতি বজায় ছিল। এই সম্পর্ক হচ্ছে সর্বোত্তম সম্পর্ক, কারণ তা বিশ্বাস, চিন্তা ও চেতনার ঐক্য থেকে উৎসারিত। মুমিনেরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু ও হেফাজতকারী। পরস্পরের প্রতি গভীর অনুরাগ তাদের শিরায় শিরায় মিশে রয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করবে (আবু দাউদ, নাসাহু ইবনে মাজাহ)। এ সমাজ একটা উন্মুক্ত সমাজ। বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে যে কেউ চাইলে এ সমাজে প্রবেশ করতে পারবেন। এজন্য শর্ত হচ্ছে তার অস্বাভাবিক অভ্যাস ও কর্মকান্ড বর্জন এবং ইসলামী জীবনধারা গ্রহণ, যাতে তিনি সকল মুসলমানের সমান অধিকার ভোগ করতে পারেন।

তথ্যসূত্র ঃ

১. ইবনে হিশাম, সীরাত, ২/৭৫।
২. ইবনে কাসির, আল বিদাইয়াহ, ১/১০৬-৭।
৩. তিরমিজি, সুনান, ৫/৯০, কিতাব আল তাফসির।
৪. আল হুমাইদী, মুসনাদ, ২/৫২০।
৫. আল হায়াসামী, মুজমা আল জাওয়াদ, ৯/৩১৮।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

মদীনার সমাজের ভিত্তি ভালবাসা

ইসলাম ভালবাসা ও পারস্পরিক সহমর্মিতার বুনিয়াদের উপর মদীনার সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। হাদীস শরীফে একথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ "পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসা ও প্রেম অনুরাগের বেলায় মুসলমান জাতি একটি দেহের ন্যায়। দেহের একটি অঙ্গ যদি আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহলে এক এক করে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার মর্মস্পর্শী বেদনায় ব্যথিত হয়।"[১] মুসলিম সমাজের সদস্য, সে বৃদ্ধ বা যুবক, ধনী অথবা গরীব এবং শাসক বা প্রজা যেই হোকনা কেন; অনুরাগ, সহমর্মিতা ও ঘনিষ্ঠতার উপর ভিত্তি করে তাদের পরস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠে।

ইসলামের শিক্ষায় সমাজে ভালবাসার সম্পর্ক বিকশিত করার দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন রয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার অপর ভাইয়ের জন্যও তা-ই পছন্দ না করবে।" (বুখারী, মুসলিম)।[২] মুমিনরা এমন একটি সমাজে বাস করবে যেখানে থাকবেনা স্বার্থপরতা ও বঞ্চনা এবং জীবন সমস্যা মোকাবেলায় একে অপরকে সাহায্য করবে। "যে তার ভাইকে সাহায্য করে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন" (তিরমিজি, ইমাম আহমদ)।[৩] "আল্লাহর বান্দা যতদিন পর্যন্ত তার ভাইকে সাহায্য করবে আল্লাহ ততদিন পর্যন্ত তাকে সাহায্য করবেন।" (তিরমিজি, আবু দাউদ।)[৪]

মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার উপর নির্ভরশীল। ধনী গরীবকে, শাসক শাসিতকে এবং সবল দুর্বলকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ "কোন মুসলিম ভাইকে অমর্যাদা করা কোন ব্যক্তির অসৎ হওয়ার জন্য যথেষ্ট" (মুসলিম)।[৫]

রাগের মুহূর্তে দু'জন মুসলমান ভাইয়ের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে এবং ছিন্নও হতে পারে, কিন্তু তা তিনদিনের বেশী স্থায়ী হতে পারবে না ঃ "একজন মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশী কথা না বলা অন্যায়" (বুখারী, মুসলিম)।[৬]

উপহার প্রদান ও সদকা দেয়ার মাধ্যমে এই ভালবাসার বুনিয়াদ মজবুত করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে ঃ "তোমরা পরস্পরকে উপহার দাও এবং একে অপরকে ভালবাস" (হাদীস)।[৭] ধনীরা সমাজের কল্যাণে অর্থদান করে এবং এতে সম্পদের অসম বন্টনের কারণে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোতে যে ব্যবধানের

www.pathagar.com

সৃষ্টি হয় তা পূরণ হয়। আল্লাহর হুকুম অনুসারে ধনীরা তাদের সম্পদের যাকাত আদায় এবং নিজেদের সম্পদ থেকে অভাবীদের সাহায্য করে। তাই গরীবরা ধনীদের সম্পদ বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হয়না, কারণ এই বৃদ্ধি শুভেচ্ছা ও সাহায্য হিসেবে তাদের কাছে ফিরে আসবে। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ

"মদীনায় বসবাসকারী আনসারদের মধ্যে আবু তালহার সর্বোচ্চ সংখ্যক খেজুর বাগান ছিল। তার মধ্যে মসজিদে নববীর ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত বাইরুহা বাগানটি তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রায়ই বাগানটিতে যেতেন এবং সেখান থেকে পানি পান করতেন।

"সবচেয়ে প্রিয় বস্তুটি আল্লাহর পথে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না।" (আলে ইমরান ৩ঃ৯২) এই আয়াত নজিল হবার পর আবু তালহা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ বলেছেন, "নিজের ভালবাসার বস্তু ব্যয় না করা পর্যন্ত সত্যিকার মুমিন হওয়া যাবে না এবং আমার কাছে আমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তুত হচ্ছে বাইরুহা বাগানটি, তাই আমি আল্লাহর পথে বাগানটি দান করছি। আমি আশা করছি যে আমার বাগানের সামগ্রী গ্রহণ করা হবে এবং আমি আল্লাহর জন্য তা হেফাজত করবো। আল্লাহর রাসূল আল্লাহ নির্দেশিত পন্থায় এর নিষ্পত্তি করে বললেন ঃ "তুমি যা বলেছো আমি তা শুনেছি এটি একটি মূল্যবান সম্পত্তি এবং আমি মনে করি, তোমার নিকট আত্মীয়দের মধ্যে এটি বন্টন করা উচিত।" হে আল্লাহর রাসূল, আমি তাই করবো। এরপর তিনি তার আত্মীয়-স্বজন ও চাচাত ভাইদের মধ্যে এই সম্পত্তি বন্টন কর দিলেন।"[৮]

ধনী সাহাবীগণ একথা উপলব্ধি করেছিলেন যে তাদেরকে তাদের অর্জিত সম্পদ সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। তারা যখন দেখতেন যে রাষ্ট্র কোন প্রয়োজন পূরণ করতে পারছে না অথবা তার প্রতি দৃষ্টি দেয়নি, তখন তারা নিজেরাই নিজেদের অর্থ কোরবানী করে তা পূরণ করতেন। ইতিহাস সাক্ষী, খলিফা আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর যুগে মদীনায় অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। সে সময় হযরত উসমান (রাঃ) গম, তেল ও কিসমিস বোঝাই এক হাজার উটের এক বিরাট বাণিজ্য বহরের পুরোটায় গরীব মুসলমানদের জন্য সদকা হিসেবে দান করে দেন। সে সময়ে ব্যবসায়ীরা তাকে এই সামগ্রীর জন্য মুনাফা হিসেবে ক্রয় মূল্যের পাঁচগুণ দেয়ার প্রস্তাব দেয়। হযরত উসমান (রাঃ) বললেন ঃ "আমরাই তো মদীনার ব্যবসায়ী এবং আমাদের আগে কেউতো আপনাদের কাছে আসেনি, তাহলে কে আপনাদের কাছে এমন প্রস্তাব দিল? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে এরচেয়ে দশগুণ বেশী সম্পদ দান করেছেন।" অতঃপর তিনি গরীব মুসলমানদের মধ্যে তা বিলিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

আমাদের পূর্বসূরী খোদাভীরু ও হেদায়েতপ্রাপ্ত মুসলমানদের জীবনীতে আমরা এ ধরনের অসংখ্য কাহিনী দেখতে পাই। একারণেই ইসলামী সমাজে শ্রেণী মানসিকতা ও শ্রেণী সংঘাত দেখা দেয়নি। অর্থনৈতিক স্বার্থে উচ্চবিত্ত বা নিম্নবিত্তের লোকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য কাউকে সংঘবদ্ধ হতে দেখা যায়নি। ইসলামী সমাজে কখনও শ্রেণী দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়নি এবং এই সমাজে না গরীবের উপর ধনীর অথবা প্রজা সাধারণের উপর শাসকদের প্রাধান্য কখনও স্বীকৃতি পায়নি। সূচনাকাল থেকেই ইসলামী সমাজ বর্ণ, গোত্র অথবা জন্মগত কারণে মানুষের মধ্যে কোন ধরনের ব্যবধানকে স্বীকার করেনি। মুসলমানরা চিরুনীর দাঁতের মতোই পরস্পর সমান মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহর কাছে পরহেজগারীর মানদন্ড আর কোন দিক দিয়ে কেউ কারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হতে পারে না।

ইসলামী সমাজ সকলের জন্য উন্মুক্ত। এই সমাজের সকল সদস্য সমান মর্যাদার সাথে বসবাস করে এবং নিজেকে বিকশিত করার ও জীবন নির্বাহে অর্থোপার্জনে সমান সুযোগ পায়। এখানে কোন সামাজিক বৈষম্য নেই। কোন গরীব লোককে কোন ধনাঢ্য রমনীকে বিয়ে করা থেকে কখনও নিবৃত্ত করা হয়না। অথবা কোন দুর্বল ব্যক্তিকে দেশের সর্বোচ্চ পদ বা সমাজের নেতৃত্বের সর্বোচ্চ আসন লাভে বাধা দেয়া হয় না। সদস্যদের আরও অগ্রগতি অর্জনে অন্তরায় হিসেবে দাঁড়াতে পারে এমন কোন শ্রেণী এ সমাজে খুঁজে পাওয়া যাবে না। যদি ইসলামী সমাজের বৈজ্ঞানিক, মার্জিত ও সুসভ্য অগ্রগতি অব্যাহত থাকতো এবং আজকের মানবতার নেতৃত্ব দিত তাহলে ধ্বংসের কারণ ঘৃণা-বিদ্বেষ ও সংঘাত নয় পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সাহায্য-সহমর্মিতার ভিত্তিতে শক্তিশালী সমাজ গঠনে ইসলামের সৌন্দর্য আমাদের সামনে আরো সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়তো।

যদি মদীনার সমাজের ধনীদের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি এরূপ হয় তাহলে সেখানকার দুর্বল ও গরীবদের আচরণ কেমন ছিল?

তথ্যসূত্র ঃ

১. সহীহ মুসলিম।
২. সহীহ বুখারী, মুসলিম।
৩. তিরমিজি, ইমাম আহমদ।
৪. তিরমিজি, আবু দাউদ।
৫. সহীহ মুসলিম।
৬. সহীহ বুখারী/মুসলিম।
৭. আবু ইয়ালা, আল আলাকির।
৮. সহীহ বুখারী ৬/৩১. কিতাব আল তাফসির।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

সমমর্যাদার ভিত্তিতে ধনী ও গরীবের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম

নতুন ইসলামী সমাজে সমমর্যাদার ভিত্তিতে ধনী ও গরীব লোকেরা ঐক্যবদ্ধভাবে কঠোর সংগ্রামের সূত্রপাত করেন। ইসলামী ধর্মবিশ্বাস এই সমাজে শ্রেণী সংঘাত রোধ করে ধনী ও গরীবের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলে এবং জিহাদের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত পূরণের জন্য গভীর ঐক্য ও ঘনিষ্ঠ আত্মিক বন্ধন রচনা করে। নিম্নে মদীনার সমাজের একটি চমৎকার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এতে রাসূলের (সা.) সময়ে একদল সবচেয়ে গরীব মুসলমান কিভাবে দিন কাটাতেন তার বিবরণ ফুটে উঠেছে।

আল্লাহ এরশাদ করেন ঃ

> "বিশেষ করে এমন সব গরীব লোক সাহায্য লাভের অধিকারী, যারা আল্লাহর কাজে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত অর্থোপার্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারেনা এবং তাদের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে স্বচ্ছল বলে মনে করে। তাদের চেহারা দেখেই তুমি তাদের ভেতরের অবস্থা জানতে পারো। মানুষের পিছনে লেগে থেকে কিছু চাইবে, এমন লোক তারা নয়। তাদের সাহায্যার্থে তোমরা যা কিছু অর্থ ব্যয় করবে তা আল্লাহর দৃষ্টির অগোচরে থাকবে না" (বাকারা ২ঃ২৭৩)।

ইবনে সা'দ[১] তার আল তাবাকাতে কা'ব আল কারাজীর সনদসহ এক রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন, তাতে বলা হয়েছে যে, এই আয়াত আহল আল সুফ-ফাহ সম্পর্কে নাজিল হয়। আল তাবারী[২] মুজাহিদ ও আল সিদ্দির দলিলের উদ্ধৃতি দিয়ে তার তাফসিরে উল্লেখ করেন যে, মুহাজিরদের মধ্যকার গরীবদের সম্পর্কে এই আয়াত নাজিল হয়।

সে যাই হোক, আমি এখানে প্রথম ইসলামী সমাজের গরীবদের জীবন সম্পর্কে একটি বিবরণ তুলে ধরতে চাইঃ এই গরীব ব্যক্তিবর্গ হলেন আহল আল সুফফাহ।

www.pathagar.com

গরীব মুহাজিরগণ

মক্কা থেকে মুসলমানদের মদীনায় হিজরত করার পরে মুহাজিরদের জীবিকা নির্বাহ অত্যন্ত কঠিন সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। ঈমান আনার কারণে মুশরিকরা মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছিল। এই নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য মুহাজিরগণ মক্কায় বাড়ীঘর ও সহায়সম্পদ ফেলে রেখে মদীনায় চলে আসেন।

মদীনার প্রধানতঃ কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি হওয়ার কারণে অনেক মুহাজির প্রথমে মদীনায় এসে কোন কাজ করতে পারেননি।

মুহাজিরগণের কৃষি সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা ছিলনা কারণ মক্কা ছিল একটি বাণিজ্যিক সমাজ। তারা মদীনায় কোন কৃষি জমির মালিকানা লাভ করেননি এবং তাদের কাছে কোন মূলধনও ছিলনা, কারণ তারা মক্কাতে তাদের সকল সম্পদ ফেলে রেখে এসেছিলেন। আনসারগণ তাদের মুহাজির ভাইয়ের সাহায্যের জন্য সবকিছু করেন। তারপরও অনেকের আশ্রয়ের প্রয়োজন থেকে যায়।

মদীনায় মুহাজিরদের আগমন অব্যাহত থাকে; বিশেষ করে খন্দকের যুদ্ধের আগে দলে দলে লোক হিজরত করে মদীনায় আসেন। সে সময় তাদের অনেকে মদীনায় বসতি স্থাপন করেন। প্রায়ই মদীনায় প্রতিনিধি দল আসতো। এসব প্রতিনিধি দলে এমন অনেকে ছিলেন যাদের এই নগরীতে কোন পরিচিত কেউ ছিল না। এসব আগন্তুকের জন্য একটি স্থায়ী অথবা সাময়িক আশ্রয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়।

এই প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) গরীব বাসিন্দা এবং বিভিন্ন সময়ে আগত প্রতিনিধি দলের জন্য একটি আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার চিন্তা করলেন।

আল সুফফাহ

কিবলা পরিবর্তন করা হলো। বায়তুল মাকদিস (জেরুসালেম) থেকে মক্কার কাবা শরীফের দিকে। মহানবী (সা.) এর মদীনায় হিজরত করার ষোল মাস পরে এই ঘটনা ঘটে।[৩] এই ভৌগলিক দিক পরিবর্তনের ফলে মসজিদে নববীর প্রথম কিবলার দিকের দেয়াল পশ্চাৎদিকের দেয়ালে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর একটি ছাদ নির্মাণ করার নির্দেশ দিলেন এর নাম দেয়া হলো আল সুফফাহ

www.pathagar.com

(যার অর্থ উঁচু মঞ্চ বা বেঞ্চ) অথবা আল জিল্লাহ বা ছাউনি।[৪] কিন্তু তখনও এর তিন দিক উন্মুক্ত ছিল।[৫]

ইবনে জুবায়ের তার রিহলাহতে (ভ্রমণ কাহিনী) উল্লেখ করেছেন যে আল সুফফাহ হচ্ছে কুবার শেষ প্রান্তে নির্মিত একটি ঘর এবং সেখানে আহল আল সুফফাহগণ বসবাস করতেন। আল সমহুদী এ প্রসঙ্গে বলেন যে আহল আল সুফফাহ নামে পরিচিত ব্যক্তিবর্গকে পরে এই ঘরটিতে থাকতে দেয়া হয় আর এই কারণে ঘরটি আহল আল সুফফাহ নামে পরিচিতি লাভ করে এবং ইবনে যুবায়ের এই ঘরকে আহল সুফফাহ বলে সনাক্ত করেন। এই ঘরের নাম অনুসারে সুফফাহ নাম গ্রহণ করা হয়নি বরং মদীনার মসজিদে নববীর সুফফাহ থেকে তা গ্রহণ করা হয়।

সুফফাহতে কতজনকে স্থান দেয়া সম্ভব হয়েছিল তা আমরা জানিনে তবে সখোনে বিপুল সংখ্যক লোকের জায়গা দেয়ার সুযোগ ছিল, কারণ মহানবী (সা.) এই স্থানে বিবাহোত্তর ভোজানুষ্ঠানের আয়োজন করতেন, তাতে প্রায় ৩০০ জন লোক যোগদান করতো। তাদের কেউ কেউ অবশ্য মহানবীর পত্নীগনের ব্যবহৃত মসজিদে সংলগ্ন কক্ষগুলোর একটিতেও বসতেন।[৬]

সুফফাহতে যারা বাস করতেন

সুফফাহতে বসবাসকারী প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ মুহাজিরগণ। তাদের নামের সঙ্গে সুফফাহকে যুক্ত করে তাদেরকে বলা হতো সুফফাহ আল মুহাজিরিন।[৭] ইসলাম গ্রহণ এবং রাসূল (সা.) এর কাছে বায়াত গ্রহণের জন্য প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আগত মুসাফিরগণও সেখানে অবস্থান করতেন। রাসূলুল্লাহর (সা.) কাছে আগত কোন ব্যক্তির পরিচিতি (আরিফ) কেউ মদীনায় থাকলে তিনি তার ওখানে যেয়ে থাকতেন, অন্যথায় তিনি আহল আল সুফফাহদের সঙ্গে অবস্থান করতেন।[৯] আবু হুরায়রা (রাঃ) আল সুফফাহর স্থায়ী বাসিন্দা ও সাময়িকভাবে অল্প সময়ের জন্য অবস্থানকারী ব্যক্তিবর্গ উভয়ের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে ডাকতে চাইলে আবু হুরায়রাকে সে দায়িত্ব অর্পণ করতেন কারণ তিনি তাদেরকে চিনতেন এবং এবাদত ও জিহাদের ক্ষেত্রে কার কি অবস্থা তাও তিনি জানতেন।[১০] মুহাজির ও নগরীরর বাইরের মুসাফির ছাড়াও কিছু সংখ্যক আনসারও আল সুফফাহদের সঙ্গে বসবাস করার জন্য আসতেন কারণ তারা কঠিন সাধনা (জুহদ) ও দরিদ্রের হালে জীবন যাপন করতে চাইতেন। যদিও

www.pathagar.com

তাদের এরূপ না বললেও চলতো এবং মদীনাতে তাদের বাড়ীঘর ছিল। তাদের মধ্যে যারা ছিলেন তারা হলেনঃ কা'ব ইবনে মালিক আল আনসারী, হানজালা ইবনে আবু আমীর আনসারী (শাহাদত বরণের পর ফেরেশতাগণ যাদের গোসল করান তিনি ছিলেন তাদের একজন), হারিসা ইবনে আল নূ'মান আল আনসারী এবং আরও অনেকে।[১১]

বিভিন্ন গোত্রের লোকদের নিয়ে আহল আল সুফফাহ গড়ে উঠে, সে কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে বলতেন আল আওফাদ (পাঁচমিশালী জনতা)। তাদেরকে এই নামে অভিহিত করার পিছনে আরেকটি কারণও রয়েছে, তা হল তাদের প্রত্যেকের একটি করে চামড়ার বাক্স (ওয়াফদা) ছিল এবং তারা ছোট তূনীর আকারের এই বাক্সে নিজেদের খাদ্যদ্রব্য রাখতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রথম বর্ণনাটিই অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।[১২]

আল সুফফাহর বাসিন্দাদের সংখ্যা

বিভিন্ন সময়ে তাদের সংখ্যায় তারতম্য ঘটতো। মদীনায় প্রতিনিধিদল আগমন করলে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত এবং আগন্তুকরা চলে গেলে তাদের সংখ্যা হ্রাস পেত। তবে সাধারণত স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০।[১৩] তাদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সা'দ ইবনে উবাদা মাঝে মধ্যে একাই ৮০ জন পর্যন্ত লোকের মেহমানদারি করতেন, এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অন্যান্য সাহাবীর বাড়ীতেও আরও অনেক মেহমানকে স্থান দেয়া হতো।[১৪]

আল সামহুদী উল্লেখ করেন যে আবু নূয়াইম-এর আল হিলাইয়া গ্রন্থে নামের একটি তালিকা দেয়া হয়েছে এবং তাদের সংখ্যা ছিল শতাধিক।[১৫]

আবু নূয়াইমের দেয়া নামের তালিকায় অবশ্য মাত্র ৫২ জনের নাম পাওয়া গেছে। তিনি বলেছেন, তাঁদের পাঁচজন আহল আল সুফফাহর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। আবু নূয়াইম হচ্ছেন একমাত্র বিশেষজ্ঞ যিনি আহল আল সুফফাহর বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের নামের একটি দীর্ঘ তালিকা প্রদান করেছেন। তিনি প্রাথমিক সূত্র থেকে তালিকাটি প্রণয়ন করেন। তিনি অবশ্য তাঁর সূত্রের কথা উল্লেখ করেননি। তিনি সম্ভবত আবু আব্দুর রহমান আল সালামীর (৪১২ হিঃ) কিতাব থেকে এই তালিকা উদ্ধৃত করেন। আবু আব্দুর রহমান আল সালামী আহল আল সুফফাহ সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।[১৬]

www.pathagar.com

আবু নূয়াইমের দেওয়া তালিকা এবং অন্যান্য সূত্রে উল্লিখিত আহল আল সুফফাহর সদস্যের নামসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলঃ

১. আবু হুরায়রা (তিনি নিজেই বলেছেন, তিনি তাদের একজন ছিলেন।[১৭]
২. আবুজর আল গিফারী (তিনি বলেছেন, তিনি তাদের একজন ছিলেন।[১৮]
৩. ওয়াসিলা ইবনে আস্‌কা।)[১৯]
৪. কায়েস ইবনে তোহফা আল গিফারী (তিনি বলেছেন যে তিনি তাদের একজন ছিলেন)।[২০]
৫. কা'ব ইবনে মালিক আল আনসারী।[২১]
৬. সাঈদ ইবনে হাজিব আল জুমাহী।
৭. সালমান আল ফারসী।
৮. আসমা ইবনে হারিসা ইবনে সায়ীদ আল আসলামী।
৯. হানজালা ইবনে আবু আমীর আল আনসারী (ফেরেশ্‌তাগণ যাদেরকে গোসল করিয়েছিলেন তিনি ছিলেন তাদের একজন)।
১০. হাজিম ইবনে হারমালা।
১১. হারিসা ইবনে নু'মান আল আনসারী আল নাজ্জারী।
১২. হুজায়ফা ইবনে (উসায়েদ আবু সুরাইহা আল আনসারী)।
১৩. হুজায়ফা ইবনে ইয়ামান (তিনি মুজাহির ছিলেন কিন্তু তিনি নিজেকে আনসারদের সঙ্গে মিত্রতায় আবদ্ধ করেন এবং তাকে আনসারদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণনা করা হয়)।
১৪. জারিয়াহ ইবনে জামিল ইবনে শাবাহ ইবনে কুরত।
১৫. জুয়াইল ইবনে জামিল সুরাকা আল জুমারী।
১৬. জুরহুদ ইবনে খুওয়াইলিদ (বা ইবনে রাজাহ) আল আসলামী।[২২]
১৭. রাফাহ আবু লুবাবাহ আল আনসারী (কথিত আছে যে তিনি বনু আমর ইবনে আওয়াফ গোত্রের লোক এবং তার নাম ছিল বশীর ইবনে আব্দুল মুনজীর)।
১৮. আব্দুল্লাহ জু আল বিজাদাইন।
১৯. দুকাইন ইবনে সাঈদ আল মাজিনী (অথবা আল কাসেমী)[২৩]
২০. খুবায়ের ইবনে ইয়াসাফ ইবনে আনাবাহ।
২১. করিম ইবনে আওয়াস আল তায়ী।

www.pathagar.com

২২. করিম ইবনে ফাতিক আল আসাদী।
২৩. খুনায়েস ইবনে হাদফা সাহামী।
২৪. খাব্বাব ইবনে আল আর্ত।
২৫. আল-হাকাম ইবনে উমাইর আল শামালী।
২৬. হারমালা ইবনে আইয়াস (বলা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন হারমালাহ ইবনে আব্দুল্লাহ আল আনবারী)।
২৭. জায়েদ ইবনে আল খাত্তাব।
২৮. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ।
২৯. আল তাফায়ী দাউসী।
৩০. তালহ ইবনে আমর আল নাজরী।
৩১. সাফওয়ান ইবনে বায়দা আল ফিহরী।
৩২. সুয়ায়েব ইবনে সানান আল রুমী।
৩৩. শাদ্দাদ ইবনে উসায়েদ।
৩৪. শাকরান (রাসুলুল্লাহ (সা.) এর মওলা)।
৩৫. সোয়েব ইবনে খালেদ।
৩৬. সলিম ইবনে উমায়ের। তিনি আওয়াস গোত্রের বনু সালাবা ইবনে আমর ইবনে আওয়াফের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।
৩৭. সলিম ইবনে উবায়েদ আল আশজাই।
৩৮. সাফিনা (রাসুলুল্লাহ (সা.) এর মওলা)।
৩৯. সলিম (আবু হুজাইফার মওলা)।
৪০. আবু ফাজিন।
৪১. আল আসার আল মাজানী।
৪২. বিলাল ইবনে রাবাহ।
৪৩. আল বারিরা ইবনে মালিক আল আনসারী।
৪৪. শাউবান (রাসুলুল্লাহ (সা.) এর মওলা)।
৪৫. সাবিত ইবনে ওয়াজিহা আল আনসারী।
৪৬. সাকিফ ইবনে আমর ইবনে শামিত আল আসাদী।
৪৭. সা'দ ইবনে মালিক আবু সাঈদ আল খুদরী।
৪৮. আল আরবাদ ইবনে সারিয়া।[২৪]

www.pathagar.com

৪৯. গুরতা আল আজাদী।[২৫]

৫০. আব্দুর রহমান ইবনে কির্ত।[২৬]

৫১. আব্বাদ ইবনে খালিদ আল গিফারী।[২৭]

(ভূলবশত ইংরেজী সংস্করণে একটি নাম বাদ পড়েছে- অনুবাদক)

আহল আল সুফফাহর অন্তর্ভুক্ত বলে যে ব্যক্তিবর্গের নাম বলা হতো আবু নুয়াইম তাদের নামও উল্লেখ করেন তবে বলেন যে, তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।[২৮] তারা হলেনঃ

১. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস।

আহল আল সুফফাহ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের এই আয়াতে "আর তাদেরকে বিতারিত করবেননা যারা সকাল বিকাল স্বীয় পালনকর্তার এবাদত করে, তার সন্তুষ্টি কামনা ...." (আল আনাম ৬ঃ৫২) এর ভিত্তিতে তাকে আহল আল সুফফাহর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে ইবনে কাসিরের তফসিরে বলা হয়েছে যে, এই আয়াত মক্কাতে নাযিল হয়েছেল, আহল আল সুফফাহ সম্পর্কে নয়।

২. হাবীব ইবনে জায়েদ ইবনে আসিম আল আনসারী আল নাজ্জারী। তিনি আল আকাবায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং ভুলবশতঃ তার নাম আহল আল সুফাফাহর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৩. আবু আইয়ুব আল আনসারী।

তিনি আল আকাবায় উপস্থিত ব্যক্তিদের একজন ছিলেন।

৪. হাজ্জাজ ইবনে আল মাজ্জিনী আল আনসারী।

৫. সাবিত ইবনে আল দাহ্হাক আল আনসারী।

জ্ঞান চর্চা, এবাদত ও জিহাদের প্রতি আহল আল সুফফাহর গভীর অনুরাগ

আহল আল সুফফাহ জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন এবং এবাদতে মশগুল থাকার জন্য তারা মসজিদে অবস্থান করতেন। তারা নিঃশঙ্কচিত্তে দারিদ্র্য ও দুঃখ-কষ্টের কঠিন জীবন বেছে নিয়েছিলেন। নিঃসঙ্গ জীবনে তারা সবসময় নামাজ, কোরআন তেলওয়াত, একত্রে কোরআন অধ্যয়ন এবং আল্লাহর জিকিরে নিমগ্ন থাকতেন। তাদের কেউ কেউ লেখা শিখতেন। কোরআন তেলওয়াত ও লেখা শিক্ষা দেয়ার জন্য তাদের একজন উবায়েদা ইবনে আল সামিতকে তার ধনকটি

www.pathagar.com

উপহার দেন।[২৯] তাদের অনেকে জ্ঞানার্জন ও হাদীস মুখস্থ করে সুখ্যাতি অর্জন করেন, যেমন, আবু হুরায়রা (রাঃ)। বিপুল হাদীস বর্ণনার জন্য আবু হুরায়রা বিখ্যাত এবং হুজায়ফা ফিতান সংক্রান্ত হাদীস সম্পর্কে পারদর্শী ছিলেন।

কিন্তু জ্ঞান চর্চা ও এবাদতে আত্মনিয়োগ আহল আল সুফফাহকে সামাজিক জীবনের কর্মকান্ড ও জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। তাদের অনেকে বদর যুদ্ধে শহীদ হন, যেমন সাফওয়ান ইবনে বায়েদা, জায়েদ ইবনে আল খাত্তাব, করিম ইবনে ফাতিক আল আসাদী, খুবায়েব ইবনে ইয়াসফ, সলিম ইবনে উমায়ের নূ'মান আল আনসারী।[৩০] আহল আল সুফফাহর কয়েকজন ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হন, যেমন হানজালা আল গাসিল।[৩১] তাদের কেউ কেউ হুদায়বিয়ার সন্ধি প্রত্যক্ষ করেন যেমন জুরহুদ ইবনে খুয়াইলিম ও আবু শুরাইয়া আল গিফারী।[৩২] আহল আল সুফফাহদের কয়েকজন খায়বার যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন, যেমন, সাকিফ ইবনে আমর।[৩৩] তাদের কেউ কেউ তাবুক যুদ্ধে শহীদ হন, যেমন আব্দুল্লাহ জু আল বিজাদাইন।[৩৪] ইয়ামামার যুদ্ধেও তাদের কয়েকজন শহীদ হন, যেমন আবু হুজায়ফার মওলা সলিম ও জায়েদ ইবনে আল খাত্তাব।[৩৫]

এভাবে তারা এবাদত করে রাত কাটাতেন আর দিনে জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন।

আহল আল সুফফাহর পোশাক

আহল আল সুফফাহর শীত নিবারণ অথবা সম্পূর্ণ শরীর আবৃত করার মতো পোশাক ছিল না।[৩৬] তাদের কারোই পূর্ণাঙ্গ একসেট পোশাক ছিল না।[৩৭] তারা হয় একপ্রস্ত কাপড় গলার সঙ্গে বেঁধে রাখতেন অথবা আলাখিল্লাহ পরতেন,[৩৮] কিংবা সংক্ষিপ্ত বস্ত্র বা অন্য কোন পোশাক গায়ে জড়িয়ে রাখতেন।[৩৯] তাদের অনেকের পোশাক হাটুর নীচ পর্যন্ত আবৃত হতো কিন্তু অন্যদের পোশাক হাটু পর্যন্ত পৌছুত না। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে তারা হাওয়াদি কাইয়া[৪০] পরতেন। তা দিয়ে তার মস্তক আবৃত করতেন[৪১]।

ইয়েমেনের আলখিল্লাহর মতো এক ধরনের পোশাকের নাম ছিল আল খানাফ। মোটা ও নিম্নমানের লিনের কাপড় দিয়ে তা তৈরী করা হতো।[৪২] অনেক সময় তারা এই পোশাক পরে বাইরে আসতে লজ্জাবোধ করতেন, কারণ এতে তাদের শরীর ঠিকমত আবৃত হতো না।[৪৩] তাদের পোশাক সহজে ময়লা হয়ে যেত কারণ সুফফাহ খোলা থাকায় তা বাতাস ও ধুলাবালিতে পূর্ণ থাকতো।

www.pathagar.com

এমনকি শরীর থেকে নিঃসৃত ঘামও তাদের ত্বককে ময়লা ও ধুলামলিন করে তুলতো।[৪৪]

আহল আল সুফফাহর খাবার

তাদের প্রধান খাদ্য ছিল খেজুর। রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রতিদিন দুজনকে নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুর প্রদান করতেন। তারা খেজুরের ব্যাপারে অনুযোগ করে বলতেন যে এতে তাদের পেট ব্যথা করে, কিন্তু আল্লাহর রাসূল তাদেরকে এছাড়া অন্য কোন খাবার দিতে পারতেন না। তিনি তাদেরকে সবর করার উপদেশ প্রদান এবং সান্ত্বনা দিতেন।[৪৫] রাসুলুল্লাহ প্রায়ই আল সুফফাহগণকে তার বাড়ীতে দাওয়াত দিতেন কারণ তিনি নিজের ও পরিবারের জন্য বেশী অর্থ ব্যয় করতে পারতেন না। তিনি তাদেরকে কখনো দুধ পান করাতেন, আবার কখনো জাশিশাহ (ময়দার সাথে গোশ্ত বা খেজুর মিশ্রিত এক ধরনের রান্না করা খাবার) খেতে দিতেন।

একবার তাদেরকে হিসাহ (খেজুর, ময়দা ও পরিশোধিত মাখনের তৈরী খাবার) পরিবেশন এবং অন্য এক সময় তাদেরকে শারিদ (রুটি, গোশ্ত ও সবজী দিয়ে তৈরী সূপ)[৪৬] পরিবেশন করেন। খাবার ভাল না হলে তিনি তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতেন। একদিন তিনি তাদেরকে বার্লির তৈরী এক খাঁজাখী ভরা খাবার দিয়ে বললেন, "যার হাতে মুহাম্মদের জীবন তার শপথ! তোমরা যে খাবার দেখতে পাচ্ছো আজ রাতে মুহাম্মদের পরিবারের কাছে শুধু এই খাবার টুকুই আছে।"[৪৭]

একথ্যা সত্য যে কোন ধনী সাহাবী তার বাড়ীতে দাওয়াত করলে আহল আল সুফফাহ উৎকৃষ্ট খাবার খেতে পারতেন। প্রায়ই এ ধরনের দাওয়াত আসতো।[৪৮] কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তারা জীবন ধারনের প্রয়োজনীয় খাবার পেতেন না। তাদের উপর এই অবস্থায় মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হতো। তারা প্রায়ই নামাজের সময় অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। এ কারণে আরব বেদুইনরা মনে করতো যে এরা পাগল। আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রায়ই ক্ষুধার কারণে মিম্বার ও আয়েশার (রাঃ) কক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে অজ্ঞান হয়ে পড়তেন।[৪৯] কিন্তু খাদ্যের এই তীব্র অভাব তাদেরকে মোটেই লোভী করতে পারেননি। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্বে অধিকার ও কর্তব্যের আলোকে পরিচালিত হতেন। আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন, "তারা একসাথে বসে খেজুর খেতেন, কেউ সেসময় একসঙ্গে দুটি খেজুর খেলে তিনি

www.pathagar.com

সঙ্গে সঙ্গে বলতেন ঃ আমি একসাথে দুটি খেজুর খেয়েছি। আপনারাও অনুরূপ খান। কারণ তিনি তার সঙ্গীদের চেয়ে বেশী খেতে চাননি।[৫০]

তারা অল্প খাবার ও মোটা কাপড়ে তুষ্ট ছিলেন। তারা এবাদত, ইলম ও জিহাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন এবং এইজন্য বিলাসী জীবনকে তারা প্রত্যাখ্যান করেন। তারা কঠোরতম সাধনার জীবনযাপন এবং দুনিয়াবী বিষয়ে নির্লিপ্ততার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

রাসূলুল্লাহ ও সাহাবীগণ আহল আল সুফফাহর প্রতি কিরূপ যত্ন নিতেন

রাসূলুল্লাহ (সা.) সবসময় আহল আল সুফফাহর দেখাশোনা করতেন। তারা কেমন তা দেখার জন্য তিনি তাদের কাছে যেতেন এবং কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দেখতে যেতেন।[৫১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের মাঝখানে যেয়ে বসতেন। তিনি তাদেরকে নসিহত করতেন ও সান্ত্বনা দিতেন, বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতেন, নৈতিক দিক তুলে ধরতেন, কোরআন তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন, আল্লাহর জিকির ও আখিরাতের কথা স্মরণ করার নির্দেশনা দিতেন এবং দুনিয়া ও দুনিয়ার জীবনের আনন্দ উল্লাস বর্জনে উৎসাহ প্রদান করতেন।[৫২]

রাসূলুল্লাহর কাছে কখনো কোন সদকা এলে তিনি নিজের জন্য কিছুই না রেখে পুরোটাই আহল আল সুফফাহর জন্য পাঠিয়ে দিতেন। তিনি কোন হাদিয়া পেলে তাও তাদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন এবং তাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে খেতেন।[৫৩] তিনি প্রায়ই তাঁর কোন পত্নীর কক্ষে তাদেরকে খাবার দাওয়াত দিতেন।[৫৪] তিনি কখনো তাদেরকে অবহেলা করেননি এবং সবসময় তাদের কথা স্মরণ রাখতেন। হাসান (রাঃ) জন্মগ্রহণ করার পর তিনি শিশুর চুলের সমপরিমাণ রৌপ্য আহল আল সুফফাহকে সদকা হিসেবে দেয়ার জন্য কন্যা ফাতিমাকে বলেন।[৫৫]

একবার কিছু যুদ্ধবন্দী রাসূলের কাছে আনা হলো। একজন বন্দীকে চাকর হিসেবে দেয়ার জন্য ফাতিমা (রাঃ) অনুরোধ জানালেন কারণ কাজ করতে করতে তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি উত্তরে তাকে বললেন, "আমি তোমাকে একজন চাকর প্রদান করে আহল আল সুফফাহকে কি অভুক্ত রাখবো?" তিনি তাকে বুঝিয়ে বললেন যে তিনি বন্দীদের বিক্রি করে সেই অর্থ আহল আল

www.pathagar.com

সুফফাহর জন্য ব্যয় করবেন। মনে হয়, ফাতিমা অর্থ দেয়ার জন্যও রাসূলকে অনুরোধ করেছিলেন।

রাসূল এর আগেই আলী (রাঃ) এর ওখানে যান এবং দেখতে পান যে, তাদের কম্বলখানা খুবই ছোট এবং তাতে তাদের শরীর ঢাকতো না। তৎসত্ত্বেও তিনি তাদেরকে আমল করার জন্য কয়েকটি দোয়া শিখিয়ে দেন এবং তাদের পরিবর্তে আহল আল সুফফাহকে দেওয়াকে বেহেতর মনে করেন। তিনি বললেন, আহল আল সুফফাহকে অভুক্ত রেখে আমি তোমাদেরকে কিছু দিতে পারবো না।"[৫৬]

রাসুলুল্লাহ আহল অল সুফফাহকে সদকা দেয়ার ব্যাপারে সাহাবীদেরকে উৎসাহিত করতেন।[৫৭] তাই তারা সামর্থ্য অনুযায়ী সবধরনের ভাল জিনিস তাদের প্রদান করতে শুরু করেন।[৫৮] কুরাইশদের মধ্যকার ধনী মুসলমানরা তাদের জন্য খাবার পাঠাতেন।[৫৯] রাসুলুল্লাহ এশার নামাজের পর আহল আল সুফফাহকে সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন যাতে তারা তাদের সঙ্গে রাতের খাবার গ্রহণের সুযোগ পান। তিনি বলতেন ঃ "যার কাছে দুজনের পরিমাণ খাবার আছে সে তৃতীয় একজনকে এবং যার কাছে চারজনের পরিমাণ খাবার আছে সে পঞ্চম বা ষষ্ঠ জনকেও সঙ্গে নিয়ে খাবে।"[৬০] এভাবে সাহাবীগণ তাদের অনেককে নিজ বাড়ীতে নিয়ে যেতেন এবং তিনি তাদের সাথে একত্রে বসে আহার করতেন।[৬১]

হিজরতের শুরুতে এই পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু আল্লাহ যখন মুসলমানদের ধনসম্পদ প্রদান করেন তখন থেকে আহল আল সুফফাহকে সাহাবীগণের মধ্যে বন্টন করার আর প্রয়োজন হয়নি।

আল কুরা (কোরআন তেলাওয়াত কারী) বলে অভিহিত ৭০ জন আনসার আহল আল সুফফাহর অবস্থার সঙ্গে নিজেদের জড়িত করেন (এই ৭০ জন বির মাউনার শহীদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন)[৬২] তারা রাতে কোরআন তেলওয়াত ও অধ্যয়ন করতেন আর দিনে মসজিদে পানি বয়ে আনতেন, কাঠ কাটতেন ও তা বিক্রি করতেন, এথেকে যে টাকা পেতেন তা দিয়ে তারা খাবার কিনে আহল আল সুফফাহ ও গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। মুহাম্মদ ইবনে সালমা ও অপর কয়েকজন আনসার রাসূলুল্লাহর কাছে প্রস্তাব দিলেন যে, খেজুর পাকার পর তারা আহল আল সুফফাহ ও গরীবদের জন্য এক কাঁধি করে খেজুর সদকা হিসেবে দান করতে চান এবং রাসূল তাতে সম্মতি প্রদান করেন। তিনি মসজিদে দুটি স্তম্ভের

www.pathagar.com

মাঝে একটি রশি টাঙ্গিয়ে দেন এবং লোকেরা তাতে খেজুরের কাঁধি ঝুলিয়ে দিতে শুরু করেন। অনেক সময় এই রশিতে একসাথে ২০ টি বা তার চেয়ে বেশী খেজুরের কাঁধি ঝুলতে দেখে গেছে।

মু'রাঁজ ইবনে জাবাল খেজুরের কাঁধিগুলো পাহারা দিতেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে রাসূল (সা.) লোকদের তাদের বাগানের কিছু ফল সদকা হিসেবে দান করতে বলেন যাতে আল্লাহ তাদের ফসলকে রোগবালাই থেকে মুক্ত রাখেন এবং লোকেরা তদানুযায়ী কাজ করেন।[৬৩]

রাসূল (সা.) নিম্নমানের এক কাঁধি খেজুর ঝুলিয়ে দেয়ার জন্য এক ব্যক্তিকে তিরস্কার করেন। সদকার দ্রব্য উত্তম হোক এটাই তিনি চাইতেন।[৬৪] সামহুদীর এক বর্ণনায় আভাস পাওয়া গেছে যে মদীনায় মসজিদে নববীতে খেজুরের কাঁধি ঝুলিয়ে দেয়ার রীতি কমপক্ষে দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।[৬৫] নিম্নের আয়াতখানি আহল আল সুফফাহ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয় বলে বলা হয়েছে ঃ

"যদি আল্লাহ তার সকল বান্দাহকে প্রচুর রিজিক দিতেন তবে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো। কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ নাজিল করেন। নিশ্চয় তিনি তার বান্দাদের খবর রাখেন এবং সবকিছুই দেখেন" (আল শু'রা ৪২ঃ২৭)।

আল তারাবী ও আবু নূয়াইম আমর ইবনে হারিস ও অন্যান্য সনদসহ বর্ণনা করেন যে, এই আয়াত আহল আল সুফফাহ সম্পর্কে নাজিল হয়েছিল। কিন্তু এই আয়াত মক্কাতে অবতীর্ণ হয়, এটি তাদের সম্পর্কে নাজিল হওয়া সম্ভব নয়।[৬৬]

"খয়রাত ঐসকল গরীব লোকের জন্য যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে, জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘুরাফেরা করতে সক্ষম নয়। অজ্ঞ লোকেরা যাচনা না করার কারণে তাদেরকে অভাব মুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায়না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই পরিজ্ঞাত" (আল বাকারা ২ঃ৭৩)।

ইবনে সা'দ ইবনে কাব আল কুরাজীর সনদসহ বর্ণনা করেন, "তারা হলেন আহল আল সুফফাহ।"[৬৭] আল তাবারী মুজাহিদ ও আল সাদীর সনদের উল্লেখ করে বর্ণনা করেন যে গরীব মুহাজিরদের সম্পর্কে এই আয়াত নাজিল হয়েছে।[৬৮]

www.pathagar.com

"আর তাদেরকে বিতারিত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পালন কর্তার এবাদত করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে...." (আল আনাম ৬ঃ৫২)।

ইবনে কাসির উল্লেখ করেন যে, এই আয়াত মক্কায় নাজীল হয়েছে এবং আহল আল সুফফাহ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়নি।[৬৯] আল তাবারীর কয়েকটি বর্ণনায় এই অভিমত সমর্থিত হয়েছে।[৭০]

"আর আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় স্বীয় পালনকর্তার এবাদত করে তার সন্তুষ্টি কামনা করে..."(আল কাহাফ ১৮ঃ২৮)।

এই আয়াত মক্কায় নাজিল হয় এবং আহল আল সুফফাহ সম্পর্কে তা অবতীর্ণ হয়নি।

"অনুরূপভাবে তাদের সম্পর্কে আপত্তি করার কিছুই নেই যারা নিজেরা এসে আপনার নিকট যানবাহনের ব্যবস্থা করার আবেদন করেছিল, আর আপনি বললেন, আমি তোমাদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করতে পারিনা, ফলে তারা বাধ্য হয়ে ফিরে গেল। আর অবস্থা ছিল এই যে, তাদের চক্ষু হতে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল..." (আল তাওবা ৯ঃ৯২)।

আবু নূয়াইম উল্লেখ করেন যে, এই আয়াত আহল আল সুফফাহ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।[৭১] অধিকাংশ রেওয়াতে বলা হয়েছে যে, বনু মাজিনার ক্রন্দনরত সাত ব্যক্তির সম্পর্কে এই আয়াত নাজিল হয়েছে তবে আল তাবারী ও ইবনে কাসিরের বিবরণে এবিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি।

আহল আল সুফফাহ সম্পর্কে রচিয়তা ঐতিহাসিকগণ

আহল আল সুফফাহ সম্পর্কে প্রাচীনতম বিশেষজ্ঞ গ্রন্থ রচয়িতাদের অন্যতম হলেন মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (২৩০ হিঃ)। তিনি আল ওয়াকিদীর গ্রন্থ থেকে সবকিছু উল্লেখ করেন কিন্তু আমরা মাগাজী আল ওয়াকিদীতে এসব দেখতে পাইনি। সম্ভবত তার অন্য গ্রন্থ আল তাবাকাত থেকে তা নেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটি হারিয়ে গেছে।[৭২] ইবনে সা'দ আল তাবাকাত আল কুবরায় তার রচনা থেকে বিপুল বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন।[৭৩]

প্রাচীনতম বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে যারা আহল আল সুফফাহ সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন আমি তাদের মধ্যে কেবলমাত্র আবু আব্দুর রহমান মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন আল সালামী নিসাপুরী (৪১২ হিঃ) এর নাম জানতে পেরেছি। তার

www.pathagar.com

গ্রন্থটির নাম ছিল তারিখ আহল আল সুফফাহ।[৭৪] গ্রন্থখানি হারিয়ে গেছে। আবু নূয়াইম সম্ভবত এই গ্রন্থের সূত্র থেকে তার আল হিলাইয়া গ্রন্থের আহল আল সুফফাহ সংক্রান্ত হিলাইয়া আল আওলিয়া অধ্যায়টি রচনা করেন। তিনি সূত্রের নাম উল্লেখ করেননি তবে তার গ্রন্থের অন্য এক জায়গায় তিনি বলেছেন যে, আরেকটি গ্রন্থ থেকে তিনি এই বিবরণ প্রদান করেছেন।[৭৫] আবু নূয়াইম বলেন যে, বর্ণনাক্রমিকভাবে এই বর্ণনায় আহল আল কিবলা বলে পরিচিত একদল লোকের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এই লোকেরা আহল আল সুফফাহর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। এটি ছিল কোন কোন বর্ণনাকারীর একটা অসাবধানতাবশত ভুল।[৭৬]

এর পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে তকি আলদ্বীন আল সুবকী (৮৫৬ হিঃ) আহল আল সুফফাহ সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তার গ্রন্থের নাম তুহফা ফি আল কালাম আ'লা আহল আল সুফফাহ।[৭৭] (আহল আল সুফফাহর রত্নরাজি)। আল সামহুদী ও আহল আল সুফফাহ সম্পর্কে একখানি কিতাব রচনা করেন যাতে তিনি হাদিস শরীফ, ইতিহাস ও ভূগোল এবং অভিধান সমূহে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এই সম্পর্কিত বিভিন্ন বিবরণকে একত্রে গ্রন্থিত করেছেন।

সারাক্ষণ নামাজ ও রোজার মধ্যে নিয়োজিত থেকে কঠোর দুঃখকষ্ট ও সাধনার জীবন অতিবাহিতকারী আহল আল সুফফাহ মহান আল্লাহর অপার রহমতে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তাই আল্লাহ তায়ালা যথার্থই এরশাদ করেছেনঃ

"তাদের আত্মমর্যদাবোধ দেখে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে স্বচ্ছল বলে মনে করে। তাদের চেহারা দেখেই তুমি তাদের ভিতরের অবস্থা জানতে পারো। মানুষের পিছনে লেগে থেকে কিছু চাইবে, এমন লোক তারা নয়..." (আল বাকারা ২ঃ২৭৩)।

এই উদাহরণ অনৈসলামী সমাজের গরীবদের কর্মকান্ড থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তারা দুষ্কৃতি দল গঠন করে চুরি-ডাকাতি, খুন-রাহাজানি ও অন্যান্য অপরাধ সংঘটিত করে সমাজকে অস্থিতিশীল ও নিরাপত্তাহীন করে তোলে। এখানেই শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর শিক্ষা ও জাহেলিয়াতের শিক্ষা এবং আল্লাহর বিধান ও মানুষের তৈরী বিধানের মধ্যে পার্থক্য নিহিত।

www.pathagar.com

পরবর্তী অধ্যায়ে আমি মদীনার সমাজে ইসলামের প্রতিষ্ঠিত গভীর সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনের বিষয় আলোচনা করবো। এখানে ইসলামী সমাজ সর্বোত্তমভাবে বিকশিত হয়ে নিরংকুশ পরিপূর্ণতা অর্জন করেছিল। এ থেকে আমরা স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারবো যে, ইসলামী সমাজে কোন শ্রেণী দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি এবং কেন ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইসলামের সুমহান আদর্শ বাস্তবায়নের সাহায্য করেছেন। এ ছিল মুমিনদের ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার অনুপম নিদর্শন। মদীনার সনদ ঘোষণায় এ বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. ইবনে সা'দ, তাবাকাত, ১/২৫৫।

২. আল তাবারী, তাফসির, ৫/২৯১। (মাহমুদ মোহাম্মদ শাকির সম্পাদিত)।

৩. খলিফা (আল তারিখ, ১/২৩) অন্যান্য রেওয়াতে উদ্ধৃত করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে হিজরতের ১০, ১৭ বা ১৯ মাস অথবা দু'বছর পরে সুফফাহ স্থাপন করা হয়। সহীহ আল বুখারী শরীফে (কিতাব আল সালাহঃ বাব আল তাওয়াজ্জুহ নাহউ আল কিবলা) বর্ণিত হয়েছে যে ১৬ অথবা ১৮ মাস পরে এই ঘটনা ঘটেছিল।

৪. আল সামহুদী, ওয়াফা, ১/৩২১। ইয়াকুত, মুজাম আল বুলদান (ভৌগলিক সূচি)। ইবনে মঞ্জুরের লিসান আল আরব-এর "সাফফাফা" অধ্যায়ে "জিল্লাহ"-এর উল্লেখ রয়েছে। মসজিদে নববীর সুফফাহ বর্ণনাতে "সুফফাহ" শব্দটি সীমাবদ্ধ নয়, এ বিষয়টি লক্ষণীয়। প্রাচীন কাল থেকে কোন আবৃত স্থানের বর্ণনার জন্য শব্দটি প্রয়োগ করা হচ্ছিলো। মদীনায় মসজিদে নববীতে "সুফফাহ আল নিসা" (মেয়েদের সুফফাহ) ছিল। (আল নাসাঈ, সুনান, ৮/৭৭; আবু দাউদ, সুনান, ২/৪৪৮); মক্কায় ছিল সুফফাহ জমজম (সহীহ বুখারী, ২/৪৪; আল নাসাঈ, সুনান ৩/১৩৫)। লোকদের বাড়ীতে চাল দিয়ে নির্মিত ফাকা স্থানকেও সুফফাহ বলা হয় (সহীহ বুখারী, ১/২১৫)।

৫. বেকেন্দর্ফ, দায়রাত আল মারিফ আল ইসলামিয়া (এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইসলাম, পৃষ্ঠা, ১০৫।

৬. সহীহ মুসলিম, কিতাব আল নিকাহ, হাদীস নং ৯৪।

৭. আবু দাউদ, আল সুনান, কিতাব আর হুরুফ, ২/৩২৯।

৮. সহীহ আল বুখারী, বাব আল সালাহ, বাব নাউম আল রিজাল ফি আল মাসাজিদ; ইবনে মাজাহ, আল সুনানঃ কিতাব আল সায়েদ, বাব আল দাব।

৯. আহমদ, মুসনাদ, ৩/৪৮৭; আবু নুয়াইম, আল হিলাইয়া, ১/৩৩৯/৩৭৪; আল মাসহুদী, ওয়াফা, ১/৩২৩। আরিফ অর্থ নেতা, গোত্রপতি অথবা দলের সরদার।

১০. আবু নুয়াইম, আল হিলাইয়া, ১/৩৭৬।

www.pathagar.com

১১. ইবনে আবু হাতিম, ৩/ফি/১০০০। আরও দেখুন, সাঈদ মাক্কী আল আনী, দিওয়ান কা'ব ইবনে মালিক আল আনসারী, ৭৭, এখানে তিনি তাদের মধ্যে কোনরূপ সম্পর্ক থাকার কথা অস্বীকার করেছেন কারণ কা'ব ছিলেন একজন আনসার এবং আহল আল সুফফাহগণ ছিলেন গরীব মুহাজির। তবে মদীনায় নিজস্ব বাড়ী থাকা সত্ত্বেও তিনি সম্ভবত দারিদ্র্য ও জুহদের জীবন যাপনের জন্য তাদের সঙ্গে বসবাস করাকে অধিকতর পছন্দ করেছিলেন। ইবনে নুয়াইম তার আল হিলাইয়া (১/৩৫৫, ৩৬৫) গ্রন্থে আহল আল সুফফাহর অন্তর্ভুক্ত কয়েকজন আনসারের নাম উল্লেখ করেছেন।

১২. আহমদ, আল মসনাদ, ৬/৩৯১; আবু নুয়াইম, আল হিলাইয়া, ১/৩৩৯; ইবনে মনজুর, লিসান আল আরব, (ওয়াফাদা)

১৩. আবু নুয়াইম, আল হিলাইয়া, ১/৩৩৯,৩৪১।

১৪. প্রাগুক্ত, ১/৩৪১।

১৫. আল সামহুদী, ওয়াফা, ১/৩২১।

১৬. হাজী খলিফা, কাশফ আল জুনুন (বিভ্রান্তর অপলোদন), ১/১২৬; ইবনে হাজর, আল ইসাবাহ, ১/২০১ (যাকে বলা হয় আহসাব আল সুফফাহ) ৬/৫০০।

১৭. সহীহ আল বুখারী, কিতাব আল বুউ, ১ম অধ্যায়; ইবন সা'দ, আল তাবাকাত, ১/২৫৬; ইবনে সাঈদ আল নাস, আইয়ুন আল আসর, ২/৩১৭; ইবনে হাজর, আল ইসাবাহ, জীবনী নং ৫৫৩৫।

১৮. ইবনে সাঈদ আল নাস, আইয়ুন আল আসর, ২/৩১৭; ইবনে সা'দ, আল তাবাকাত, ১/২৫৬।

১৯. ইবনে সাঈদ আল নাস, আইয়ুন আল আসর, ২/৩১৭।

২০. ইবনে সা'দ, আল তাবাকাত ১/১২৬; ইবনে সাঈদ আননাস, আইয়ুন আল আসর, ২/৩১৭; ইবনে হাজর, আল ইসবাহ জীবনী নং ৪৩০০।

২১. ইবনে আবু হাতিম, আল জারহ ওয়া আল তাদিল, ৩/২/১৬০০

২২. আবু দাউদ, আল সুনুন, কিতাব আল হাম্মাম, বাব নাহি আন আল তারী, ১/৩৬৩; আহমদ, আল মসনাদ, ৩/৪৭৮।

২৩. আবু নুয়াইম বলেন ঃ "আহল আল সুফফাহর সঙ্গে তার অবস্থান করা সম্পর্কে কোন সহীহ রেওয়ায়েত আমার জানা নেই তবে তিনি তাদের সঙ্গে থাকার কথা অস্বীকার করেননি"। আল হিলাইয়া, ১/৩৫৬।

২৪. আল সিরাহ, হাদীস নং ৭৯; ইবনে হাজর, আল ইসাবাহ, জীবনী নং ৫৫০৫।

২৫. প্রাগুক্ত, জীবনী নং ৬৯১৩।

২৬. প্রাগুক্ত, জীবনী নং ৫১৯০।

২৭. প্রাগুক্ত জীবনী নং ৪৪৬৩।

২৮. এই ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন, নুয়াইমের আল হিলাইয়া, ১/৩২৩, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৭১, ৩৫৬।

www.pathagar.com

২৯. আবু দাউদ, আল সুনান, ২/২৩৭; ইবনে মাজাহ, আল সুনান,২/৭৩০।

৩০. এই ব্যক্তিদের সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন, আল হিলাইয়া, ১/৩২৩, ৩৬৭, ৩৭১, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৭১, ৩৬৫।

৩১. প্রাগুক্ত, ১/৩৭৫।

৩২. প্রাগুক্ত, ১/৩৫৩,৩৫৫।

৩৩. প্রাগুক্ত, ১/৩৫২।

৩৪. প্রাগুক্ত, ১/৩৬৫।

৩৫. প্রাগুক্ত, ১/৩৬৭,৩৭০।

৩৬. ইবনে সা'দ, আল তাবাকাত, ১/২৫৫; আবু নূয়াইম, আল হিলাইয়া, ১/৩৭৭; ইবনে সাঈদ আল নাস, আইয়ুন আল আসর, ২/২১৭।

৩৭. আবু নূয়াইম, আল হিলাইয়া, ১/৩৪১।

৩৮. প্রাগুক্ত, ১/৩৭৭।

৩৯. সহীহ আল বুখারী, ১/১১৪; ইবনে সা'দ, আল তাবাকাত, ১/২৫৫।

৪০. আহমদ, মুসনাদ, ৪/১২৮।

৪১. ইবনে মনজুর, লিসান আল আরব, 'হাতাকা'।

৪২. আহমদ, মসনাদ, ৩/৪৮৭; আবু নূয়াইম, আল হিলাইয়া, ১/৩৭৪; আল সামহুদী, ওয়াফা ১/৩২৩।

৪৩. আল হিলাইয়া, ১/৩৪২।

৪৪. প্রাগুক্ত, ১/৩৪১।

৪৫. আহমদ, মুসনাদ, ৩/৪৮৭; আবু নূয়াইম, আল হিলাইয়া, ১/৩৫৯, ৩৭৪; আল সামহুদী, ওয়াফা, ১/৩২৩।

৪৬. সহীহ আল বুখারী, ৮/৬৮, ১১৯; আহমদ, মসনাদ, ২/৫১৫, ৩/৪৯০; ইবনে সা'দ, আল তাবাকাত, ১/২৫৬; আবু নূয়াইম, আল হিলাইয়া, ১/৩৭৩-৩৭৪; আল সামহুদী, ওয়াফা, ১/৩২৩।

৪৭. ইবনে সা'দ, আল তাবাকাত, ১/২৫৬।

৪৮. সহীত আল বুখারী, কিতাব আল মাওয়াকিত বাব আল সামার, মা'আল দায়িফ ওয়া আল আহল ; আবু নূয়াইম, আল হিলাইয়া, ১/৩৪১।

৪৯. আবু নূয়াইম, আল হিলাইয়া, ১/৩৩৯-৩৭৮।

৫০. প্রাগুক্ত, ১/৩৩৯-৩৪০।

৫১. প্রাগুক্ত, ১/৩৭৫।

৫২. আহমদ, আল মুসনাদ, ৪/৮; আবু নূয়াইম, আল হিলাইয়া, ১/৩৪০-৩৪১; আল মাসহুদী, ওয়াফা, ১/৩২২।

৫৩. সহীহ আল বুখারী, কিতাব আল রিকাক, অধ্যায় ১৪; আহমদ, আল মুসনাদ, ২/৫১৫;

www.pathagar.com

আবু নূয়াইম, আল হিলাইয়া, ১/৩৭৭,৩৩৭; আল সামহুদী, ওয়াফ, ১/৩২২।

৫৪. সহীহ আল বুখারী, কিতাব আল রিকাক, অধ্যায় ১৪ ও কিতাব আল ইস্তিজান, অধ্যায় ১৪; আহমদ, আল মুসনাদ, ২/৫১৫, ৩/৪২৯, ৪৯০; ইবনে মাজাহ, সুনান; কিতাব আল মসজিদ ওয়া আল জামায়াত; বার আল নাউম ফি আল মসজিদ; আবু নূয়াইম, আল হিলাইয়া, ১৩৩৮-৯; আল মাসহুদী, ওয়াফা, ৩২২-৩।

৫৫. আল বায়হাকী, সুনান, ৯/৩০৪।

৫৬. আহমদ, আল মুসনাদ, ১/৭৯,১০৬।

৫৭. আবু নূয়াইম, আল হিলাইয়া, ১/৩৪০।

৫৮. প্রাগুক্ত, ১/৩৪০।

৫৯. প্রাগুক্ত, ১/৩৭৮।

৬০. সহীহ আল বুখারী, কিতাব আল মাওয়াকিত, বাব আল সামার মা আল দায়ফ ওয়া আলি আহল।

৬১. প্রাগুক্ত; ইবনে সা'দ, আল তাবাকাত, ১/২৫৫; আবু নূয়াইম, আল হিলাইয়া, ১/৩৩৮; ৩৪১, ৩৭৩।

৬২. সহীহ মুসলিম, কিতাব আল ইমারা, হাদীস নং ১৪৭; আহমদ আল মুসনদ, ৩/২৭০; ইবনে সা'দ, আল তাবাকাত, ৩/৫১৪।

৬৩. আল সামহুদী, ওয়াফা, ১/৩২৪-৫।

৬৪. প্রাগুক্ত, ১/৩২৫।

৬৫. প্রাগুক্ত, ১/৩২৪।

৬৬. আল তাবারী, তাফসির, ২৫/৩৩; আবু নূয়াইম, আল হিলাইয়া, ১/৩৩৩।

৬৭. ইবনে সা'দ, আল তাবাকাত, ১/২৫৫।

৬৮. আল তাবারী, তাফসির, ১১ /৩৭৬।

৬৯. ইবনে কাসির, তাফসির আল কোরআন আল আযীম, ২/১৩৫।

৭০. আল তাবারী, তাফসির, ১১/৩৭৬।

৭১. আল হিলাইয়া, ১/৩৭১-২।

৭২. আকরাম আল উমরী, বুহুস ফি তারিখ আল সুন্নাহ আল মুশাররা, ৫৩।

৭৩. প্রাগুক্ত, ৫৬।

৭৪. হাজী খলিফা, কাশফ আল জুনন, ১/২৮৭; কিন্তু তিনি একে তারিখে আহল আল সুফফাহ বলেছেন। হয়ত নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। (দেখন নকল দীন শরিবাহ-এর সালামার তাবাকাত আল সুফিয়াহর ভূমিকা, ১/৩৪)।

৭৫. আবু নূয়াইম, আল হিলাইয়া, ৩/২৫।

৭৬. প্রাগুক্ত, ১/৩৪৭।

৭৭. রেকেন্দ, দায়রাত আল মা'রিফ আল ইসলামিয়াহ, ১০৬।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

মদীনার সনদ

ইহুদীদের সঙ্গে চুক্তি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার সকল অধিবাসীদের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং একটি দলিলে এ বিষয়টি লিপিবদ্ধ করান যা বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রে উল্লিখিত হয়েছে। এই দলিলের লক্ষ্য ছিল মদীনার সীমার মধ্যে বসবাসকারী সকল গোত্র ও দলের ওয়াদা ব্যাখ্যা প্রদান এবং তাদের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ। প্রাচীন সূত্রে এই দলিলকে আল কিতাব (গ্রন্থ) বা আল সহীফা (পুস্তিকা) বলা হয়েছে। আর আধুনিক গবেষণায় একে আল দুস্তুর (সনদ) বা আল ওয়াসিকা (দলিল) বলে অভিহিত করা হয়েছে।

দলিল বর্ণনার সূত্রসমূহ

সমসাময়িক গবেষকগণ মদীনায় মহানবী (সা.) এর সংস্কার বিষয়ে গবেষণার জন্য এই দলিলকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন।[১] তবে এই দলিলের উপর ভিত্তি করে কোন গবেষণা করার আগেই এটি কতখানি যথার্থ তা নিরূপণ করা খুবই জরুরী, বিশেষতঃ গবেষকদেরই একজন যেখানে মনে করছেন যে দলিলটি জাল।[২]

ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়াও দলিলটি শরয়ী (আইনগত) গুরুত্বের বিষয় বিবেচনা করে এর যথার্থতা ও দুর্বলতা নির্ণয়ের জন্য দলিলটি অবশ্যই হাদীস বিশারদগণের মানদন্ড অনুসারে বিচার করতে হবে। অন্যান্য ঐতিহাসিক বিবরণের মতো এই দলিলকে হাল্কাভাবে বিবেচনা করলে চলবে না। মদীনার সনদ বর্ণনাকারী প্রাচীনতম বিশেষজ্ঞ হলেন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (১৫১ হিঃ)।

তবে তিনি সনদ ব্যতিরেকে এই বিবরণ পেশ করেন।[৩] ইবনে সাঈদ আল নাস[৪] এবং ইবনে কাসির[৫] উভয়েই তাঁর কাছে থেকে এই রেওয়াতে বর্ণনা করার দাবী করেছেন। তারাও সনদ ছাড়া তা বর্ণনা করেন। আল বায়হাকী[৬] তার দলিলে ইবনে ইসহাকের সনদের উল্লেখ করেন যাতে ইহুদীদের সঙ্গে চুক্তির ধারাগুলো

www.pathagar.com

ব্যতীত কেবলমাত্র মুহাজির ও আনসারদের মধ্যকার সম্পর্কের দিকটি বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে তিনি একই সূত্র থেকে এটি গ্রহণ করেছিলেন কি-না সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি। ইবনে সাঈদ আল নাস বর্ণনা করেন যে ইবনে আবু খায়সামা[৭] নিম্নে বর্ণিত সনদসহ দলিলটি বর্ণনা করেনঃ "আহমদ ইবনে খাব্বাব আবু আল ওয়ালিদ বর্ণনা করেছেন, ঈসা ইবনে ইউসুফ তার পিতা ও দাদার কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে একটি লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন যা অবিকল ইবনে ইসহাকের বর্ণিত দলিলের অনুরূপ।[৮] দৃশ্যতঃ তারিখ ইবনে আবু খায়সামা এর যে খণ্ডে এই বর্ণনা ছিল সেটি এখন হারিয়ে গেছে। আমরা আর এই গ্রন্থের যেসব খণ্ড পেয়েছি তাতে এ বিষয়টি নেই। আবু উবায়েদ আল কাসিম ইবনে সালাম এর গ্রন্থ কিতাব আল আমওয়ালেও দলিলটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি অন্য এক সনদসহ তা বর্ণনা করেন। এতে বলা হয়েছেঃ ইয়াহিয়া আব্দুল্লাহ বাকির ও আব্দুল্লাহ সালেহ আমার কাছে বর্ণনা করেন যে আল লাইস ইবনে সা'দ জানান যে ইবনে শিহাবের কাছ থেকে উকাইল ইবনে খালিদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমি শুনেছি যে রাসূলুল্লাহ একটি লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেছেন... এবং তিনি তা উল্লেখ করেন।"

ইবনে জানজাওয়াও তার কিতাব আল আমওয়াল-এ জুহরীর বরাত দিয়ে দলিলটি বর্ণনা করেছেন।[৯]

এভাবে দলিলটিতে একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। সব বিবরণই একই ধরনের। কোথায়ও অবশ্য শব্দ বিন্যাস বা উচ্চারণের ক্ষেত্রে অতিসামান্য পার্থক্য দেখা যায় অথবা কোথাও কিছুটা শব্দাধিক্য চোখে পড়ে কিন্তু গ্রন্থ পার্থক্যের কারণে এর মূল বক্তব্যের কোন হেরফের হয়নি।

দলিলটি কতদূর সহীহ

বেশ কয়েকজন আধুনিক গবেষক দলিলটির উপর গবেষণা করেছেন। তাদের মধ্যে একমাত্র অধ্যাপক ইউসুফ আল আইশ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে দলিলটি জাল। তিনি বলেন, "শরয়ী দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ফিকাহ শাস্ত্রের কিতাব ও সহীহ হাদীসের কিতাবসমূহে দলিলটি বর্ণিত হয়নি। উপরন্তু ইবনে ইসহাক সনদ ছাড়াই দলিলটি বর্ণনা করেন এবং ইবনে সাঈদ আল নাস তার কাছে থেকেই তা বর্ণনা করেন।" তিনি আরো বলেন, "কাসির ইবনে আব্দুল্লাহ

www.pathagar.com

ইবনে আমর আল মুজানী তার পিতা ও দাদার কাছ থেকে দলিলটি বর্ণনা করেন। ইবনে হিব্বান আল বুস্তী বর্ণনা করেন, কাসির আল মুজানী তার পিতা ও দাদার কাছ থেকে একটি জাল দলিল বর্ণনা করেছেন, চমক সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া এই দলিলকে কোন কিতাবের অন্তর্ভুক্ত করা অথবা তার থেকে বর্ণনা করা সঙ্গত নয়।"[১০] আল আইশ মনে করেন যে, ইবনে ইসহাক দলিলটি বর্ণনার জন্য ইবনে কাসিরের উপর নির্ভরশীল ছিলেন এবং জ্ঞাতসারে তিনি সনদ এড়িয়ে গেছেন।[১১]

ইবনে ইসহাক ছাড়া অন্য কেউ দলিলটি বর্ণনা করেননি, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অধ্যাপক ইবনে আইশ উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি কাসির আল মুজানীর থেকে ইবনে সাঈদ আল নাস বর্ণিত ইবনে আবু খায়সামার বর্ণনা ছাড়া আর কোন সনদ দেখতে পাননি। কিন্তু আবু উবায়েদ আল কাসিম ইবনে সালাম আল জুহরী থেকে দলিলটি বর্ণনা করেন। এটি ছিল একটি স্বতন্ত্র বর্ণনার ধারা যার সঙ্গে কাসির আল মুজানীর কোন সম্পর্ক ছিল না। বস্তুত ইবনে ইসহাক ছিলেন আল জুহরীর বিশিষ্ট ছাত্রদের অন্যতম, তাই আল জুহরীর থেকে তার দলিলটি বর্ণনা করার সম্ভাবনা রয়েছে তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হচ্ছে ইবনে ইসহাকের সনদে আল বায়হাকীর বর্ণিত দলিলটি। এতে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যকার সম্পর্কের বিবরণ রয়েছে কিন্তু ইহুদীর সঙ্গে চুক্তির ধারাগুলো তাতে স্থান পায়নি। ইবনে ইসহাক ইহুদীদের সঙ্গে চুক্তির ধারাগুলো এই সূত্র বা অন্যকোন সূত্র থেকে গ্রহণ করেছিলেন কিনা সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই। আল বায়হাকী বলেছেন: "উসমান ইবনে মুহাম্মদ আল মুগিরা ইবনে আল আখনাস ইবনে শুরাইক বলেন, আমি উমর ইবনে আল খাত্তাবের পরিবারের কাছ থেকে সনদকার দলিলসহ এই দলিলটি সংগ্রহ করেছি।" এই সনদের হাদীসটি জয়ীফ কারণ সনদের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ কোন কোন দিক থেকে জয়ীফ ছিলেন। যেমন উসমান বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনো কখনো সংশয় সৃষ্টি ও ভুল করেছেন, ইউনুস ইবনে বুকাইর যে ভুল করতেন, তা অজানা ছিল না এবং আল আত্তার ছিলেন দুর্বল প্রকৃতির লোক। দুর্বলতা সত্ত্বেও এই বিবরণকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে এবং বিষয়টিকে যথার্থ বলে স্বীকৃতি দিতে হবে। অধ্যাপক আল আইশ যে বর্ণনার উপর ভিত্তি করে অভিমত ব্যক্ত করেছেন এই দলিলটি তা খন্ডন করে দিয়েছে। হাদীসের জাল বিবেচনা করা সঠিক হবে না। হাদীস গ্রন্থে দলিলটি অনেক ধারা বর্ণিত হয়েছে এই নিবন্ধে তা তুলে ধরা হবে।

www.pathagar.com

অতএব দলিলটিকে জাল বিবেচনা করা যে একটি হঠকারী সিদ্ধান্ত হবে তা এখানে স্পষ্ট হয়ে গেছে। দলিলটি অবশ্য সার্বিক বিবেচনায় সহীহ হাদীসের সমকক্ষ নয়। ইবনে ইসহাক সনদ ছাড়াই তার সীরাত গ্রন্থে দলিলটি বর্ণনা করেছেন যা তার বর্ণনাকে জয়ীফ প্রতিপন্ন করেছে। আল বায়হাকী সনদসহ ইবনে ইসহাকের থেকে দলিলটি বর্ণনা করেন এবং তার সনদের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একমাত্র সা'দ ইবনে আল মুনজির হলেন মকবুল (গ্রহণযোগ্য) ব্যক্তি। ইবনে আবু খায়সামা কাসির ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর আলমুজানীর থেকে এই বিষয়টি বর্ণনা করেন এবং তার বর্ণনায় অনেক ভ্রান্তি রয়েছে। আবু উবায়েদ আল কাসিম ইবনে সালাম একটি মুনকাতি সনদসহ (সংযোগ বিচ্ছিন্ন সহ সনদ) দলিলটি রেওয়ায়েত করেন যা শুধুমাত্র আল জুহুরী পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। আল জুহুরী হচ্ছেন একজন তাবেতাবেয়ী তাই তার মুরসাল হাদীস (রাসূলের থেকে সরাসরি বর্ণনা ধারায় সনদ থেকে সাহাবীর নাম বাদ পড়া প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

তবে এই দলিলের কতিপয় বিষয় হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে। বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে এর অনেক দিক বর্ণিত হয়েছে। এই রেওয়াতেসমূহ সহীহ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত এবং ফাজীগণ একে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে এর ভিত্তিতে রায় প্রদান করেছেন। ইমাম ইবনে আহমদের মুসনাদ এবং আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও তিরমিজির সুনানে এই দলিলের অনেক বিষয় বর্ণিত হয়েছে বর্ণনাকারীদের স্বতন্ত্র বর্ণনাক্রমে দলিলটি আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। সহীহ হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত অংশ ছাড়া দলিলটি সামগ্রিকভাবে শরয়ী সম্পর্কিত বিষয়ে রায় প্রদানের ক্ষেত্রে অকাট্য প্রমাণ হিসেবে পরিগণিত না হলেও বিভিন্ন বর্ণনাকারীর স্বতন্ত্র সূত্রে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়ে সুসংহত দলিলটিকে ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে আইনগত রায়দানের মতো অতি উচ্চ মর্যাদার বিশুদ্ধতা জরুরী নয়। প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) সীরাত রচনাকারী বিশেষজ্ঞবর্গের অন্যতম অগ্রণী ছিলেন মশহুর আলেম আল জুহুরী। সীরাত ও ইতিহাস সংক্রান্ত অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে রাসূলের (সা.) শান্তিচুক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি ছিল লিখিত চুক্তি।[১২] এসব গ্রন্থে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে সম্পাদিত রাসূলের লিখিত চুক্তির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

দলিলটি রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্য এর যথার্থতা প্রতিপন্ন করেছে। এর অনুচ্ছেদগুলো সংক্ষিপ্ত ও সহজ, এতে কোন জটিল বাক্য নেই। চুক্তিটিতে অনেক

www.pathagar.com

পুনরুক্তি রয়েছে এবং এতে রাসূলের সময়ের প্রচলিত সাধারণ শব্দ ও প্রকাশভঙ্গি ব্যবহৃত হয়েছে, যা পরবর্তীতে তেমন ব্যবহৃত হয়নি ফলে যারা ঐ সময় সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেননি তাদের কাছে বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন মনে হয়েছে। এই দলিলে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রশংসা বা নিন্দা স্থান পায়নি। এই প্রেক্ষিতে আমরা একথা বলতে পারি যে, দলিলটি যথার্থ, জাল নয়।[১৩] দলিলটির রচনাশৈলী এবং রাসূলের নির্দেশে লিখিত অন্যান্য বিবরণের মধ্যকার সাদৃশ্যও দলিলটি যথার্থতা প্রতিপন্ন করেছে।

দলিলটির প্রণয়নের তারিখ

মূলতঃ দলিলটির দুটি অংশ থাকার সম্ভাবনা সমধিক। ঐতিহাসিকগণ এই দুটি অংশকে একত্রিত করেছেন। এর একটিতে ইহুদীদের সঙ্গে রাসূলের শান্তি চুক্তির বিষয় এবং অপরটিতে মুহাজির ও আনসার উভয় দলের মুসলমানদের অঙ্গীকার, অধিকার ও কর্তব্য বর্ণিত হয়েছে।

খুব সম্ভব বদরযুদ্ধের আগে ইহুদীদের সঙ্গে শান্তি চুক্তির দলিল লিপিবদ্ধ হয়েছিল[১৪] এবং বদর যুদ্ধের পর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যকার দলিলটি প্রণীত হয়। মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আগমনের পর প্রথমে ইহুদীর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হয় বলে বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। আবু ওবায়েদ আল কাশিম ইবনে সাল্লাম বলেন, "এই দলিলে দু'টি ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছেঃ ইসলাম শক্তিশালী হবার আগে রাসূলের মদীনায় আগমন এবং আহলে কিতাবদের কাছ থেকে জিজিয়া আদায়ের নির্দেশ।"[১৫] বদর যুদ্ধের পর ইসলাম শক্তিশালী হয়। আল বালাদুরী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় আগমন করার পর ইহুদীদের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন এবং তাদের ও তাঁর নিজের একটি দলিল লিপিবদ্ধ করান। তিনি শর্তারোপ করেন যে তারা তাঁর শত্রুদের সাহায্য করতে পারবে না এবং হামলাকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাকে সাহায্য করবে আর তিনিও আহলে আল জিম্মাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের কারোর সঙ্গে যুদ্ধে জড়িত হননি এবং তারাও তাকে প্ররোচিত করেনি। পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কোন মুজাহিদ বাহিনীকে (সারিয়া) অভিযানের জন্য প্রেরণ করেননি।

"যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে, যাদের সঙ্গে কাফেররা যুদ্ধ করে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম" (হজ্জ ২২ঃ৩৯)

www.pathagar.com

তিনি সর্বপ্রথম হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন।[১৬]

এই কারণে আল বালাদুরী বলেছেন যে, প্রথম অভিযান পরিচালনার আগেই ইহুদীরদের সঙ্গে শান্তি চুক্তির লিখিত দলিলটি প্রণীত হয়েছিল। প্রথম হিজরীর রমজান মাসে হামজা (রাঃ) এর নেতৃত্বের এই অভিযান পরিচালিত হয় বলে জানা যায়।[১৭] আল বালাদুরী অন্য এক স্থানে বনু কায়নুকার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গ আলোচনা করে বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় আগমন করার পর সকল ইহুদীর সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন যা একটি দলিলে লিপিবদ্ধ করা হয়। বদর যুদ্ধে জয়লাভের পর অক্ষত অবস্থায় ও বিজয়ীর বেশে মদীনায় রাসূলের প্রত্যাবর্তনের পর ইহুদীরা চুক্তি ভঙ্গ করে দুশমনে পরিণত হয় এবং এই ছিল এই গাজওয়ার কারণ[১৮] এতে আল বালাদুরী নিশ্চিত হয়েছেন যে, বদর যুদ্ধের আগেই ইহুদীদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল।

আল তাবারী বলেছেন ঃ "বদর যুদ্ধ থেকে ফিরে রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় অবস্থান করেন। তিনি মদীনায় আগমনের পরই ইহুদীদের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিলেন যাতে শর্তারোপ করা হয়েছিল যে তারা তাঁর বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করতে পারবে না এবং দুশমনরা মদীনা আক্রমণ করলে তারা তাঁকে সাহায্য করবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) কয়েকজন কুরাইশ মুশরিকদের হত্যা করানোর পর ইহুদীরা তার প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠে ও শত্রুতা করে এবং চুক্তি ভঙ্গ করে।"[১৯] আল তাবারীর বিবরণ রাসূলের মদীনায় আগমনে পরে এবং বদরযুদ্ধে আগে ইহুদীদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের দাবীকে সমর্থন করছে।

আবু দাউদ[২০] তার সুনানে এক রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন, "কাব ইবনে আশরাফের হত্যার ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর এবং ইহুদী ও মুশরিকরা রাসূলের কাছে এব্যাপারে নালিশ করার পর মহানবী (সা.) তাদের ও নিজের মধ্যে একটি চুক্তির দলিল প্রণয়নের জন্য তাদেরকে আমন্ত্রণ জানান যাতে উভয়ের ভবিষ্যত সম্পর্কের বিষয় উল্লেখ থাকবে। এ ভাবে রাসূল তাদের এবং নিজের ও সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন।" একথা অজানা নয় যে কাব ইবনে আশরাফের হত্যার ঘটনা বদর যুদ্ধের পরে ঘটেছিল। সে কারণে আমরা অবশ্যই ঐতিহাসিক বিবরণের সঙ্গে এই ঘটনার একটা সমন্বয়

www.pathagar.com

বিধান করবো। হাদীস বিশারদগণের মানদন্ড অনুযায়ী এই রেয়ায়েত ঐতিহাসিক বিবরণের চেয়ে অনেক শক্তিশালী, সে কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সমন্বয় সাধন সম্ভব ততক্ষণ পর্যন্ত অপরাপর ঐতিহাসিক বিবরণ বর্জন করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যার পর চুক্তিটি সমর্থন ও নবায়নের লক্ষ্যে দলিলটি পুনরায় লেখার সম্ভাবনা রয়েছে। এই ঘটনার পরে ভীত সন্ত্রস্ত ইহুদী ও মুশরিকদের নিরাপত্তাবোধ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তা করা হতে পারে।

আল বায়হাকী বিভিন্ন রেয়ায়েতে ও আবু দাউদ থেকে নিম্নোক্ত বিস্তারিত বিবরণটি পেশ করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) বিনত আল হারিসের বাড়ীতে একটি খেজুর গাছের নীচে বসে দলিলটি লিপিবদ্ধ করান। রাসূলের ওফাতের পর দলিলটি আলী ইবনে আবু তালিবের হেফাজতে ছিল।"[২১]

ইহুদীর সঙ্গে চুক্তির পর দ্বিতীয় হিজরীতে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যকার চুক্তির দলিলটি লিখিত হয়। আল তাবারী দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনাবলীর মধ্যে উল্লেখ্য করেন, "এবছর রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি চুক্তির বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করান বলে জানা গেছে। তাঁর তলোয়ারের উপর এই দলিল খোদিত করা হয়।[২২] জু আল ফিকর (জুলফিক্কার) নামের এই তলোয়ারটি তিনি বদরযুদ্ধের যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে গ্রহণ করেছিলেন।"[২৩]

তলোয়ারের সঙ্গে সংযুক্ত এই মা'কিল হচ্ছে মুহাজির ও আনসার মধ্যকার চুক্তির বিষয়বস্তু। ইবনে সা'দের এক রেয়ায়েতে এসম্পর্কে আভাস দেয়া হয়েছেঃ উবায়দুল্লাহি ইবনে মুসা আমাদেরকে বলেন, আমীর থেকে জাবির ও জাবির থেকে ইসরাইল তাকে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর তলোয়ার জু আল ফিকর-এর খাপে উপর খোদিত লেখা পড়েছি। তাতে লেখা ছিল ঃ "সকল মুসলমান মুক্তিপণ পরিশোধ করবে, ইসলামে কেউ ছিন্নমূল অবস্থায় থাকবে না এবং কোন কাফেরের বদলা হিসেবে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না।"[২৪] পরে আলী (রাঃ) দলিলসহ তলোয়ারটি নিজের কাছে সংরক্ষণ করেন। কোন এক সময় আবু জুহায়ফা[২৫] আলীকে দলিলটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। অন্য এক উপলক্ষে আশ্‌তার তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাস করেন। জবাবে আলী (রাঃ) তাদেরকে এর অর্থ বলেন অথবা তার থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শোনান।[২৬] এছাড়া একবার খুতবার সময়ও তিনি সংক্ষেপে এর বিষয়বস্তু উল্লেখ করেছিলেন।[২৭]

www.pathagar.com

আল্লাহ, ফেরেশতারা ও সকল মানুষের লানতের শিকার হবে এবং তার ফরজ বা নফল কোন এবাদতই কবুল হবে না।"[২৮]

আলী (রাঃ) আরো উল্লেখ করেন যে দলিলের শর্তে যখমের ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিভিন্ন ধরনের (বয়সের) উট দেয়ার ব্যবস্থা ছিল।[২৯] তিনি একসময় আরো বলেনঃ "একজন কাফেরের বদলা হিসেবে একজন মুমিনকে হত্যা করা যাবে না এবং চুক্তি বহাল অবস্থায় চুক্তির আওতাধীন কাউকে হত্যা করা যাবে না।"[৩০] তিনি আরও উল্লেখ করেন যে এতে বলা হয়েছেঃ রক্ত মূল্য ও বান্দীদের জন্য মুক্তিপণ প্রদানের কথাও বলা হয়েছে।[৩১] আলীর সঙ্গীগণ উক্ত দলিল থেকে পাঠ করেনঃ ইব্রাহিম মক্কা শরীফকে পবিত্র করেন আর আমি দুই হাররার (শিলাময় প্রান্তর) মধ্যবর্তী সমগ্র মদীনাকে পবিত্র করেছি। কেউ বনের বৃক্ষ কাটতে অথবা বন্যপ্রাণী শিকার করতে পারবে না। কোন জিনিস পড়ে পাওয়ার পর তার ঘোষণা দেওয়ার ছাড়া নিজের কাছে রাখার কোন অনুমতি নেই। উটের খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া আমরা কোন বৃক্ষ কাটতে পারবো না এবং এখানে কেউ যুদ্ধাস্ত্র বহন করতে পারবে না।"[৩২]

স্পষ্টতঃ অধিকাংশ উদ্ধৃতির সঙ্গে দলিলের বর্ণিত বিষয়ের হুবহু মিল রয়েছে। এসব বিষয়ে দলিলের বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত হয়েছে মুহাজির ও আনসার উভয় শ্রেণীর মুসলমানের পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছে তবে ইহুদীদের সঙ্গে সম্পাদিত শান্তি চুক্তির ধারা সম্পর্কে কোন আভাস এতে পাওয়া যায়নি। এরফলে দু'টি পৃথক চুক্তির সমন্বয়ে দলিলটি প্রণীত হবার সম্ভাবনা গুরুত্ব পেয়েছে এবং রাসূল (সা.) এর তলোয়ারে খোদিত দলিল, যা পরে আলী (রাঃ) এর অধিকারে আসে, বস্তুতঃ তা ছিল মুহাজির ও আনসারদের মধ্যকার চুক্তির দলিল।

একথা বলা যেতে পারে যে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যকার দলিলের সঙ্গে সংশি-ষ্ট আরও কিছু বিষয় রয়েছে তবে তা রাসূল (সা.) কর্তৃক লিখিত অন্যান্য দলিলের অংশ। যেমন আমর ইবনে হাজম বর্ণনা করেন, ইয়েমেনের লোকদের উদ্দেশ্যে রাসূলের এক চিঠিতে নিম্নোক্ত কথা অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ কেউ উপযুক্ত কারণ ছাড়া একজন মুসলমানকে হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত হলে এবং নিহত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন (রক্তমূলে) সন্তুষ্ট না হলে তার কাছ থেকে বদলা গ্রহণ করতে হবে।"[৩৩] দলিলটি রচিত হবার এই চিঠি প্রেরিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

অন্যান্য রেওয়ায়েতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (সা.) ঘোষণা করেনঃ একজন কাফেরের বদলা হিসেবে একজন মুমিনকে হত্যা করা যাবে না।[৩৪] দলিলটি প্রণীত হবার পরে কোন এক সময়ে এই বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ হয়েছিল বলে মনে করা হয়। তবে এই দলিলকে চিঠির একটি সংগ্রহ যা বিভিন্ন সময়ে লেখা হয় এবং পরে দলিলের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় বলে প্রমাণ করা যায়নি।[৩৫] রাসূলুল্লাহ (সা.) তার চিঠিপত্রে দলিলের কোন কোন ধারার উল্লেখ করেননি, এমন অভিমত পোষণ করার কোন কারণ নেই। আমাদেরকে এব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে দুর্গের (মাকিল) দলিলে যে বিষয় নিষ্পত্তি করা হয়েছিল তাতে ইহুদীরদের সঙ্গে সম্পর্কিত (কোন ধারা স্থান পায়নি এবং এতে প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইহুদীদের শান্তি চুক্তি ও দুর্গের বিষয়ে পৃথক দলিল প্রণীত হয়েছিল। আমর ইবনে মালিক বর্ণিত একটি হাদীসে এই অভিমত সমর্থিত হয়েছেঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) আনাস ইবনে মালিকের বাড়ীতে বসে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন করেন।[৩৬] আনাস (রাঃ) এই মৈত্রীজোটে ইহুদীদের উপস্থিত থাকার কথা উল্লেখ করেননি।

আমর ইবনে শোয়াইব বর্ণিত একটি হাদীসেও এই বিষয়টি সমর্থিত হয়েছে। দাদার থেকে পিতা এবং পিতার থেকে তিনি বর্ণনা করেঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে একটি লিখিত দলিল প্রণয়ন করেন। তাতে বলা হয় যে তাদেরকে রক্তমূল্য পরিশোধ, যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির জন্য মুক্তিপণ প্রদান এবং মুসলমানদের মধ্যে শান্তিস্থাপন করতে হবে।[৩৭] এই দলিলে ইহুদীদের কথার উল্লেখ করা হয়নি। বস্তুতঃ বায়হাকী ইবনে ইসহাকের সনদসহ মুহাজির ও আনসারদের মধ্যকার চুক্তির যেসব ধারা চিহ্নিত করেন এই রেয়ায়েতে সম্ভবত তা সমর্থিত হয়েছে। ইবনে ইসহাক থেকে ইবনে হিশামের বর্ণনার অনুরূপ এসব ধারায় ইহুদীদের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়নি।

আমার বাছাইকৃত রেয়ায়েতেসমূহ দু'টি পৃথক চুক্তি হওয়ার বিষয়কে আরও স্পষ্ট করছে। রাসূলের মদীনায় আগমনের পর এবং বদরযুদ্ধের আগে ইহুদীদের সঙ্গে প্রথম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বদরযুদ্ধের পর স্বাক্ষরিত দ্বিতীয় চুক্তিতে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে মিত্রজোট গড়ে তোলা হয়। ঐতিহাসিকগণ এই দু'টি চুক্তিকে একটি দলিলে একত্রে গ্রন্থিত করেছেন।

www.pathagar.com

মুহাজির, আনসার ও ইহুদীদের সঙ্গে রাসূলের (সা.) চুক্তি

চুক্তির বিষয়বস্তু[৩৮]

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ধারা ঃ

১. এটি আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা.) এর পক্ষ থেকে লিখিত ফরমান যা মক্কা থেকে হিজরতকারী কুরাইশ ও ইয়াসরিববাসীগণের মধ্যে যারা ঈমান এনেছেন, যারা এই উভয়পক্ষের অনুবর্তী রয়েছেন এবং যারা ভবিষ্যতে এদের সঙ্গে শরীক হবেন ও এক সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন, তাদের জন্য।

২. তাদের সকলে একটি মিল্লাত বা জাতিসত্ত্বা রূপে (উম্মাহ্) বিবেচিত হবে এবং তাদের বাইরে যারা আছে তারাও অন্য একটি একক জাতিসত্ত্বারূপে বিবেচিত হবে।

৩. কুরাইশ মুহাজিরগণ বর্তমান রীতি অনুযায়ী রক্তমূল্য পরিশোধ এবং তাদের কেউ বন্দী হলে তাদের মুক্ত করার দায়িত্ব সম্মিলিতভাবে গ্রহণ করবে যেন ঈমাদারগণের পারস্পরিক আচরণ ইনসাফ ও ন্যায়ভিত্তিক হয়।

৪. বনী আওয়াফ তাদের বর্তমান রীতি অনুযায়ী পূর্বের ন্যায় সম্মিলিতভাবে রক্তমূল্য পরিশোধ করবে এবং তাদের কেউ বন্দী হলে তাকে মুক্ত করার দায়িত্ব পালন করবে, যেন ঈমানদারদের পারস্পরিক আচরণ সদয় ও ইনসাফ ভিত্তিক হয়।

৫. বনী আল হারিস (ইবনে আল খাজরাজ) তাদের বর্তমান রীতি অনুযায়ী পূর্বের ন্যায় সম্মিলিতভাবে রক্তমূল্য পরিশোধ এবং সকলে মিলে তাঁদের বন্দীদের মুক্ত করবে, পারস্পরিক আচরণ যেন সদয় ও ইনসাফ ভিত্তিক হয়।

৬. বনী সাঈদা তাদের বর্তমান রীতি অনুযায়ী পূর্বের ন্যায় সম্মিলিতভাবে রক্তমূল্য পরিশোধ এবং তাদের কেউ বন্দী হলে তাকে মুক্ত করার দায়িত্ব পালন করবে, যেন মুমিনদের পারস্পারিক আচরণ সদয় ও ইনসাফভিত্তিক হয়।

www.pathagar.com

৭. বনী জুশাম তাদের বর্তমান প্রথা অনুযায়ী সম্মিলিতভাবে রক্তমূল্য পরিশোধ এবং তাদের বন্দীদের মুক্ত করার দায়িত্ব পালন করবে, যেন মুমিনদের পারস্পরিক আচরণ সদয় ও ইনসাফপূর্ণ হয়।

৮. বনী আল নাজ্জার তাদের বর্তমান রীতি অনুযায়ী পূর্বের ন্যায় সম্মিলিতভাবে তাদের রক্তমূল্য পরিশোধ এবং তাদের বন্দীদের মুক্ত করার দায়িত্ব পালন করবে, যেন মুমিনদের পারস্পরিক আচরণ সদয় ও ইনসাফ ভিত্তিক হওয়া নিশ্চিত হয়।

৯. বনী আল আমর ইবনে আওয়াফ তাদের বর্তমান রীতি অনুযায়ী সম্মিলিতভাবে রক্তমূল্য পরিশোধ এবং তাদের বন্দীদের মুক্ত করার দায়িত্ব পালন করবে যেন মুমিনদের পারস্পরিক আচরণে ন্যায় বিচার নিশ্চিত হয়।

১০. বনী আল নাবীতে তাদের বর্তমান রীতি অনুযায়ী পূর্বের ন্যায় সম্মিলিতভাবে রক্তমূল্য পরিশোধ ও তাদের বন্দীদের মুক্ত করার দায়িত্ব পালন করবে, যেন মুমিনদের পারস্পরিক আচরণ ইনসাফ ভিত্তিক হয়।

১১. বনী আল আওয়াস তাদের বর্তমান রীতি অনুযায়ী পূর্বের ন্যায় সম্মিলিতভাবে রক্তমূল্য পরিশোধ এবং তাদের বন্দীদের মুক্ত করার দায়িত্ব পালন করবে, যেন ঈমানদারদের পারস্পরিক আচার আচরণ ইনসাফ ভিত্তিক হওয়া নিশ্চিত হয়।

১২. (ক) ঈমানদারগণ বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তির অর্থ অথবা রক্তমূল্য পরিশোধের অভাবে তাদের মধ্যকার কাউকে দুঃস্থ অবস্থায় নিপতিত হতে দেবে না।

১২. (খ) কোন ঈমানদার ব্যক্তি অপর একজন মুসলমানের মুক্ত করা দাসকে তার মিত্র হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে না।

১৩. ঈমানদার খোদাভীরুগণ সর্বক্ষণ ঐ সমস্ত অপশক্তিকে প্রতিহত করার জন্য সংগঠিত থাকবে, যারা জুলুম, অনাচার ও পাপ চর্চার বিস্তার করার জন্য নিয়োজিত হয় এবং ঈমানদারদের মধ্যে ভাঙ্গন, অনৈক্য ও ফিতনা সৃষ্টিতে সচেষ্ট হয়, এসব দুষ্টশক্তির বিরুদ্ধে সকল মুমিনের হাত একটি প্রতিবাদী হাত হয়ে উত্তোলিত হবে, যদি অপশক্তির কেউ তাদের সন্তানও হয়।

১৪. কোন ঈমানদার ব্যক্তি একজন কাফেরের বদলা হিসেবে কোন মুসলমানকে

www.pathagar.com

হত্যা করতে অথবা একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে কোন কাফেরকে সাহায্য করতে পারবে না।

১৫. আল্লাহর নিরাপত্তা সর্বব্যাপী। ঈমানদারদের মধ্য থেকে অতি সাধারণ ব্যক্তি তাদের পক্ষে কাউকে আশ্রয় প্রদান করতে পারবেন। ঈমানদারগণ পরস্পরের বন্ধু ও একে অপরের হেফাজতকারী এবং প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় তারা সকলে পরস্পরের ভ্রাতৃতুল্য।

১৬. ইহুদীর মধ্য হতে যারা আমাদের অনুগত থাকবে তারা সকল ক্ষেত্রে আমাদের সমান অধিকার ভোগ করবে। তাদের কারোর ওপর জুলুম করা চলবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করা যাবে না।

১৭. ঈমানদারগণের শান্তি অবিভাজ্য। ঈমানদারগণ আল্লাহর পথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকা অবস্থায় কোন শান্তি স্থাপিত হবে না। শান্তির শর্তাবলীর অবশ্যই সকলের জন্য ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক হতে হবে।

১৮. প্রতিটি অভিযানের সময় একজন অশ্বারোহীর পিছনে আরেকজন অশ্বারোহী থাকবে।

১৯. আল্লাহর পথে জিহাদের সময় যারা নিহত হয়েছেন, ঈমানদারগণ এক এক করে তাদের রক্তের বদলা অবশ্যই গ্রহণ করবে।

২০. (ক) সর্বাবস্থায়ই ঈমানদার ও পরহেজগারগণ সর্বাধিক মর্যাদা প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।

২০. (খ) কোন অংশীবাদী পৌত্তলিক তার আশ্রয়াধীন কুরাইশদের সম্পত্তি বা কোন ব্যক্তিকে গ্রহণ করতে পারবে না অথবা একজন মুসলমান তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রসর হলে তাকে বাধা দান করতে পারবে না।

২১. কোন সঙ্গত কারণ ছাড়া কেউ একজন ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যার জন্য দায়ী হলে, অতঃপর নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের (রক্তমূল্য পরিশোধ করে) সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে ঈমানদারগণ তার বিরুদ্ধে একব্যক্তির ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হবে এবং তার বিরুদ্ধে শাস্তি বিধানে বাধ্য হবে।

২২. এই নীতিমালার শর্তাবলী স্বীকৃতি প্রদানকারী এবং আল্লাহ ও রোজ কিয়ামতের উপর বিশ্বাসী কোন ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষে কোন অবস্থায়

www.pathagar.com

একজন দুর্বৃত্ত পাপীকে আশ্রয় দেয়া বা তার পক্ষ সমর্থন করা বৈধ হবে না। কেউ এরূপ করলে সে কিয়ামতের দিনে আল্লাহর অভিশাপ ও ক্রোধের অনলে দগ্ধ হবে এবং তার কোন তওবা বা দান কবুল হবে না।

২৩. চুক্তির পক্ষগুলোর মধ্যে কোন মতবিরোধ দেখা দিলে আল্লাহর কিতাব অনুসারে হযরত মুহাম্মদ (সা.) তার চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন।

২৪. ইহুদীরা মুমিনদের সঙ্গে শরীক হয়ে যুদ্ধ করতে চাইলে তাদের সকল ব্যয়ভার নিজেদেরকেই বহন করতে হবে।

২৫. চুক্তিবদ্ধ বনু আওয়াফ গোত্রের ইহুদীরা মদীনায় সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে এবং মুসলমানদের সঙ্গে একই রাজনৈতিক সত্তারূপে বিবেচিত হবে। ইহুদীরা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম-কর্ম পালন করতে পারবে এবং মুসলমানগণও স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম-কর্ম পালন করবে। এর মধ্যে যারাই সীমা লংঘন করবে তারা কেবল মাত্র নিজেদের ও তাদের পরিবার-পরিজনকে বিপন্ন করবে।

২৬. বনু আল নাজ্জারের ইহুদীরা বনু আওয়াফের ইহুদীদের অনুরূপ।

২৭. বনু আল হারিসের ইহুদীরা বনু আওয়াফের ইহুদীদের মতো।

২৮. বনু জুশামের ইহুদীরা বনু আওয়াফের ইহুদীরদের মতো।

২৯. বনু সাঈদার ইহুদীরা বনু আওয়াফের ইহুদীদের মতো।

৩০. বনু আওয়াসের ইহুদীরা বনু আওয়াফের ইহুদীদের মতো।

৩১. বনু আল সালাবার ইহুদীরা বনু আওয়াফের ইহুদীদের মতো, তবে ব্যতিক্রম হচ্ছে অন্যায়কারী ও পাপীরা, তারা তাদের আচরণের মাধ্যমে কেবলমাত্র নিজেদের ও তাদের পরিবার-পরিজনকে বিপন্ন করছে।

৩২. সালাবার অন্তর্গত জাফনা গোত্রের ইহুদীরা তাদেরই মতো।

৩৩. বনু শুতাইবার ইহুদীরা বনু আওয়াফের ইহুদীদের মতো।

৩৪. বনু সালাবার চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিবর্গ তাদের মতো বিবেচিত হবে।

৩৫. ইহুদীদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তাদের মতো বিবেচিত হবে।

৩৬. (ক) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুমতি ছাড়া কেউ যুদ্ধের জন্য বের হতে পারবে না।

www.pathagar.com

৩৬. (খ) তবে একে অন্যকে আহত করলে তার বদলা গ্রহণ করা থেকে কাউকে বাধা দেয়া হবে না। কোন ব্যক্তি জুলুমের শিকার না হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব হুঁশিয়ারি ছাড়াই কাউকে হত্যা করবে, সে তার নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনকে হত্যা করবে, আল্লাহ মজলুমের সহায়তাকারী।

৩৭. (ক) ইহুদীরা অবশ্যই তাদের ব্যয়ভার এবং মুসলমানরা তাদের ব্যয়ভার বহন করবে। এই চুক্তির আওতাধীন কোন পক্ষ আক্রান্ত হলে তারা পরস্পরকে অবশ্যই সাহায্য করবে। তারা অবশ্যই পারস্পরিক পরামর্শ প্রদান ও পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করবে। ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠাই পাপ থেকে উত্তম হেফাজতকারী।

৩৭. (খ) চুক্তিবদ্ধদের কেউ সীমালংঘন বা অনাচের লিপ্ত হলে সেজন্য চুক্তির অন্য শরীকদের দায়ী করা হবে না। কারোর উপর জুলুম করা হলে সর্বাবস্থাতেই তাকে সাহায্য করা হবে।

৩৮. যতদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে ততদিন পর্যন্ত ইহুদীদেরকে মুসলমানদের সঙ্গে একত্রে যুদ্ধের ব্যয়ভার অবশ্যই বহন করতে হবে।

৩৯. এই চুক্তির আওতাধীন ব্যক্তিবর্গের জন্য মদীনা হবে নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

৪০. কোন ব্যক্তির আশ্রয়াধীন বাইরের লোক তার মেহমান হিসেবে গণ্য হবে এবং তার কোন ক্ষতিসাধন অথবা তার উপর কোন জুলুম করা হবে না।

৪১. কোন মহিলাকে তার পরিবারের সদস্যদের সম্মতি ছাড়া আশ্রয় দেয়া যাবে না।

৪২. কোন মতবিরোধ বা ঝগড়া-কাদাল দেখা দিলে তার চূড়ান্ত মিমাংসা আল্লাহ ও তার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর দ্বারা করতে হবে, আল্লাহ এই চুক্তির ধার্মিকতা, কর্তব্য নিষ্ঠা ও সততাকে কবুল করবেন।

৪৩. কুরাইশ ও তাদের সাহায্যকারীদেরকে আশ্রয় দেয়া যাবে না।

৪৪. ইয়াসরিবের উপর কোন বহিঃশক্তি হামলা চালালে চুক্তির শরীক পক্ষগুলো অবশ্য একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

৪৫. (ক) তাদেরকে যদি সন্ধি করতে ও তা বজায় রাখতে বলা হয় তারা অবশ্যই তা করবে এবং তারা যদি ঈমানদারদের কাছে অনুরূপ দাবী জানায় তাহলে ঈমানদারগণও অবশ্যই তা পালন করবে তবে নিজেদের ধর্মীয় বিরোধ ও সংঘাতের ক্ষেত্রে এই শর্ত কার্যকর হবে না।

www.pathagar.com

৪৫. (খ) প্রত্যেক দল বা সম্প্রদায়ের উপর মদীনার সেই এলাকার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব থাকবে যে এলাকায় তারা বসবাস করে।

৪৬. বনু আওয়াস গোত্রের ইহুদীরা ও তাদের মিত্ররা তাদেরই মতো আরা উভয়ে চুক্তিবদ্ধ অন্য ব্যক্তির ন্যায় মর্যাদার অধিকারী হবে এবং চুক্তিবদ্ধ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যে দায়দায়িত্ব ও সুবিধা ভোগ করে, তারাও তা ভোগ করবে। সত্যনিষ্ঠতাই পাপ থেকে হেফাজত করে ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের কাজের জন্য দায়ী থাকবে। আল্লাহ এই দলিল অনুমোদন করেছেন।

৪৭. এই চুক্তিপত্র কোন জালেম, ভাঙ্গাবাজ অপরাধীর জন্য আত্মরক্ষার স্বার্থে কোন অবস্থাতেই ব্যবহৃত হবে না। যারা যুদ্ধে শরীক হয় কিংবা নগরীতে গৃহস্থলীর কাজে নিয়োজিত থাকে, সবাই নিরাপদ থাকে। শুধু তারাই এই নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হবে, যাদের বিরুদ্ধে সীমালংঘন বা শাস্তিযোগ্য অপরাধ প্রমাণিত হবে। আল্লাহ চুক্তির প্রতি নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের প্রতি সাহায্যকারী ও নেগাহবান হবেন এবং তার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) ওসব ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষক ও দায়িত্বশীল থাকবেন।

চুক্তির বিশ্লেষণ

আমরা ইতিমধ্যে এই উপসংহারে উপনীত হয়েছি যে মূলত ঃ দলিলটির দুটি অংশ ছিল। তাই এ সম্পর্কে যে কোন আলোচনা বা বিশ্লেষণ অবশ্যই ইহুদীদের সঙ্গে চুক্তি এবং মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক, অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত দলিলের বিষয়বস্তু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সম্পাদিত হতে হবে।

আমরা প্রথমে ইহুদীদের সঙ্গে চুক্তির ধারাসমূহ আলোচনা করবো, কারণ কালানুক্রমিকভাবে আলোচনা করতে গেলে এই ধারাসমূহই আগে আসা সঙ্গত, যদিও দলিলটির শেষ দিকে এগুলো স্থান পেয়েছে। মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে সম্পাদিত দ্বিতীয় চুক্তিটির ধারাগুলো এই দলিলের প্রথম দিকে স্থান পেয়েছে।

ইহুদীদের সঙ্গে শান্তি চুক্তির দলিল

দলিলটির ২৪-৪৭ ধারায় ইহুদীদের সঙ্গে শান্তি চুক্তির বিভিন্ন দিক বর্ণিত হয়েছে। ধারাক্রম থেকে আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে দুটি চুক্তির দলিল একত্রে মিশে যায়নি। প্রতিটি দলিলের ধারাগুলো সামগ্রিকভাবে ক্রমানুসারে উপস্থাপন করা

www.pathagar.com

হয়েছে। দলিলের ১৬নং ধারায় মুহাজির ও আনসারদের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, ইহুদীদের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, কারণ এই ধারায় মুসলমানদের নিজ ইহুদীদের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করার বিষয় নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে ইহুদীদের সঙ্গে শান্তি চুক্তির দলিলে এই ধারাটি অন্তর্ভুক্ত করা জরুরী বলে বিবেচিত হয়নি।

২৪নং ধারায় ইহুদীরা মদীনার প্রতিরক্ষার জন্য যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে এবং মুসলমানরা যতদিন যুদ্ধ চালিয়ে যাবে ততদিন পর্যন্ত তারাও অর্থপ্রদান অব্যাহত রাখবে। আবু উবায়েদ আল কাসিম ইবনে সালামের মতে ইহুদীদের আর্থিক প্রতিশ্রুতি বিষয় কেবলমাত্র মদীনার প্রতিরক্ষা যুদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা। ইহুদীরা মুসলমানদের সঙ্গে আক্রমিক অভিযানেও অংশ নিতো বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "আমাদের ধারণা, ইহুদীরা ব্যয় নির্বাহ ও অংশগ্রহণের শর্তে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে শামিল হলে গণিমতের মালের অংশ লাভ করতো। এই ধরনের শর্ত না থাকলে মুসলমানদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের কোন অংশ তারা পেতো না।"[৩৯] তিনি আরো বলেন, "আল জুহুরী থেকে ইয়াজিদ ইবনে জাবির, তার থেকে সুফিয়ান এবং সুফিয়ান থেকে আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী আমাদেরকে বলেন ঃ ইহুদীরা প্রায়ই রাসূলের সঙ্গে অভিযানে যেতো এবং তাদেরকে গণিমতের মালের অংশ প্রদান করা হতো।"[৪০] এটি অবশ্য আল জুহুরীর একটি মুরসাল হাদীস, তাই আমরা এর উপর নির্ভর করতে পারিনা। তবে অন্যান্য হাদীসেও রাসূলের সঙ্গে ইহুদীদের যুদ্ধে যাওয়ার বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যা পূর্বোল্লিখিত বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত হয়নি ঃ

১. "রাসূলুল্লাহ (সা.) যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য বনু কায়নুকার ইহুদীদের অনুরোধ জানান।" আল হাসান ইবনে ইমারা ও আবু ইউসুফ এই হাদীসটি বর্ণনা করেন।[৪১] আল বায়হাকীও তার কিতাবে এই হাদীস অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল বায়হাকী উল্লেখ করেন যে আল হাসান ইবনে ইমারা মাতরূক,[৪২] যদিও তার জয়ীফ হবার ব্যাপারে মতৈক্য হয়নি। তবে অধিকাংশ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণকারী বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে তিনি জয়ীফ। এই পরিপ্রেক্ষিতে সুহাইলী বর্ণনা করেন যে এব্যাপারে একটা মতৈক্য হয়েছে।[৪৩]

২. "রাসূলুল্লাহ (সা.) কয়েকজন ইহুদীকে গণিমতের মালের অংশ প্রদান করেন, তারা তাঁর সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করেছিল" আল তিরমিজী আল জুহুরীর কাছ

www.pathagar.com

থেকে মুরসাল হাদীস হিসেবে এটি বর্ণনা করে বলেন যে হাদীসটি হাসান গারীব। আল তিরমিজী এই মূলনীতি ঘোষণা করেন যে, আল জুহুরীর মুরসাল হাদীসের উপর নির্ভর করা যাবে না।

৩. "রাসূলুল্লাহ ইহুদীদের সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করেছেন।"[৪৫] এটিও আল জুহুরীর মুরসাল হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য নয়।

৪. "আল্লাহর রাসূল (সা.) কিছু সংখ্যক ইহুদীকে সঙ্গে নিয়ে একটি অভিযানে রওনা হন।" আল বায়হাকী এই বর্ণনা দেন।[৪৬] তিনি হাদীসটিকে মুনকাতি বলে উল্লেখ করেন। এটিও আল জুহুরীর বর্ণিত একটি মুরসাল হাদীস।

৫. "মহানবী মদীনার ১০ জন ইহুদীকে সঙ্গে নিয়ে এক অভিযানে রওনা হন এবং খায়বরের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন।" আল ওয়াকদী[৪৭] হাদীসটি বর্ণনা করেন, তিনিও জয়ীফ। তার থেকে আল বায়হাকী[৪৮] ও আল জাইলাই[৪৯] হাদীসটি বর্ণনা করেন।

৬. "কিছুসংখ্যক ইহুদী রাসূলের সঙ্গে থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং রাসূলুল্লাহ মুসলমানদের মতো তাদেরকেও গণিমতের মালের অংশ প্রদান করেন।" আবু হুরায়রা থেকে খতিব আল বাগদাদী[৫০] হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে এর সনদ জয়ীফ এবং কয়েকজন বর্ণনাকারী সনদ থেকে বাদ পড়েছেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয়েছে যে রাসূলুল্লাহর সঙ্গে ইহুদীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত সব কয়টি হাদীসই জয়ীফ। কযেকটি হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে ইহুদীদের বিরত রেখেছেন। সেগুলো হলো ঃ

১. আবু হামিদ আল সাঈদী থেকে আবু আব্দুল্লাহ আল হাকীম[৫১] বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয় ঃ রাসূলুল্লাহ সিনাইয়াত আল ওয়াদা অতিক্রম করার পর একজন যোদ্ধাকে দেখতে পেলেন। তিনি জানতে চাইলেন, "ওরা কারা" উত্তরে তাকে বলা হলো ঃ ওরা বনু কায়নুকা গোত্রের সদস্য এবং আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের লোক। এরপর তিনি বললেন ঃ "তাদেরকে ফিরে যেতে বলো, আমরা মুশরিকদের সাহায্য চাইনা।"

আল হাকীম অপর এক হাদীসের সমর্থনে প্রমাণ হিসেবে এই বর্ণনা দেন। তাতে বলা হয় ঃ "আমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্য অন্য মুশরিকদের অনুরোধ জানাতে পারিনা" আল হাকীম বলেন, "সনদের দিক থেকে

www.pathagar.com

হাদীসটি সহীহ কিন্তু তারা (বুখারী ও মুসলিম) হাদীসটি বর্ণনা করেননি।" ওহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে এই হাদীসটি রেওয়ায়েত করা হয়, কিন্তু আল হাকীমের বর্ণনায় একটি অভিযানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তবে কোন অভিযান তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি।[৫২] ওহুদ যুদ্ধের কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা ভুল হবে কারণ ওহুদ যুদ্ধের একবছর আগেই বনু কায়নুকাকে নির্বাসন দেয়া হয়েছিল। আল হাকীম থেকে আবু হামিদ আল সাঈদী[৫৩] এবং তার থেকে আল বায়হাকীও হাদীসটি বর্ণনা করেন। আল ওয়াকিদী ও ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন যে, তারা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের মিত্র ছিল এবং সে কারণেই রাসূল (সাঃ) বলেনঃ "আমরা এক মুশরিকদের বিরুদ্ধে অন্য মুশরিকদের সাহায্য চাইনা।"[৫৪]

২. ইবনে ইসহাক,[৫৫] ইমাম শাহনুন[৫৬] এবং ইবনে আল কাইয়ুম[৫৭] আল জুহুরী থেকে বর্ণনা করেন, "ওহুদের দিন আনসারগণ বললেন ঃ আমরা সাহায্যের জন্য আমাদের মিত্র ইহুদীদের ডাকবো না কেন? তিনি বললেন, "তাদের ডাকবার প্রয়োজন নেই।"

প্রথম হাদীসটি সনদের দিক থেকে যে কোন হাদীসের চেয়ে অধিকতর সহীহ। সা'দ ইবনে আল মুনজির এর মধ্যে রয়েছেন। ইবনে হাজরের মতে তিনি একজন মকবুল হাদীস বর্ণনাকারী। এই অভিমত অধিকতর সঠিক প্রতিপন্ন হতে পারে, কারণ চুক্তির দলিলে যুদ্ধের ব্যাপারে ইহুদীদের অবদান রাখার কথা বলা হয়েছে এবং এই অবদান মদীনার প্রতিরক্ষা যুদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ৪৪নং ধারার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ঃ "ইয়াসরিবের উপর যেকোন হামলা মোকাবেলায় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত সকল পক্ষ পরস্পরকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে।"

তবে আল হাকীমের অভিমত অনুযায়ী কিছু সংখ্যক ইহুদী মদীনার বাইরে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য কেন এগিয়ে গিয়েছিল? ইসলামের আগমনের পূর্বে আওয়াস ও খাজরাজ গোত্রের সঙ্গে ইহুদীদের মিত্রতা ছিল এবং সেই সূত্র ধরে তারা এইরূপ করেছিল। ইহুদীরা সম্ভবত এই মিত্রতা জোরদার করতে এবং পুরানো মিত্রদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক শক্তিশালী করতে চেয়েছিল। ইহুদীদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি, তাদের মনোবল দুর্বল করা এবং মুসলমানদের মধ্যে মুনাফেকী বিস্তারের জন্য এই মিত্রতাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) কুফরীতে নিমজ্জিত থাকা পর্যন্ত ইহুদীদের কাছ থেকে কোন ধরনের সাহায্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে তাদের

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্র কার্যকরভাবে রোধ করেন। ওহুদ প্রান্তরে আনসারগণ রাসূলকে যে কথা বলেছিলেন তাতে পরিষ্কার বুঝা গেছে যে আওয়াস ও খাজরাজ গোত্রের সঙ্গে ইহুদীদের পুরনো মিত্র বজায় ছিল। তারা বলেন ঃ "আমরা সাহায্যের জন্য আমাদের মিত্র ইহুদীদের ডাকবো না কেন?" মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের খাজরাজ গোত্রের মিত্র বনু কায়নুকার পক্ষে হস্তক্ষেপ এবং রাসূলের বিচার মেনে নেয়ার পরেও মিত্র ইহুদী গোত্র বনু কুরায়জার কয়েকজনকে মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আওয়াস গোত্রের চেষ্টার থেকেও এ বিষয়টি সমর্থিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) সা'দ ইবনে মুয়াজকে বিচারক নিয়োগ করেন এবং তিনি বনু কুরায়জার ইহুদীদের মৃত্যুদণ্ডের রায় প্রদান করেন। এভাবে সা'দ ঠিক উবাদা ইবনে সামিতের (খাজরাজ গোত্রের বনু আওয়াফের সদস্য) মতো মিত্রতা বর্জন করেন। বনু কায়নুকার ইহুদীরা রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলে উবাদা তাদের সঙ্গে মিত্রতা ছিন্ন করেন।

২৫-৩৫ নং ধারাসমূহে আওয়াস ও খাজরাজ গোত্রের সঙ্গে ইহুদীদের সম্পর্কের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এসব ধারায় আরব গোত্রে তাদের জনগ্রহণ এবং মুসলমানদের সঙ্গে তাদের মিত্রতার বিষয় সমর্থিত হয়েছেঃ "বনু আওয়াফের ইহুদীরা ছিল মুসলমানদের সমগোত্রীয় একটি গোত্র।" আল ইবারা অবশ্য আল আমওয়াল গ্রন্থে একটি চিত্র তুলে ধরে বলেছেনঃ "... মুসলমানদের মধ্যকার একটি গোষ্ঠী," এরই প্রেক্ষিতে আবু উবায়েদ বলেন ঃ "তিনি মুসলমানদের দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবদানের মাধ্যমে সাহায্য করার বিষয় উল্লেখ করেন, তাদের উপর এই শর্তটি আরোপ করা হয়েছিল।" কিন্তু ধর্মীয় (ইসলাম) বিষয়ে তাদের কিছু করণীয় ছিলনা। এই কারণে রাসূলুল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন ঃ "ইহুদীদের জন্য তাদের ধর্ম এবং মুসলমানদের জন্য তাদের নিজস্ব ধর্ম রয়েছে।"[৫৮] ইবনে ইসহাক বলেন, "মুসলমানদের সঙ্গে" কথাটি অধিকতর নির্ভরযোগ্য। সম্ভবত আমওয়াল গ্রন্থে ব্যাক্যাংশটি পরিবর্তিত হয়েছে।

২৫ নং ধারায় ইহুদীদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান এবং যে অপরাধ করবে তার দায়িত্ব তার উপরই বর্তানোর বিষয় উল্লিখিত হয়েছে (যারা অন্যায় ও পাপের পথ অনুসরণ করবে, তারা নিজেদের ও তাদের পরিবারকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং তারা এই নিশ্চয়তা পাবেনা), অপরাধী তার অপরাধের শাস্তি ভোগ করবে, সে চুক্তিবদ্ধ কোন গোত্রের সদস্য হলেও, "এই চুক্তিপত্র কোন অন্যায়কারী ও পাপীকে রক্ষা করবে না।"

www.pathagar.com

৪৫নং ধারায় কুরাইশদের রক্ষা বা সাহায্য করা ইহুদীদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ কুরাইশদের বাণিজ্য বহরকে বাধা দেয়ার পরিকল্পনা করেন। এই বহর সিরিয়ায় যাওয়ার সময় মদীনার পশ্চিম দিক দিয়ে যেতো। মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যকার সংঘাত রোধের জন্য এই প্রতিশ্রুতি জরুরী হয়ে পড়েছিল। কুরাইশদের বাণিজ্য বহর রক্ষায় ইহুদীরা চেষ্টা করলে এধরনের সংঘাতে সৃষ্টি হতে পারতো। ২৯নং ধারায় রাসূলের অনুমতি ছাড়া ইহুদীদের মদীনা ত্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাদের চলাফেরার উপর বিধিনিষেধ আরোপের প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল মদীনার বাইরের গোত্রীয় সংঘর্ষের মতো সামরিক তৎপরতায় ইহুদীদের অংশগ্রহণ রোধ করা, কারণ এতে মদীনার নিরাপত্তা বিঘ্নিত ও অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা ছিল। ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে ইহুদীদের রাষ্ট্রের আইন মেনে চলতে হয়েছিল। ৪৫ নং ধারায় ইহুদীরা মদীনার উচ্চতর আইনগত কর্তৃপক্ষের অস্তিত্বের প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে যাকে ইহুদীসহ মদীনার সকল অধিবাসী মান্য করতো। ইহুদীরা সকল বিষয়ে ইসলামী আইনের শরণাপন্ন হতে বাধ্য ছিলনা, কেবলমাত্র তাদের এবং মুসলমানদের মধ্যে কোন ঘটনা বা সংঘাতের ক্ষেত্রে তাদের প্রতি এই বাধ্যবাধকতা ছিল। নিজেদের মধ্যকার সমস্যা নিরসনের জন্য তারা তাওরাতের শরণাপন্ন হতো এবং রাব্বীগণ তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করতেন। তারা ইচ্ছা করলে রাসূলকেও বিচারক নিয়োগ করতে পারতো। পবিত্র কোরআন রাসূলকে তাদের বিচারক হবার অথবা রাব্বীদের কাছে ফেরত পাঠানোর এখতিয়ার প্রদান করেছে ঃ "...তারা যদি আপনার কাছে আসে তাহলে হয় তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন, না হয় তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন। যদি তাদের থেকে নির্লিপ্ত থাকেন তবে তাদের সাধ্য নেই যে তারা আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে। যদি ফয়সালা করেন, তাহলে ন্যায়ভাবে ফয়সালা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন" (আল মায়েদা ৫ঃ৪২) [৫৯] তারা দুর্বল হবার পরই যে রাসূলুল্লাহকে তাদের বিচারক নিয়োগ করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। শেষ দিকে নাজিল সূরা আল মায়েদায় তার স্বীকৃতি রয়েছে।

৪৫নং ধারায় মুসলমান ও ইহুদীদের অন্যান্য মিত্রের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে চুক্তি সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এই ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক পক্ষ অন্যান্য পক্ষের মিত্রদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে, তবে মুসলমানরা মক্কার কুরাইশদেরকে এর থেকে বাইরে রাখেন, কারণ তাদের সঙ্গে কুরাইশদের যুদ্ধ অবস্থা বিরাজ করছিল।

www.pathagar.com

৩২ নং ধারাতে মদীনা নগরীকে পবিত্র স্থান হিসেবে গণ্য করা হয়েছে ঃ "এই দলিলের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের কাছে ইয়াসরিব পবিত্র বলে গণ্য হবে।" এই স্থানের পবিত্রতা লংঘন করা চলবে না, এখানকার প্রাণীকুল শিকার এবং বৃক্ষরাজি কাটা যাবে না। মদীনার পূর্ব হারা থেকে পশ্চিম হারা পর্যন্ত এলাকা এবং উত্তরের শুউর পর্বত থেকে দক্ষিণের আইর পর্যন্ত এলাকা পবিত্র। ওয়াদী আল আকিক এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত।[৬০] এই ধারাটিতে মদীনার আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং নগরীর অভ্যন্তরে যেকোন যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যকার চুক্তি

মিত্র পক্ষগুলোর পরিচয় বিবৃত করে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে চুক্তির সূত্রপাত করা হয়েছেঃ "মুমিনগণ মক্কার কুরাইশ ও ইয়াসরিবের মুসলমানগণ, যারা তাদের অনুবর্তী হবেন এবং যারা তাদের সাথে যুদ্ধে অংশ নেবেন, তারা।" মুমিন ও মুসলমানের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে, যিনি ঈমান পোষণ করেন, মুখে তার স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং অন্তরে বিশ্বাস করেন, তিনিই হলেন মুমিন। আর যিনি ইসলামী আইন-কানুন মেনে চলেন এবং ফরজ এবাদতসমূহ পালন করেন, তিনি হলেন মুসলমান। বদর যুদ্ধের পর ইয়াসরিবে মুনাফিকদের আবির্ভাব ঘটায় এখানে এই দুই শ্রেণীর পার্থক্য স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। মুহাজিরগণের প্রত্যেকেই গভীর ঈমানদার মুমিন ও মুসলমান ছিলেন।

২ নং ধারায় বলা হয়েছে ঃ "তারা অন্যান্য জাতির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি উম্মাহ।" এই উম্মাহর সদস্যরা রক্তের নয়, ঈমানী সম্পর্কের বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই তারা উপলব্ধি, চিন্তা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ। তারা আল্লাহর প্রতি অনুগত, গোত্রের প্রতি নয়। তাদের সকল ফয়সালা শরিয়তের ভিত্তিতে করা হয়, প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নয়। এসব ক্ষেত্রে তারা অন্য সকল মানুষের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ("তারা অন্যান্য জাতির থেকে পৃথক এক উম্মাহ")। এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কেবলমাত্র মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, ইহুদী ও তাদের মিত্রদের এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

নিঃসন্দেহে নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি জোরদার এবং আত্মমর্যাদাবোধ সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে এই ধর্মীয় জাতিসত্ত্বাকে এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করা হয়েছিল। কিবলা পরিবর্তনের ঘটনার ভেতর দিয়ে এই বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। হিজরতের ১৬ অথবা ১৭ মাস পরে বায়তুল মাকদাস (জেরুসালেম) থেকে কাবার দিকে কিবলা পরিবর্তন করা হয়।[৬১] রাসূলুল্লাহ (সা.) সকল

www.pathagar.com

দিক থেকে তার উম্মতকে পৃথক বৈশিষ্ট্যে গড়ে তোলেন। তিনি এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন ঃ তার লক্ষ্য ইহুদীদের থেকে তার অনুসারীদের পৃথক করা। এর একটি উদাহরণ হলো ঃ ইহুদীরা জুতা পরা অবস্থায় নামাজ পড়তো না, তাই রাসূল জুতা পরিহিত অবস্থায় নামাজ আদায় করার জন্য সাহাবীদেরকে অনুমতি প্রদান করেন। ইহুদীরা পাকা চুলে খেজাব দিতোনা, তাই মুসলমানরা হেন্না ও কাতামের (চুল কালো করার কাজে ব্যবহৃত উদ্ভিদ) সাহায্যে পাকাচুল কালো করতেন। ইহুদীরা আশুরার দিনে (১০ই মহররম) রোজা রাখতো, রাসূলও এদিন রোজা রাখতেন। জীবনের শেষদিকে তিনি ৯ই মহররমের দিনেও রোজা রাখতে আগ্রহী ছিলেন, এর লক্ষ্য ছিল ইহুদীদের থেকে নিজেদেরকে পৃথক রাখা। রাসূল অমুসলিমদের থেকে নিজেদের পৃথক রাখার মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলেন ঃ "যে অন্য জাতির অনুসরণ করে সে তাদেরই একজন" এবং "তোমরা ইহুদীদের অনুসরণ করবে না।" এব্যাপারে অনেক হাদীস রয়েছে। এসব হাদীসে একথা বুঝানো হয়েছে যে, মুসলমানরা অমুসলিমদের থেকে পৃথক ও শ্রেষ্ঠতর। অন্য জাতির অনুকরণ করা যে আমাদের আত্মমর্যাদা এবং অমুসলিমদের থেকে শ্রেষ্ঠত্বের পরিপন্থী তাতে কোন সন্দেহ নেই।[৬২] এই বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব মুসলমান ও অমুসলিমদের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। ইসলামী সমাজ চির উন্মুক্ত ও সম্প্রসারণযোগ্য। যে কেউ এর আদর্শ গ্রহণ করে এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৩-১১ নং ধারায় গোত্রগুলোর কথা উল্লেখিত হয়েছে। সংখ্যাল্পতার জন্য মুহাজিরদেরকে একটিমাত্র দল হিসেবে আর আনসারদেরকে তাদের গোত্র অনুসারে নির্দেশ করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে মানুষের মধ্যে সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে এখানে গোত্রে উল্লেখ করা হয়নি এবং তা গোত্রীয় বা গোষ্ঠীগত সংহতি বজায় রাখার অর্থও প্রকাশ করছে না। ইসলাম এই সম্পর্ক নিষিদ্ধ করে বলেছেঃ "যে আসাবিয়ার পক্ষে ওকালতি করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়" (হাদীস)। ইসলাম কেবলমাত্র সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গোত্রীয় সম্পর্কের ফায়দা গ্রহণ করেছে।

ইসলাম তার অনুসারীদের ঐক্যের জন্য মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছে ঈমানকে। সমাজের জন্য কল্যাণকর এবং লোকদের সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহায়ক অন্যান্য সম্পর্ককেও ইসলাম স্বীকৃতি দিয়েছে, তবে এসব সম্পর্ক ঈমানী সম্পর্কের চেয়ে নিম্নমানের। ইসলাম যেসব সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়েছে তাহলো ঃ

www.pathagar.com

- একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক এবং পিতা, সন্তান, মাতা ও গোত্রের সদস্যদের মধ্যে অধিকার ও কর্তব্য, যেমন যৌথভাবে মুক্তিপণ প্রদান, যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করা এবং নিজেদের মধ্যকার অভাবীদের সাহায্য করা।

- একই এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক ঃ "প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ করার জন্য জিব্রাইল আমাকে যেভাবে অব্যাহতভাবে তাগিদ দিয়েছিলেন তাতে আমি ধারণা করেছিলাম যে তিনি হয়ত আমার প্রতিবেশীকে আমার উত্তরাধিকারী নির্বাচন করবেন।" (হাদীস)।

- একই গ্রামের লোকদের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক ঃ সেখানকার একজনও যদি ক্ষুধার্ত থাকে তাহলে তাদের সকলের উপর থেকে আল্লাহর হেফাজত প্রত্যাহৃত হবে।

- একই শহরের বাসিন্দাদের মধ্যকার বিশেষ সম্পর্ক ঃ শহরের লোকদের চাহিদা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত যাকাতের অর্থ শহরের বাইরে ব্যয় করা যাবে না।

এভাবে ইসলাম সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে প্রতিটি ক্ষুদ্র সামাজিক ইউনিটের জন্য কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে ইসলাম সামাজিক দায়িত্বের বিরাট ব্যবধান পূরণ করেছে। অবশেষে ইসলাম ব্যক্তির পক্ষে যেসব দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয় তা পূরণ করার জন্য রাষ্ট্রকে নির্দেশ দিয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এরফলে রাষ্ট্রের থেকে বিরাট বোঝা অপসারিত হয়েছে, অনেক আধুনিক রাষ্ট্রে এখনো এসব সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছে।

গোত্রীয় সম্পর্কের স্বীকৃতিদানের লক্ষ্য ছিল সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে এর থেকে সুফল লাভ করা। জুলুমে সহায়তা করা এর লক্ষ্য ছিল না, না গোত্রীয় সংহতি গড়ে তোলা। এভাবে ইসলাম গোত্রীয় সম্পর্কের ধারা পরিবর্তন করে তার মহৎ উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমন্বিত করে তা থেকে কল্যাণ লাভ করেছে।

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সদস্যদের সাহায্য করা গোত্রগুলোর জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। কোন গোত্রের একজন সদস্য দুর্ঘটনাবশতঃ কাউকে হত্যা করলে গোত্রের সকল সদস্যকে যৌথভাবে তার রক্তমূল্য পরিশোধের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এটি ছিল জাহেলিয়াতের আমলে রীতি এবং পারস্পরিক সহযোগিতায় প্রসঙ্গে উল্লেখ করে চুক্তিটি তা অনুমোদন

www.pathagar.com

করেছে ঃ "বর্তমান রীতি অনুযায়ী তারা আগের মতোই রক্তমূল্য পরিশোধ করবে।" এটি ছিল তাদের রক্তমূল্য পরিশোধের প্রচলিত আইন।[৬৩] অনুরূপভাবে যুদ্ধের সময় বন্দী যেকোন সদস্যের মুক্তিপণ গোত্রকে পরিশোধ করতে হবে। বন্দীদের মুক্ত করার ক্ষেত্রে তারা সদয় আচরণ করবে" (৩নং ধারা)। দলিলে সম্মিলিত দায়িত্ব পালনের উপর গুরুত্ব প্রদান এবং মদীনার সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার দায়িত্ব সকল ঈমানদারের বলে গণ্য করা হয়। এটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) আইনভঙ্গকারীদের উপর নজর রাখা ও শাস্তি বিধানের জন্য পুলিশ বাহিনীর মতো কোন সুশৃঙ্খল বাহিনী গঠন করেননি।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ অপরাধীর শাস্তির বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং সে কারণে তা কার্যকর করা হচ্ছে সকল ঈমানদারের জন্য ধর্মীয় কর্তব্য। এতে এই বিধান আবশ্যিক কর্তব্য ও অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছে এবং মানব তৈরী আইনের মতো এই আইন সম্পর্কে কারোর আপত্তি উত্থাপন অথবা লংঘনের ইচ্ছা প্রকাশের যেকোন সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে। দলিলের ১৩ এবং ৩১ নং ধারায় মুমিনদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ১৩নং ধারায় বলা হয়েছেঃ "ঈমানদার খোদাভীরুগণ সর্বক্ষণ ঐসমস্ত অপশক্তিকে প্রতিহত করতে সুসংগঠিত থাকবে, যারা জুলুম, অনাচার ও পাপচর্চার বিস্তার করার জন্য নিয়োজিত হয় এবং ঈমানদারদের মধ্যে ভাঙ্গন, অনৈক্য ও ফিতনা সৃষ্টিতে সচেষ্ট হয়, এসব দুষ্টশক্তির বিরুদ্ধে সকল মুমিনের হাত একটিমাত্র প্রতিবাদী হাত হয়ে উত্তোলিত হবে, যদি এই অপশক্তির কেউ তাদের সন্তানও হয়।"

জালেম শাসক, আগ্রাসী শক্তি, অন্যায়কারী ও ঘুষখোরদের স্তব্ধ করার দায়িত্ব মুমিনদের। "অন্যায় অধিকার বিস্তারের" অর্থ কোন ব্যক্তি কর্তৃক এমন কিছু দাবী করা যে বিষয়ে কোন অধিকার তার নেই।[৬৪] দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে মুত্তাকীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ পরিপূর্ণ ঈমান পোষণকারী এই ব্যক্তিবর্গ শরয়ী বিধি-বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণ ঈমানদারদের চেয়ে অনেক বেশী যোগ্যতার অধিকারী, বস্তুত পক্ষে শুধুমাত্র মৌলিক দিকের উপর ঈমান পোষণকারীদের পক্ষে গোনাহের কাজ ও পদ স্খলনের আশংকা থেকে যাওয়ায় তাদেরকে এ ধরনের দায়িত্বে নিয়োজিত করা থেকে বিরত রাখা হয়।[৬৫]

২১ নং ধারায় বলা হয়েছে ঃ "কোন সঙ্গত কারণ ছাড়া কেউ একজন ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যার জন্য দায়ী হলে তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করা

www.pathagar.com

হবে।" যার অর্থ হচ্ছে, কোন উপযুক্ত কারণ ছাড়া যদি কাউকে হত্যা করা হয় এবং নিহত ব্যক্তির পরিবার কিসাসের পরিবর্তে রক্তমূল্য গ্রহণ অথবা তাকে ক্ষমা করে দেয়ার সিদ্ধান্ত না নেয় তা'হলে এ হত্যার বদলে খুনীকে হত্যা করতে হবে।[৬৬] নিহত ব্যক্তির পরিবার বদলা হিসেবে তাকে হত্যা করতে অথবা রক্তমূল্য গ্রহণ করার যে কোন একটি করতে চাইলে খুনীর পরিবারসহ সকল মুসলমানের কর্তব্য হবে লোকটি সম্পর্কে তাদের রায় কার্যকর করতে সহায়তা করা। হত্যাকারী কোন ব্যক্তিবর্গের যতই ঘনিষ্ঠজন হোকনা কেন তাদের কেউই তাকে রক্ষায় এগিয়ে আসতে পারবে না কারণ "এই দলিলে আস্থাশীল এবং আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী মুমিনের জন্য কোন অপরাধীকে সাহায্য করা অথবা আশ্রয়দান কোনক্রমেই বৈধ হবে না। কেউ এ ধরনের কাজ করলে এবং এজন্য তওবা না করলে অথবা কাফফারা প্রদান না করলে রোজ হাশরের দিনে তার উপর আল্লাহর লানত ও ক্রোধ বর্ষিত হবে।" একজন অপরাধী আল্লাহর আইন লংঘন করে এবং কেউই তাকে শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। কেউ যদি অপরাধীকে আশ্রয় দেয়, তাহলে তার উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হবে এবং তিনি তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন। কোন ব্যক্তি অপরাধীকে সাহায্য করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন না এবং তার দেওয়া কোন কাফফারাও গ্রহণ করবেন না।[৬৭]

মুসলমানদের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য নিজেদের মধ্যকার অভাবী লোকদের (মুফরাহ) সাহায্য-সহযোগিতা করা জরুরী (মারাত্মক ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে বলা হয় মুফরা)।[৬৮] কেউ যুদ্ধবন্দী হলে তাকে মুক্তিপণের অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে হবে। দুর্ঘটনাবশত কেউ কাউকে হত্যা করে বসলে ১২নং ধারা অনুযায়ী তারা তার পক্ষ থেকে রক্তমূল্য পরিশোধ করবে। ইবনে সা'দের মতে, অভাবী (মুফরাহ) হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে সমাজের মধ্যে বসবাস করে কিন্তু তার কোন পৃষ্ঠপোষক (মওলা) নেই।[৬৯] এটা স্পষ্ট যে গোত্রীয় সৌভ্রাতৃত্বের (ওয়ালা) সম্পর্কের কারণে কাউকে রক্তমূল্য পরিশোধ ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানে সাহায্য করা হয় কিন্তু কোন ব্যক্তির গোত্র বা পৃষ্ঠপোষক না থাকলে সকল মুসলমানই তার পৃষ্ঠপোষক এবং তারা তাকে সাহায্য করতে বাধ্য। সে যদি কোন অপরাধ করে তাহলে তার জন্য সরকারের অর্থভান্ডার থেকে অর্থ পরিশোধ করতে হবে কারণ তাকে সাহায্য করার জন্য কোন গোত্র নেই।[৭০]

১২খ নং ধারায় মিত্রতার মূলনীতির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু এই নীতিতে শরীকদের অধিকার অতিক্রমের কোন অনুমতি প্রদান করা হয়নি, যেমনটি

www.pathagar.com

মুক্ত করা দাসের উপর সাবেক মালিকের অধিকার। সাবেক মালিকের অনুমতি ছাড়া কেউ তাদের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। হাদীসে স্পষ্টত বলা হয়েছে যে ইসলাম পুরানো মিত্রতার সম্পর্ককে স্বীকৃতি প্রদান করেছে এবং নতুন সম্পর্ক স্থাপনে বিরত রেখেছে। এই হাদীসে বলা হয়, "মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেন, জাহেলিয়াতের যুগের প্রচলিত সকল মিত্রতার সম্পর্ক ইসলাম শক্তিশালী করবে তবে ইসলামের এরূপ মিত্রতার কোন সম্পর্ক থাকবে না।"[৭১]

১৪নং ধারায় কাফেরের তুলনায় মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। "একজন মুসলমান একজন কাফিরের বদলা হিসেবে একজন মুসলমান অপর একজন মুসলমানকে হত্যা করতে পারবে না অথবা একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে একজন কাফেরকে সাহায্য করতে পারবে না।" এতে একথাই ফুটে উঠেছে যে একজন কাফের ও একজন মুসলমানের রক্ত সমান নয়। এতে মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও বন্ধুত্বের গুরুত্ব আরোপ এবং কাফেরদের সঙ্গে পুরানো সম্পর্ক ও মিত্রতা ছিন্ন করার উপর জোর দেয়া হয়েছে।

১৭ নং ধারায় একথা স্বীকৃত হয়েছে ঃ "মুসলমানদের মধ্যকার শান্তি অবিভাজ্য। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকা অবস্থায় কোন শান্তি স্থাপিত হবে না। শান্তির শর্তাবলী অবশ্যই সকলের জন্য ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক হতে হবে।" যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপনের দায়িত্ব জনগণের উপর ন্যস্ত নয়, রাসূলের (সা.) উপর। তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করলে সকল মুসলমান দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবস্থায় থাকবেনঃ কেউ শত্রুর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে পারবেন না, কারণ মুসলমানরা একটি অভিন্ন নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য।"[৭২] কেবল একটি গোত্রের পক্ষে যুদ্ধের বোঝা বহন করা সম্ভব নয়। জিহাদের অংশগ্রহণ সকল মুসলমানের জন্য ফরজ ঃ তাই তারা জিহাদে যাবার সুযোগ আসলে তাতে শরীক হয়।[৭৩] "প্রতিটি অভিযানের সময় একজন অশ্বারোহীর পিছনে অবশ্যই আরেকজন অশ্বারোহী থাকবে।" (১৮নং ধারা)।

১৫ নং ধারায় আশ্রয় (জিরার) প্রদানের বিষয় অনুমোদিত হয়েছে। প্রাক-ইসলাম এই নিয়ম প্রচলিত ছিল এবং প্রত্যেক মুসলমানকে আশ্রয় দেয়ার অধিকার প্রদান করা হয়। তার এই অধিকার লংঘনের কর্তৃত্ব কাউকে দেয়া হয়নি। এই ধারায় কেবলমাত্র মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের বিষয় সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে কারণ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সঙ্গে গভীর

www.pathagar.com

অনুরাগ ও সমর্থনের বিষয় জড়িত থাকে। তাই একজন মুসলমান একজন অমুসলমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হতে পারে না। "মুসলমানরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরস্পরের নিরাপত্তা ও আশ্রয়দাতা।"

"হে ঈমানদারগণ, ইহুদী ও খৃস্টানদের নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা। তারা নিজেরা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাহলে সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে..." (আল মায়েদা ৫ঃ৫১)।

"মুমিনগণ যেন কখনো ঈমানদার লোকদের পরিবর্তে কাফেরদের নিজেদের বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক ও সহযাত্রীরূপে গ্রহণ না করে....." (আল ইমরান ৩ঃ২৮)।

তবে ২১ নং ধারায় আওয়াস ও খাজরাজ গোত্রের যেসব লোক মুশরিক ছিল তাদের কর্তৃক কুরাইশদের আশ্রয়দান, তাদের বাণিজ্য বহরের নিরাপত্তা বিধান এবং কুরাইশদের বাণিজ্য বহরের উপর মুসলমানদের বাধাদানের প্রচেষ্টায় অন্ত রায় সৃষ্টি থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়, কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরাইশদের বাণিজ্য বহরে বাধাদানের নীতি অনুসরণে দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। এতে সন্দেহ নেই যে, আওয়াস ও খাজরাজ গোত্রের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান তাদের গোত্রের মুশরিকদের উপর এই রায় কার্যকর করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ইহুদীদের সঙ্গে ইতিপূর্বে শান্তি চুক্তি করার সময় তাদের কাছ থেকে এব্যাপারে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, দুটি পৃথক চুক্তির সমন্বয়ে সনদটি প্রণীত হয়েছে এবং এই বিষয়টির পুনরুক্তিতে সে কথারই সমর্থন প্রতিফলিত হয়েছে।

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে মিত্রতার চুক্তির ধারাসমূহ প্রণীত হবার সময় ইহুদীরা সেখানে উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও চুক্তিতে সেসব ইহুদীদের সঙ্গে সদয় ও ন্যায় আচরণ করার কথা বলা সম্পূর্ণ সম্ভব, কারণ তারা মুসলমানদের মিত্র এবং তাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দানে লিপ্ত ছিল না অথবা কোনরূপ ক্ষতিসাধন করেনি। এই বিষয়টি ইসলামী রাজনীতির নৈতিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামী ব্যবস্থা শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতার স্বীকৃতি দেয় না (১৬নং ধারা)।

দলিলের শেষদিকে ২৩ নং ধারায় মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যকার মিত্রতার প্রসঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মদীনার মুসলমানদের মধ্যে কোনরূপ মতপার্থক্য দেখা দিলে কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিষ্পত্তি করবেন। "তোমাদের মধ্যে কখনো কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে আল্লাহর কিতাব অনুসারে হযরত মুহাম্মদ (সা.) তার চূড়ান্ত ফয়সালা করবেন।"

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র ঃ

১. মদীনার সনদ সম্পর্কে যারা লিখেছেন তারা হলেনঃ ডঃ সালেহ আহমদ আল আলী। তার প্রবন্ধ, "তানজিমাত আল রাসূল আল ইদারিয়া ফি আল মদীনা") মদীনায় রাসূলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা), ডঃ আব্দুল আজীজ আল দূরী, আল নূজুম আল ইসলামিয়া, Serjéant, "The Constitution of Medina", Islamic Quarterly, অষ্টম সংখ্যা (১৯৬৪)ঃ ৩-১৬।

আরও অনেকে এই বিষয়ে লিখেছেন। অধ্যাপক মুহাম্মদ হামিদ উল্লাহ তার গ্রন্থ মাজমুয়াত আল ওয়াসাইক আল সিয়াসিয়া (রাজনৈতিক দলিল সংগ্রহ) তে তাদের কথা উল্লেখ করেছেন।

২. অধ্যাপক ইউসুফ আল আইশ তার গ্রন্থ আল দাউলা আল আরাবিয়া ওয়া সুকুতুহা (আরব রাষ্ট্র ও তার পতন) এর পাদটীকায় এই অভিমত ব্যক্ত করেন। পৃষ্ঠা ২০, পাদটীকা নং ৪। এটি তার অনূদিত গ্রন্থ। মূল লেখক হলেন Wellhausen.

৩. ইবনে হাশিম, আল সীরাত, ১/৫০১-৪।

৪. ইবনে সাঈদ আল নাস, আইয়ুন আল আসর, ১/১৯৭-৮।

৫. ইবনে কাসির, আল বিদাইয়া, ৩/২২৪-৬।

৬. আল সুনুন আল কুবরা, কিতাব আল জিয়াত, ৮/১০৬।

৭. ইনি হলেন আল হাফিজ আল হুজ্জাহ আল ইমাম আহমদ ইবনে আবু খায়সামা জুহায়ের ইবনে হার্ব আল নাসাঈ (২৭৯ হিঃ)। আমরা এই ইতিহাস গ্রন্থের তৃতীয় খন্ড পেয়েছি (দেখুন আকরাম আল উমরী, বুহুস ফি তারিখ আল সুনুন আল মুশাররফা, ৮৭-৯০)।

৮. ইবনে সাঈদ আন নাস, আইয়ুন আল আসর, ১/১৯৮।

৯. হামিদ ইবনে জানজাওয়াও আবু উবায়েদ বর্ণিত অনুরূপ সনদসহ আব্দুল্লাহ ইবনে সালেহর কাছ থেকে দলিলটি বর্ণনা করেন। (দেখুন, ডঃ শাকির জিব ফয়েজ সংশোধিত ইবনে জানজাওয়ার কিতাব আল আমওয়াল, এন, ৭৫০)।

১০. দ্রষ্টব্য, ইবনে হাজরের তাহজিব গ্রন্থে হিব্বানের বর্ণনা, ৮/৪২২।

১১. ইউসুফ আল আইশ, আল দাওলা আল আরাবিয়া ওয়া সুকুতুহা, পৃষ্ঠা, ২০,পাদটীকা, ৯।

১২. আল বালাদুরী, আনসাব, ১/২৮৬, ৩০৪। আল তারাবী, তারিখ আল রাসূল, ২/৪৭৯। আল মাকদিসি, কিতাব আল বাদ ওয়াল তারিখ, ৪/১৭৯। ইবনে হাজম, জাওয়ামী আল সীরাহ, ৯৫, আল মাকরিজী, ইমতা আল আসমা, ১/৪৯, ইবনে কাসির, আল বিদাইয়া, ৪/১০৩-১০৪, মুসাইব ইবনে উকবা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে কাগজে দলিলটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল বনু কুরাইজা তা ধ্বংস করে ফেলে। সনদ ছাড়া এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করা হয় তবে সকল বিবরণ একত্র করলে তা পরস্পরকে শক্তিশালী করে এবং হাসান লি গাইরি পর্যায়ে উপনীত হয়।

www.pathagar.com

১৩. ডঃ সালিহ আল আলী, তানজিমাত আল রাসূল আল ইদারিয়া ফি আল মদীনা, পৃষ্ঠা, ৪- ৫। রচনাশৈলীর তুলনার জন্য দেখুন, মাজমুয়াত ওয়াসাইক আল সিয়াসিয়া।

১৪. ডঃ সালিহ আল আলী অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বদরযুদ্ধের পরও এটি লিখিত হয়। (তানজিমাত আল রাসূল আল ইদারিয়া ফি আল মদীনা,৬)।

১৫. আল আমওয়াল, নং ৫১৮।

১৬. আল বালাদুরী, আনসাব, ১/২৮৬।

১৭. দেখুন আল তাবারীর, তারিখ আল রাসূল, ২/৪০২; আল ওয়াকিদী থেকে বর্ণিত, ইবনে ইসহাক মনে করেন যে হামজার আগে উবায়দা ইবনে আল হারিস-এর সাবিয়া পরিচালিত হয়েছিল দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে। আলতাবারী ও ইবনে ইসহাক উভয়ে একমত হন যে বদরযুদ্ধের আগে প্রথম সাবিয়া পরিচালিত হয়। এটি এই গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। (দেখুন ইবনে হিশাম, আল সীরাত, ১/৫৯৫)।

১৮. আল বালাদুরী, আনসাব, ১/৩০৮।

১৯. আল হাকিম, আল মুস্তাদরাক, ২/৪৮৩। কিতাব আল তাফসির।

২০. আব্দুর রাজ্জাক, আল মুসান্নাফ, ৫/৩৫৭।

২১. আল বায়হাকী, দলিল আল নবুওয়াহ, ৩/৪৪৬-৪৫০। আবু নূয়াইম, দলিল আল নুবুওয়াহ ৩/১৭৬-৭।

২২. ইবনে হিশাম, আল সীরাত, ৩/৬৩৮; সহীহ বুখারী, ৩/১১; মুয়াল্লাক থেকে ইবনে ইসহাক।

২৩. আল ওয়াকিদী, আল মাগাজী ১/৩৬৩; ইবনে সা'দ, আল তাবাকাত, ৩/৫৭।

২৪. আল সীরাত, ৩/৬৮৩।

২৫. সহীহ বুখারী, ৯/১৪, সহীহ আল তিরমিজী ৬/১৪২; ইবনে মাজাহ, আল সুনান, ২/৮৮৭; আহমদ, আল মুসনাদ, ১/৭৯।

২৬. আহমদ, আল মুসনাদ, ১/১১৯, ১২২।

২৭. সহীহ বুখারী, ২/২৯৬।

২৮. সহীহ বুখারী, ২/২৯৬; ইবনে মাজাহ, আল সুনান, ২/৮৮৭।

৩০. আহমদ, আল মুসনাদ, ১/১৯, পিতামহ ও পিতার কাছ থেকে আমর ইবনে শুয়াইবের সনদের উল্লেখ করে এই রেওয়ায়েতে আহমদ বলেন, রাসূলুল্লাহ রায় দেন যে, একজন কাফেরের বদলা হিসেবে একজন মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না, (মুসনাদ, ২/১৭৮), সহীহ বুখারী, ১/১৪,১৬, ইবনে মাজাহ, আল সুনান, ২/৮৮৭, ইবনে আল আরাবী, সহীহ তিরমিজির তফসির, ৬/১৮২-এ হাদীসটির অন্যান্য সনদ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

৩১. সহীহ বুখারী, ৯/১৪; আহমদ, মুসনাদ, ১/৭৯। আরও দেখুন, আল শাওকানি, নাইল আল আবতার, ৭/১০।

৩২. আহমদ, আল মুসনাদ, ১/১১৯ ও ৪/২৭। আরও দেখুন, জাবির থেকে বর্ণিত হাদীসের আল নওয়াবীর তফসিরসহ সহীহ মুসলিম (৯/১৩৬)। রাসূল (সা.) বলেছেন,"আমি মদীনার দুই হারার মধ্যবর্তী সবকিছুর পবিত্র করেছি। কেউ ঝোপঝাড় কাটতে অথবা বন্য প্রাণী শিকার করতে পারবে না....." উমাইয়া শাসনামলে শুরুতে লোকদের কাছে চামড়ার উপর লেখা একটি দলিল ছিল তাতে রাসূল (সা.) মদীনার পবিত্রতার সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। (আহমদ, আল মুসনাদ, ৪/২৭; আল খতিব আল বাগদাদী, তাকাইদ আল ইলম,৭২)।

৩৩. আল শাওকানি, নাইল আল আবতার, ৭/৬১; হামিদ উল্লাহ, মাজমুয়াত আল ওয়াসাক, ১৮৬, এতে বলা হয়েছে যে, ইয়েমেনের গভর্ণর আমর ইবনে হাজমকে লেখা রাসুলুল্লাহর চিঠি থেকে একথা উদ্ধৃত করা হয়।

৩৪. আল শাওকানি, নাইল আল আবতার, ৭/১০।

৩৫. Serjeant, তার নিবন্ধ "The Constitution of Madina"-এ এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

৩৬. ইবনে কাসির, আল বিদাইয়া, ৩/২২৪, তিনি বলেন, ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ এই রেয়ায়েত বর্ণনা করনে।

৩৭. আহমদ, আল মুসনাদ, ১/৩৭১, ২/২০৪। ইবনে কাসির (আহমদ থেকে বর্ণিত), আল বিদাইয়া, ৩/২২৪।

৩৮. মাজমুয়াত আল ওয়াসাইক আল সিসাসিয়া, পৃষ্ঠা, ৪১-৪৭।

৩৯. আবু উবায়েদ, আল জামওয়াল, ২৯৬।

৪০. প্রাগুক্ত।

৪১. আবু ইউসুফ, আল রা'দ আলা সিয়ার আল আওজাত, ৪০।

৪২. আল বায়হাকী, সুনান, ৯/৫৩।

৪৩. ইবনে হাজর, তাহাজিব, ২/৩০৪-৩০৮।

৪৪. আল তিরমিজী, সুনান, ৭/৪৯।

৪৫. আল জায়ালাই, নসর আল বাইয়াহ, ৩/৪২২।

৪৬. আল বায়হাকী, সুনান, ৯/৫৩।

৪৭. আল ওয়াকিদী, কিতাব আল মাগাজী, ২/২৮৪।

৪৮. আল বায়হাকী, সুনান, ৯/৫৩, তিনি বলেন এটি মুনকাতি হাদীস এবং এর সনদ জয়ীফ।

৪৯. আল জায়ালই, নসব আল বাইয়াহ, ৩/৪২২।

৫০. তারিখ আল বাগদাদ, ৪/১৬০। তিনি বলেন, আল হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ আল মুকরী

www.pathagar.com

আমাকে জানান যে, আহমদ ইবনে আল ফারাজ আল ওয়ারাকী বর্ণনা করেন যে আবু বকর আহমদ ইবনে (আল রাজিন) বলেন ঃ রিজকুল্লাহ ইবনে মুসাকে পড়ে শোনানোর সময় আমি শুনতে পেয়েছিলাম যে, আবু হুরায়ারা থেকে ইয়াজিদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে জাবির এবং তার থেকে সুফিয়ান ইবনে উইয়ানা বর্ণনা করেন।" একথা সত্য যে ইয়াজিদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে জাবির আবু হুরায়রার সাক্ষাত পাননি, কারণ ইয়াজিদ ৭৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন আর আবু হুরায়রা ইন্তেকাল করেন ৫৭ হিজরীতে।

৫১. আল হাকীম, আল মুস্তাদরাক আলা আল সহীহয়ান, ২/১২২

৫২. আল জায়ালাই, নসব আল বাইয়াহ, ৩/৪২৩।

৫৩. আল বায়হাকী, সুনান, ৯/৩৭।

৫৪. আল ওয়াকিদী, কিতাব আল মাগাজী, ১/২১৫-৬, ইবনে সা'দ, আল তাবাকাত, ২/২৭।

৫৫. ইবনে হিশাম, সীরাত, ২/৬৪।

৫৬. মালিক ইবনে আনাস, আল মদাওয়ান্নাহ আল কুবরা, ৩/৪০।

৫৭. ইবনে হিশাম, সীরাত, ২/৬৪।

৫৮. আবু উবায়েদ, আল আমওয়াল, পৃষ্ঠা ২৯৬।

৫৯. আরও দেখুন, ইজ্জাহ দুরুজা, সীরাত আল রাসূল, ২/১৪৮।

৬০. মুহাম্মদ হামিদউল্লাহ, মাজমুয়াত আল ওয়াসাইক ৪৪১-৪২।

৬১. খলিফা, আল তারিখ, ৩২-৪২; ইবনে হিশাম, সীরাত, ১/৫৫০।

৬২. ইবনে তাইমিয়া তার কিতাব আকিদা আল সিরাত আল মুস্তাকিম (সরল পথের শর্তাবলী) এ এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করেছেন।

৬৩. আবু উবায়েদ, আল আমওয়াল, ২৯৪; ইবনে আল আসির, আল নিহাইয়া ফি গারিব আল হাদীস ওয়াল আসার, ৩/২৯১। আরও দেখুন, আল জারকানি আল মালিকী কর্তৃক আল কাস্তালানির আল মাওয়াহিব আল লাদুনিয়া-এর তফসির, ৪/১৬৮; ইবনে মঞ্জুর, লিসান আল আরব, আকালা খন্ড।

৬৪. ইবনে আল আসির, আল নিহাইয়া ফি গারিব আল হাদীস ওয়াল আসার, ২/১১৭; আল মাওয়াহিব আল লাদুনিয়া সম্পর্কে আল জারকানির তফসির, ৪/১৬৮; ইবনে মাঞ্জুর, লিসান আল আরব, দানিয়া খন্ড।

৬৫. আল কাস্তালানির আল মাওয়াহিব আল লাদুনিয়া সম্পর্কে আল জারকানির তফসির ৪/১৬৮।

৬৬. ইবনে আল আসির, আল নিহাইয়া ফি গারিব আল হাদীস ওয়াল আসার, ৩/৪২৪; আল কাস্তালানির আল মাওয়াহিব আল লাদুনিয়া সম্পর্কে আল জারকানিয়া তফসির, ৪/১৬৮-৯; আল শাওকানি, নাইল আল আবতার, ৮/৬১।

www.pathagar.com

৬৭. আবু উবায়েদ, আল আমওয়াল, ২৯৬।

৬৮. ইবনে হিশাম, আল সীরাত, ১/৫০২; আবু উবায়েদ, আল আমওয়াল, ২৯৪; ইবনে আল আসির, আল নিহাইয়া ফিগারিব আল হাদীস ওয়াল আসার, ৩/৪২৪; ইবনে মনজুর, লিসান আল আরব ফাবিহা খন্ড।

৬৯. ইবনে সা'দ, আল তাবাকাত, ১/৪৮৬।

৭০. ইবনে মঞ্জুর, লিসান আল আরব, ফাবিহা খণ্ড।

৭১. আল মুসনাদ-এ আহমদ বর্ণনা করেন, ১/১৮০, ২/২১৫ তিরমিজিও এই বিষয়টি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এটি হাসান সহীহ হাদীস। দেখুন, আল তিরমিজি, আল সুনান, ইবনে আল আরাবী আল মালিকী-এর তাফসির, ৭/৮৩।

৭২. আল কাস্তালানী-এর মাওয়াহিব আল লাদুনিয়াহ-এর আল জালকানির তফসির, ৪/১৬৮।

৭৩. ইবনে আল আসির, আল নিহাইয়াহ ফি গারিব আল হাদীস ওয়া আল আসার, ৩/২৬৭; আল কাস্তালানীর আল মাওয়াহিব-এর আল জালকানীর ব্যাখ্যা, ৪/১৬৮; ইবনে মঞ্জুর, লিসান আল আরব, আকাবা অধ্যায়।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

ইহুদীদের চুক্তিভঙ্গ এবং মদীনা থেকে তাদের বহিষ্কার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের সঙ্গে যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন ইহুদীরা তা মেনে চলেনি। স্বাক্ষরের পরেই তারা চুক্তিটি ভঙ্গ করে। ইহুদীরা কেবল চুক্তিতে বর্ণিত তাদের দায়িত্ব পালনেই অবহেলা করেনি উপরন্তু আগ্রাসীদের মতো আচরণ করেছিল। এই কারণে তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হয়। আমরা এখন এই ঘটনা পর্যালোচনা এবং এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ বিশ্লেষণ করবো।

বনু কায়নুকার বহিষ্কার[১]

অভিযানের তারিখ

এই ঘটনার তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা একমত হয়েছেন যে বদরযুদ্ধের পরে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। আল জুহুরী বলেছেন, দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে তাদেরকে বহিষ্কার করা হয় আর আল ওয়াকিদী বলেছেন যে শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়ে শনিবারের দিন এই ঘটনা ঘটে।[২]

অভিযানের কারণ

সীরাত গ্রন্থসমূহে বহিষ্কারের পটভূমি ও কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে বদরযুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের কারণে বনু কায়নুকার ইহুদীরা তাদের উপর রুষ্ট হয় ও হিংসা পোষণ করে এবং তাদের এই মনোভাব প্রকাশ্য বৈরিতায় রূপান্তরিত হয়।

বহিষ্কারের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা উপলব্ধি করতে হলে কয়েকটি ঘটনা বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইহুদীদেরকে একটি স্থানে সমবেত করে তাদেরকে নসিহত করার চিন্তা করেন। তিনি বনু কায়নুকার উন্মুক্ত বাজার এলাকায় এই সমাবেশের আয়োজন করলেন, তিনি বললেন, "হে ইহুদীগণ কুরাইশদের ভাগ্যে যা ঘটেছে আপনাদের ক্ষেত্রে তা ঘটার আগেই ইসলাম গ্রহণ করুন।" তারা জবাবে বললেন, "হে মুহাম্মদ, আপনি হয়ত আমাদেরকে আপনার লোকদের মতো বলে মনে করছেন। কুরাইশদের যুদ্ধানভিজ্ঞ একদল লোককে পরাজিত করা এবং তাদের চেয়ে উন্নততর রণকৌশল আয়ত্ত করার কারণে

www.pathagar.com

আপনার বিভ্রান্ত হওয়া উচিত হবে না, খোদার কসম! আপনি যদি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন, তাহলে সত্যিকারের বীর কাদের বলে, তাদের সাক্ষাত পেতেন এবং একথা উপলব্ধি করতে পারতেন যে আপনারা কখনো আমাদের মতো লোকদের মুখোমুখি হননি।" চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ইহুদীরা রাসূলের নেতৃত্বকে মেনে নেয়া সত্ত্বেও তাদের এই জবাবে স্পষ্টত একটা ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও হুমকি প্রদানের বিষয় সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল। ইবনে ইসহাক এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন।[৩] ইবনে হাজর বলেছেন, "এটি হাসান হাদীস।[৪] তবে এর সনদে জায়েদ ইবনে সাবিতের আজাদ করা গোলাম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ রয়েছেন, খোদ ইবনে হাজর তাকে মজহুল (অপরিচিতি)[৫] বলে উল্লেখ করেছেন।

আমরা ইবনে হাজরের রেওয়াতকে হাসান হিসেবে গ্রহণ করলেও এর অর্থ এই বুঝাবেনা যে ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানোর জন্য বনু কায়নুকাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, কারণ ঐ পর্যায়ে ইসলাম মুসলমানদেরকে ইহুদীদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করার অনুমোদন প্রদান করেছিল এবং ইহুদীদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়কে শর্তে পরিণত করা হয়নি, বরং চুক্তিতে ইহুদীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছিল। বনু কায়নুকার আগ্রাসী মনোভাবের পরিচয় দেওয়ায় তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়। মদীনার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধিমালা লংঘনের জন্য তাদেরকে বহিষ্কৃত হতে হয়।

এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, বনু কায়নুকার একজন সদস্য তাদের নিজেদের বাজার এলাকায় একজন মুসলিম মহিলার পোশাকের এক প্রান্ত ধরে এমনভাবে সজোরে টান দেয় যে তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন এবং বিবস্ত্র হয়ে যান। তার আর্তনাদ শুনে একজন মুসলমান পুরুষ এগিয়ে আসেন এবং অপরাধী ইহুদীকে হত্যা করেন। এরপর ইহুদীরা একজোট হয়ে এই মুসলমান লোকটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে হত্যা করে।[৬] নিহত ব্যক্তির পরিবার ইহুদীদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্য মুসলমানদের কাছে আবেদন জানায়। এই ঘটনায় মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হয় এবং তাদের ও বনু কায়নুকার মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি পায়। হাদীসটি জয়ীফ কারণ এই সনদে ইবনে হিশাম ও আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর আল মাখরামীর মধ্যে ছেদ পড়েছে এবং শেষ তাবেয়ী আবু আওনের (হাদীস শাস্ত্রে) মর্যাদা কি তা জানা যায়নি। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে তার বর্ণনা বিবেচনা করা যেতে পারে এবং সীরাতের অধিকাংশ সূত্রই তাদের গ্রন্থে এটি অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৭] এতে বনু কায়নুকার বহিষ্কার পর্যন্ত ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া গেছে। ইসলাম

www.pathagar.com

গ্রহণ করতে অস্বীকৃতির কারণে তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়নি। তাদেরকে বহিষ্কার করার পিছনে প্রকৃত কারণ ছিল তাদের দ্বারা নিরাপত্তা বিধি লংঘন এবং প্রকাশ্যে দুশমনির সূত্রপাত। এসব ঘটনার কারণে রাসূলুল্লাহ উপলব্ধি করলেন যে তাদের সঙ্গে একত্রে শান্তিতে বসবাস করা সম্ভব নয়।

অবরোধ

বনু কায়নুকার বহিষ্কার সংক্রান্ত এই রেওয়ায়েত সহীহ।[৮] ইবনে ইসহাক ও আল ওয়াকিদী বনু কায়নুকা গোত্রের উপর মুসলমানদের আক্রমণ ও অবরোধ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। ইবনে ইসহাক (আসিম ইবনে উমর ইবনে কাতাদাহ) থেকে এবং আল ওয়াকিদী (সনদ ছাড়াই) এই অভিযান সম্পর্কিত ঘটনা বর্ণনা করেন। হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিস্তারিত বিবরণ সহীহ প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও ঐতিহাসিক ও সীরাত রচয়িতাগণ ঘটনার বিবরণ দেওয়ার সময় তা অবলম্বন করেছেন। অবরোধের বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে এমন বিষয় রয়েছে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ সে সব উদ্ধৃত করার অনুমোদন প্রদান করেছেন, ঐতিহাসিক সমালোচনার পদ্ধতি অনুসারে এসব বিবরণের উপর নির্ভর করা যাবে, কেননা এই পদ্ধতিতে সনদ সহীহ হওয়াকে অপরিহার্য শর্ত হিসেবে পরিগণিত করা হয়নি। তাই ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে এই রেওয়ায়েতের উপর নির্ভর করা যাবে। তবে ইসলামী ধর্মবিশ্বাস ও শরিয়তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন বিবরণ সহীহ বা হাসান পর্যায়ে উত্তীর্ণ নাহলে তাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।

বনু কায়নুকার অবরোধ সম্পর্কিত বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে এই গোত্রের ইহুদীরা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের মিত্র ছিল। তারা ছিল ইহুদীদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী এবং পেশায় ছিল স্বর্ণকার। তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ ও ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রকাশ করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) আশংকা করলেন যে, তারা হয়ত তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। রাসূলুল্লাহ তার অনুপস্থিতিতে মদীনার শাসনভার আবু লুবাবা ইবনে আব্দুল মুন্জিরের উপর ন্যস্ত করেন এবং হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের উপর সাদা পতাকা বহনের দায়িত্ব প্রদান করে বনু কায়নুকা গোত্রকে অবরোধ করেন। জিলকদ মাস শুরু পূর্ব পর্যন্ত ১৫ দিন ধরে অবরোধ বলবৎ থাকে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে অবরোধ আরও কঠোর করলে তারা রাসূলের (সা.) দেয়া রায় মেনে নিতে সম্মত হয়। রাসূলের রায়ে বলা হয়, তিনি বনু কায়নুকার

www.pathagar.com

সম্পত্তি গ্রহণ করবেন এবং তারা তাদের গোত্রের নারী ও শিশুদেরকে নিজেদের সঙ্গে রাখতে পারবে। রাসূলুল্লাহ কায়নুকায় ইহুদীদের বেঁধে রাখার নির্দেশ দিলেন। এসময় তাদের মিত্র আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল রাসূলের (সা.) কাছে তাদের প্রসঙ্গে আলাপকালে বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন ঃ চারশ' নিরস্ত্র ও তিনশ' সশস্ত্র ব্যক্তি আমার জিম্মায় রয়েছে অথচ আপনি একদিনেই তাদের সকলকে হত্যা করতে চান।" আল্লাহর রাসূল তাকে বললেন, "তারা আপনার লোক!"[৯] তিনি তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করার নির্দেশ দিলেন এবং তা কার্যকর করার দায়িত্ব দিলেন উবায়েদা ইবনে আল-সামিতের উপর। ইহুদীরা আজরাত-এ চলে যায়। তাদের সম্পদ আটক করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় মুহাম্মদ ইবনে মুসলেমা আল আনসারীর উপর। গণিমতের মালের একপঞ্চমাংশ রাসূলের[১০] নিজের জন্য রেখে বাকী সম্পদ সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়। বনু কায়নুকার বহিষ্কার সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাজিল হলো ঃ

"কাফেরদিগকে বলে দিন, খুব শিগগিরই তোমরা পরাভূত হয়ে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নীত হবে। সেটা কতইনা নিকৃষ্ট অবস্থান। নিশ্চয় দুটি দলের মোকাবেলার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে আর অপরদল ছিল কাফেরদের, এরা স্বচক্ষে তাদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তিদান করেন। এরমধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য ...." (আল ইমরান ৩ঃ১২-১৩)

অনেক মুফাসসিরে কোরআন অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, নিম্নের আয়াতটিও বনু কায়নুকার মিত্র আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই সম্পর্কে নাজিল হয় ঃ

"হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদের পথ প্রদর্শন করেন না।" (আল মায়েদা ৫ঃ৫১)

এসময়ই উবায়েদা ইবনে সামিত ঘোষণা করেন যে তিনি আল্লাহ ও রাসূলের জন্য তার ইহুদী মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্কে ছিন্ন করছেন ঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইহুদীদের মধ্যে আমার অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে কিন্তু আমি তাদের সে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন

www.pathagar.com

করে আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে ফিরে এসেছি। আমি কেবলমাত্র আল্লাহ ও তার রাসূলকে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছি।"

স্পষ্টত আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির ছিলেন এবং তার অন্তকরণ ছিল মুনাফেকীতে পরিপূর্ণ, অন্যদিকে উবাদা ইবনে আল সামিত রাসূলের শিক্ষায় আপন ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ করে গড়ে তুলেছিলেন, যা তাকে প্রাক ইসলামী গোত্রীয় আনুগত্য, জাহেলী আসাবিয়া, খেয়াল খুশী এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের মোহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে। তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ নিবেদিতপ্রাণ ঈমানদারের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যাকাণ্ড

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে বদরযুদ্ধের পর এবং বনু আল নজীর গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার আগে কা'ব ইবনে আল আশরাফকে হত্যা করা হয়েছিল। আল ওয়াকিদী এই ঘটনার সঠিক তারিখ উল্লেখ করেছেন। তিনি জানান, তৃতীয় হিজরীতে এই ঘটনা ঘটে, হিজরতের ২৫তম মাসের শুরুতে ১৪ই রবিউল আওয়াল তারিখে তাকে হত্যা করা হয়।[১১] কা'ব ইবনে আল আশরাফের পিতা ছিলেন আরব এবং মাতা ছিলেন ইহুদী। তার পিতা ছিল তায়ই গোত্রের সদস্য এবং মাতা আকিলাহ বিনতে আবু আল হাকিক ছিল বনু নজীর গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। তার পিতা তায়ই গোত্রের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে এবং এই গোত্রের একজন রমনীকে বিয়ে করে। কা'ব ছিল একজন কবি। সে নিজেকে ইসলামের একজন দুশমন বলে ঘোষণা করে।[১২] বদরযুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ে তিনি দুঃখ ক্ষোভ ও ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠে। সে মক্কা সফর করে। এই সফরকালে সে রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা এবং বদরপ্রান্তরে নিহত মুশরেকদের শোকগাঁথা রচনা করে কাফের কুরাইশদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে।[১৩] এরপর মদীনায় ফিরে এসে সে মুসলিম মহিলাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে অশ্লীল কবিতা রচনা করে।[১৪] তাই রাসূল (সা.) তাকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। আল বুখারী তার হত্যার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন যার সারসংক্ষেপ হলো ঃ মুহাম্মদ ইবনে মুসলেমা আল আনসারী রাসূলের আদেশ কার্যকর করতে প্রস্তুত বলে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। কা'ব তার কর্মকান্ডে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল তাই যেকোন মুসলমান নির্দ্বিধায় তাকে হত্যা করতে পারতেন। রাসূলুল্লাহ মুসলেমাকে কা'বের সঙ্গে ছলনা করার কৌশল অবলম্বনের অনুমতি প্রদান করেন। মুহাম্মদ ইবনে মুসলেমা কা'বের কাছে যেয়ে কিছু খেজুর ধার

www.pathagar.com

চাইলেন এবং তা দিয়ে রাসূলের দাবী পরিশোধ করবেন বলে জানান। তিনি তাদের (মুসলমানদের) কাছে রাসূলের এই দাবী সম্পর্কে কা'বের নিকট বিড়বিড় করে তার অসন্তোষের বিষয় প্রকাশ করেন। কা'ব জামিন হিসেবে কয়েকজন মহিলা ও শিশুকে সঙ্গে নিতে চাইলো কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে মুসলেমা তাতে রাজী হলেন না কারণ তা তাদের জন্য লজ্জার কারণ হবে। তিনি এর পরিবর্তে একটি অস্ত্র সঙ্গে নেয়ার জন্য তাকে পরামর্শ দিলেন এবং কা'ব তাতে রাজী হলো। রাতে মুহাম্মদ ইবনে মুসলেমা অপর সাহাবী আবু নায়েলাকে সঙ্গে নিয়ে কা'বের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। আবু নায়েলা ছিলেন কা'বের পালিত (রাদা'হ) ভাই। তাদের সঙ্গে আরও তিনজন সাহাবী ছিলেন। তারা যেয়ে কা'বকে ডাক দিলেন এবং সে বেরিয়ে এসে তাদের সঙ্গে হাটতে শুরু করলো। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী কা'বের মাথায় সুগন্ধ শোকার ছলে তারা তলোয়ার দিয়ে তার মাথায় আঘাত করেন। তাদের আক্রমণ এমন প্রচন্ড ছিল যে তাদের একজন সঙ্গীও এসময় আহত হন।[১৫] ইহুদীরা এই হত্যার বিরুদ্ধে নালিশ জানালো। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে কা'বের দুশমনি ও মিথ্যা কলঙ্ক রটনা সম্পর্কে অবহিত করেন। কা'বের হত্যার ঘটনায় ইহুদী ও অবশিষ্ট কাফেররা আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আশংকা বোধ করে। রাসূল (সা.) তাদের ও তার নিজের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের আমন্ত্রণ জানান এবং এরপর একটি বিস্তারিত লিখিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আবু দাউদ এই বর্ণনা দিয়েছেন, যা চূড়ান্ত ঐতিহাসিক প্রামাণ্য তথ্য হিসেবে গণ্য হবার জন্য যথেষ্ট। অন্যান্য রেওয়ায়েতেও এই ঘটনার সমর্থন রয়েছে।[১৬] বদরযুদ্ধের আগে মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তার প্রতি সমর্থনের জন্য এই দলিল প্রণীত হয়, কারণ কা'বের হত্যার পর ইহুদীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

কা'ব ইবনে আল আশরাফের হত্যার ঘটনা আপাত দৃষ্টিতে বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই ঘটনা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বনু নজীর গোত্রের ইহুদী ও অন্যান্যের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী সেও চুক্তির পক্ষ ছিল। রাষ্ট্রের প্রধান রাসূলুল্লাহর নামে দুর্নাম রটনা এবং মুসলমানদের শত্রুদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ (নিহতদের জন্য শোকগাঁথা রচনা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা ছড়িয়ে) করে কা'ব ইবনে আল আশরাফ চুক্তি ভঙ্গ করেছিলো, তাই তাকে হত্যা করা অন্যায় ছিলনা। মুসলমানদের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ ঘোষণা করলে রাসূলের অনুমতিক্রমে কোন ব্যক্তিকে তার বিশ্বাসভাজন লোকদের দ্বারা ছলনার মাধ্যমে এভাবে হত্যা করা বৈধ (জায়েজ)।[১৭] রাসূলুল্লাহ (সা.) অবশ্য কা'ব

www.pathagar.com

ইবনে আল আশরাফের দুষ্কর্মের জন্য বনু নজীর গোত্রকে দোষী সাব্যস্ত করেননি। তার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাকে হত্যা করাই যথেষ্ট ছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ কার্যত তাদের সঙ্গে (বনু নজরীর) চুক্তিটি নবায়ন করেন। কিন্তু কা'বের হত্যার ঘটনা তাদের মনে এমন গভীর দাগ কেটেছিল যে চুক্তি নবায়ন সত্ত্বেও তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছিল। শুভেচ্ছা নয়, ভীতিই যে তাদেরকে চুক্তি নবায়নে বাধ্য করেছিল নিম্নোক্ত ঘটনাবলী থেকে সেকথাই প্রমাণিত হচ্ছে।

বনু নজীরের বহিষ্কার

অভিযানের তারিখ

সহীহ সনদসহ দু'টি হাদীসে বলা হয়েছে যে, বদরযুদ্ধের পর বনু নজীরের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

১ আল জুহুরী এ সংক্রান্ত প্রথম রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালিক রাসূলের একজন সাহাবীর কাছ থেকে আমাকে একথা জানান।[১৮]

২ উরওয়া আয়েশা (রাঃ)[১৯] থেকে দ্বিতীয় রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন। আল বায়হাকী অবশ্য বলেছেন, আয়েশা (রাঃ) সুনির্দিষ্টভাবে এর উল্লেখ করেননি (গায়ের মাহফুজ) তবে আল দাহাবী বলেন, তিনি সুনির্দিষ্টভাবে বিষয়টি উল্লেখ করেন। আমি মনে করি যে নির্ভরযোগ্য হাদীস বিশারদগণ এই নাম উল্লেখ করেছেন এবং তা গ্রহণযোগ্য। একমাত্র বায়হাকী এই রেওয়ায়েত মুরসাল হবার কারণ উল্লেখ করেছেন। উরওয়াহ একটি মুরসাল হাদীস বর্ণনা করে বলেন, বদরযুদ্ধের ছয় মাস পরে এই অভিযান চালানো হয়েছিল।[২০]

উরওয়া থেকে বায়হাকীর অপর এক রেওয়ায়েতে আভাস পাওয়া গেছে যে তৃতীয় হিজরীর মুহররম মাসে এই ঘটনা ঘটে। এই রেওয়ায়েত প্রথম রেওয়ায়েতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কারণ দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ই রমজান বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসা ইবনে উকবাহ এই তথ্য বর্ণনা করেন।[২১]

উরওয়াহ ছিলেন উচ্চতম মর্যাদার অধিকারী দ্বিতীয় প্রজন্মের তাবেয়ী এবং মুসা ছিলেন তাবেতাবেয়ী। তাদের পর্যন্ত সনদে এমন কয়েকজন ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যাদের জীবনী আমি খুঁজে পাইনি। তা নাহলে এই রেওয়ায়েত হাসান বলে বিবেচিত হতো।

ইবনে ইসহাক বলেছেন, হিজরী চতুর্থ বর্ষে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।[২২] আল ওয়াকিদী ও ইবনে সা'দ সনদ ছাড়া বর্ণনা করেন যে হিজরতের

www.pathagar.com

৩৭তম মাস রবিউল আওয়ালে এই অভিযান চালানো হয়।[২৩] ইবনে হিশামও রবিউল আওয়াল মাসে এই ঘটনা সংঘটিত হবার প্রশ্নে তাদের সঙ্গে একমত পোষণ করেন।[২৪] অধিকাংশ সীরাত রচয়িতা এই অভিযানের তারিখ সম্পর্কে ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকে গ্রহণ করেছেন।[২৫] ইবনে আল কাইয়ুম নিশ্চিত হয়েছেন যে আল জুহুরী বদর যুদ্ধের ৬ মাস পরে এই অভিযান পরিচালনার তারিখ উল্লেখের ক্ষেত্রে হয় বিভ্রান্ত হয়েছেন নতুবা ভুল করেছেন। ইবনে হাজরের মতে হাদীস সহীহ হওয়ার মানদন্ডের দিক থেকে ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত থেকে আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে কাবের রেওয়ায়েত অধিকতর শক্তিশালী। তবে তিনি এই অভিমতও প্রকাশ করেছেন যে দুর্ঘটনাবশত নিহত বনু আমীরের দুই ব্যক্তির রক্তমূল্য আদায়ের সঙ্গে বনু নজীরের বহিষ্কারের সংযোগ থাকলে আমাদেরকে ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকে গ্রহণ করতে হবে, কারণ সকল বিশেষজ্ঞই একমত হয়েছেন যে ওহুদ যুদ্ধের পর বির মা'উনার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল।[২৬]

পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসিরে এই অভিযানের তারিখ সম্পর্কে অন্যান্য বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে ঃ

> "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের দিকে স্বীয় হস্তপ্রসারিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল, তখন তিনি তাদের হস্ত তোমাদের থেকে প্রতিহত করে দিলেন। আল্লাহকে ভয় করো এবং ঈমানদারগণের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত" (আল মায়েদা ৫ঃ১২)।

বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে বনু নজীর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার অতি সন্নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল এবং আল্লাহ তার রহমতে অভিষিক্ত করে তাকে হেফাজত করেন, আর এই আয়াত বনু নজীর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। এসব বর্ণনায় কিছু দুর্বলতা রয়েছে তবে অন্যান্য বর্ণনার সঙ্গে একত্রে সমন্বিত করলে সেগুলো পরস্পরের যথার্থতা প্রতিপন্ন করে এবং একটি অকাট্য দলিল হিসেবে প্রমাণিত হয়।[২৭] ধারাবাহিক বর্ণনা ইবনে ইসহাকের অভিমতকে সমর্থন করছে, কিন্তু এরপরও "বুন নজীরের বিরুদ্ধে কখন অভিযান পরিচালিত হয়েছিল" সে প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট জবাব পাওয়া যায়নি। ইবনে হাজর এই সম্পর্কিত বিভিন্ন বর্ণনা বিশ্লেষণ এবং কোন রেওয়ায়েত অধিকতর বলিষ্ঠ তা স্থির করলেও এ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেননি। তিনি বলেছেন যে বনু আমীরের দুই ব্যক্তির হত্যার সঙ্গে বনু নজীরের বহিষ্কারের ঘটনার সম্পর্ক থাকার বিষয় প্রমাণিত হলে ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য

www.pathagar.com

বিবেচিত হতে পারে। দৃশ্যতঃ দুর্বলতা সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক বিবরণে ইবনে ইসহাকের অভিমত সমর্থিত হয়েছে আর এই কারণেই সম্ভবত ইবনে হাজর এ ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেননি। ঐতিহাসিক ঘটনা বিবেচনার ক্ষেত্রে হাদীসের মানদন্ড প্রয়োগে নমনীয়তা অবলম্বন করা হয় এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞের বিশেষ দৃষ্টিকোণ গ্রহণ ও মাগাজী বিশেষজ্ঞগণের অভিমতকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

অভিযানের কারণ

তিনটি সূত্রে এই অভিযান সম্পর্কে তিনটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে।

১। বদরযুদ্ধের পর বনু নজীর রাসূলকে হত্যার চক্রান্ত করে। বিভিন্ন সূত্রে দুটি চক্রান্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কুরাইশরা বনু নজীরকে লেখা একটি চিঠিতে হুমকি দেয় যে তারা যদি রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে তাহলে তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবে। এরপর বনু নজীর তাদের প্রথম চক্রান্ত করে। বনু নজীর তাদের দূরভিসন্ধি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে বিশ্বাসঘাতকতার পন্থা বেছে নেয়। ইহুদীরা তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের লক্ষ্যে ৩০ জন সাহাবীসহ যাওয়ার জন্য রাসূলকে আমন্ত্রণ জানায়। তারা অনুরূপ সংখ্যক রাব্বীকে নিয়ে মদীনার কেন্দ্রস্থলে সমবেত হয়ে রাসূলের কথা শুনবে এবং রাব্বীগণ তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করলে সকল ইহুদী ইসলাম গ্রহণ করবে বলে অঙ্গীকার করে। প্রস্তাব দেয় যে রাসূলুল্লাহ ও তার তিনজন সাহাবী তাদের তিনজন রাব্বীর সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং তিনি তাদেরকে স্বধর্ম মতে আনতে পারলে বনু নজীরের সকল সদস্য ইসলাম গ্রহণ করবে। এই তিন রাব্বী ছুরি বহন করছিলেন, কিন্তু একজন ইহুদী মহিলা ইসলাম গ্রহণকারী তার ভাইয়ের কাছে তাদের চক্রান্তের কথা আগেই প্রকাশ করে দেয় এবং তিনি রাসূলকে (সা.) তা অবহিত করেন, ফলে রাসূল তাদের সাথে সাক্ষাত না করেই ফিরে যান। এরপর তিনি তাদেরকে অবরোধ করেন। উটের পিঠে করে অস্ত্র ছাড়া যা কিছু নিয়ে যাওয়া সম্ভব তা নিয়ে বহিষ্কৃত হওয়ার রাসূলের নির্দেশে সম্মত না পর্যন্ত তাদের উপর অবরোধ বহাল ছিল। তারা চলে যাওয়ার সময় ঘরের দরজা পর্যন্ত সঙ্গে করে নিয়ে যায়। এই বর্ণনার সনদে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ নির্ভরযোগ্য, অবশ্য সাহাবীর নাম জানা যায়নি, এতে সনদের অকাট্যতা ক্ষুণ্ন হয়নি (কারণ সকল সাহাবীই নির্ভরযোগ্য)।[২৮]

২। ইবনে ইসহাক তাদের দ্বিতীয় চক্রান্তের কথা বর্ণনা করেন। অধিকাংশ সীরাত রচয়িতা তাকে অনুসরণ করেছেন। চুক্তির শরীক একটি গোত্রের দু'ব্যক্তির

www.pathagar.com

রক্তমূল্য পরিশোধে সাহায্যের অনুরোধ জানাতে রাসূল বনু নজীর গোত্রের কাছে যান। এই গোত্রের আমর ইবনে উমাইয়া দামারী আল রাজীর ঘটনার পর ভুলবশত এই হত্যাকান্ড ঘটায়। রাসূল বনু নজীর গোত্রের কাছে যেয়ে একটি দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেন, এ সময় তারা উপর থেকে একটি বড় পাথর রাসূলের উপর ফেলে তাঁকে হত্যা করতে যাচ্ছিলো, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে এই চক্রান্তের বিষয় জানতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সে স্থান ত্যাগ করে মদীনায় ফিরে আসেন। মদীনায় ফিরেই তিনি তাদেরকে অবরোধ করার নির্দেশ দেন। ছয় দিন অবরুদ্ধ থাকার পর তারা তাদের উটগুলো যে পরিমাণ মালামাল বহন করতে পারবে তা নিয়ে চলে যাওয়ার শর্তে একটি শান্তি চুক্তিতে সম্মত হয়।[২৯] ইয়াজিদ ইবনে রহমান একজন তাবেতাবেয়ী এবং তার মধ্যদিয়ে এই সনদ সমাপ্ত হয়েছে। অনুরূপ অন্যান্য বর্ণনা তার রেওয়ায়েতকে বলিষ্ঠতা দান করেছে, উপরন্তু মুসা ইবনে উকবার মাগাজীতে উরওয়াহ ইবনে জুবায়েরের একটি রেওয়ায়েতে এই বর্ণনার অনুসৃতি দেখা গেছে।[৩০] মাগাজী রচয়িতা মুসা ইবনে উকবা ইবনে ইসহাকের বক্তব্যের সাথে আরও বলেন ঃ "বুন নজীর কুরাইশদের সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত ছিল, তারা রাসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাদেরকে ইন্ধন যোগাচ্ছিল এবং মুসলমানদের দুর্বলতা সম্পর্কে তাদেরকে তথ্য সরবরাহ করে।[৩১]

আব্দুর রাজ্জাকের রেওয়ায়েতের সনদ ইবনে ইসহাকের সনদের চেয়ে শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও সীরাত রচয়িতাগণ ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। উভয় বর্ণনায় বলা হয়েছে, বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে রাসূলকে হত্যার উদ্দেশ্যে বনু নজীরের চক্রান্তের কারণে মুসলমানরা তাদেরকে অবরোধ করেন। ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, যুদ্ধের জন্য ইন্ধন দান এবং কুরাইশদের তথ্যাদি-সরবরাহের মতো অপতৎপরতা ঠিক কোন সময়ে চালিয়েছিল মুসা ইবনে উকবা বর্ণনায় তা জানানো হয়নি। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কাফেদেরকে উৎসাহিত করার তাদের ভূমিকার কথা সুবিদিত। এর ফলে ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তারা মদীনার উপকণ্ঠে হামলা চালাতে আবু সুফিয়ানকে সাহায্য করেছিল। এই কারণে ওহুদ যুদ্ধের পর মুসলমানরা তাদের ধাওয়া করে, যা গাজওয়াত আল-সুওয়ায়েক নামে পরিচিত। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে কুরাইশদের উত্তেজিত করার ক্ষেত্রে কা'ব ইবনে আশরাফ আল নাজারীর কবিতাগুলো সুপরিচিত। মুসা ইবনে উকবা সম্ভবত মুসলমান ও বনু নজীরের সম্পর্কের অবনতির বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দেয়ার জন্য তার বিবরণে এসব ঘটনা তুলে ধরেছেন। তাদের বিশ্বাসঘাতকতার পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে এর

www.pathagar.com

পরিসমাপ্তি ঘটে। বনু নজীরের একটার পর একটা ষড়যন্ত্র, উস্কানী ও বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনাবলী ছিল তাদের অবরোধ করার প্রত্যক্ষ কারণ।

বনু নজীরের প্রতি রাসূলের বহিষ্কারের হুঁশিয়ারি

হাদীসের দৃষ্টিতে সহীহ কোন রেওয়ায়েতে বনু নজীরের বহিষ্কারের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর হুঁশিয়ারি জানানো কথা জানা যায়নি। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বর্ণিত একটি সহীহ হাদীসে অবশ্য বনু নজীরের বহিষ্কারের ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে।[৩২] আল ওয়াকিদী ও ইবনে সা'দ সনদ বিহীন রেওয়ায়েতে বলেন, "রাসূল ১০ দিনের মধ্যে মদীনা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেন, এরপরও যারা থাকবে তাদের শিরোচ্ছেদ করা হবে। তারা চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয় কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল তাদেরকে বিদ্রোহ ঘোষণা ও অবস্থান করার জন্য উস্কানী দান এবং নিজে তাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। বনু নজীর বিদ্রোহ ঘোষণা করলে মুসলমানরা তাদেরকে অবরোধ করেন।"[৩৩] উরওয়াহ ইবনে আল জুবায়ের ও মুসা ইবনে উকবার মধ্যদিয়ে সমাপ্ত দুইটি রেওয়ায়েতে বনু নজীরের বহিষ্কারের ব্যাপারে রাসূলের হুঁশিয়ারির বিষয় উল্লিখিত হয়েছে।[৩৪]

আমি এই সনদের অন্তর্ভুক্ত কয়েকজন বর্ণনাকারীর জীবনী দেখতে পাইনি।

অধিকাংশ সীরাত গ্রন্থে সনদ ব্যতিরেকে এই হুঁশিয়ারির কথা বর্ণনা করা হয়েছে।[৩৫] কেবলমাত্র দুর্বল রেওয়ায়েতসমূহ (বনু নজীরের সমর্থনে) মুনাফিকদের আচরণের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হওয়ায় তা প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য না হলে কি হবে, বনু নজীর সংক্রান্ত বহু সহীহ রেওয়ায়েতে এই বিষয়টি যথার্থতা প্রতিপন্ন হতে পারে।[৩৬]

বনু নজীরের অবরোধ ও বহিষ্কার চুক্তি

রাসূলল্লাহ (সা.) কর্তৃক বনী নজীর গোত্র অবরোধ করার ঘটনা সম্পর্কে রেওয়ায়েত সহীহ হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তিনি বলেনঃ "আপনারা আমার সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন ও তা মেনে চলার ওয়াদা না করা পর্যন্ত আমি আপনাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেব না।" তারা তাঁর সঙ্গে চুক্তি করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাই রাসূলুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলমানরা দিনভর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। পরের দিন তিনি বনু নজীর গোত্র ত্যাগ করে অশ্বারোহী বাহিনীসহ বনু কুরায়জার কাছে যান। তিনি তাঁর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করার জন্য তাদেরকে আমন্ত্রণ জানালেন এবং তারা তা করলো। তিনি বনু কুরায়জা ত্যাগ করে চলে

www.pathagar.com

আসেন এবং পরের দিন সৈন্যদল নিয়ে বনু নজীরের কাছে আসেন এবং অস্ত্র ছাড়া উটে বহনযোগ্য সামগ্রী নিয়ে চলে যাওয়ার শর্ত সাপেক্ষে বহিষ্কৃত হতে সম্মত না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। বনু নজীরের লোকেরা বাড়ী ফিরে ঘরের দরজাসহ যতদূর সম্ভব জিনিসপত্র নিয়ে চলে যায়। তারা তাদের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে মূল্যবান কাঠগুলোও সঙ্গে করে নিয়ে যায়।[৩৭]

পবিত্র কোরআন[৩৮] ও হাদীস শরীফে[৩৯] বর্ণিত হয়েছে যে বনু নজীরের অবরোধকালে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের কিছু সংখ্যক খেজুর বৃক্ষ কেটে ফেলেন ও পুড়িয়ে দেন।

বহিষ্কার চুক্তিতে বলা হয় যে ইহুদীদের হত্যা করা হবে না, তাদেরকে বাড়ীঘর থেকে বহিষ্কৃত হতে হবে। তারা যাবার সময় অস্ত্র ছাড়া তাদের উট যে সব সমাগ্রী বহন করতে পারবে তারা তা নিয়ে যেতে পারবে, তাদের অস্ত্রশস্ত্র মুসলমানদের জন্য রেখে যেতে হবে। ইহুদীদের সিরিয়ায়[৪০] চলে যাওয়ার সহীহ রেওয়াতের সঙ্গে তাদের খায়বর গমনের ব্যাপারে ইবনে সাদের[৪১] বর্ণনার একটা সমন্বয় বিধান সম্ভব। আমরা জানতে পেরেছি যে হুয়াঈ ইবনে আখতাব, সালাম ইবনে আবু আল হাকীক, কিনানা ইবনে আল রাবী ও অন্যান্য ইহুদী নেতা খায়বর গমন করে অপরদিকে তাদের অধিকাংশই সিরিয়া চলে যায়। ইবনে সা'দের রেওয়ায়েত দুর্বল এবং সনদবিহীন তবে পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে এই বিবরণের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এসব ঘটনা সম্পর্কে শক্তিশালী রেওয়ায়েত রয়েছে। যাতে খায়বরের যুদ্ধ, কিনানার হত্যা, সুফিয়ার গ্রেফতারী এবং সালাম ইবনে আবু আল হাকিকের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। বনু নজীরকে সিরিয়ায় বহিষ্কার করা হয়েছিল এবং তাদের কিছু সংখ্যক খায়বরে যেয়ে বসতি গড়ে তুলেছিল, এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে বর্ণনাগুলোর সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে। ইবনে ইসহাক এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৪২] বনু নজীর গোত্রের যে দুইজন মুসলমান হয়েছিলেন তারা তাদের সম্পত্তি নিজেদের অধিকারে রেখেছিলেন। তারা হলেন, ইয়ামিন ইবনে উমর ইবনে কা'ব এবং আবু সা'দ ইবনে ওহাব।[৪৩] পবিত্র কোরআনের আয়াতে বলা হয়েছে যে বনু নজীরের সম্পত্তি ও খেজুর বৃক্ষরাজী একান্তভাবে রাসূলের সম্পত্তিতে পরিণত হয়।[৪৪] তিনি প্রতিবছর এই সম্পত্তির একটি অংশ নিজের পরিবারের জন্য ব্যয় করতেন এবং বাকী অর্থ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য অস্ত্র ও ঘোড়া ক্রয় করতেন। রাসূল ইহুদীদের জমি মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দেন। তিনি দুজন গরীব আনসারকেও এই জমি দান করেন। তারা হলেন সাহল ইবনে হানিফ ও আবু দুজানা সামাক ইবনে রাশা।[৪৫]

www.pathagar.com

বনু নজীরের বহিষ্কার করার ফলে মদীনায় ইহুদী ও মুনাফিকদের শক্তি খর্ব হয়। বনু কুরায়জা বনু নজীরের অবরোধকালে মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করে খন্দকযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত তারা এই চুক্তি পালনে আগ্রহী ছিল। মুনাফিকরা বনু নজীরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি এবং তারা মুনাফিকদের উপর নির্ভর করার অসারতা উপলব্ধি করতে পারে।

বনু নজীরের বহিষ্কারের মাধ্যমে ইসলাম আরও শক্তিশালী হয় এবং তাদের জমিজমা থেকে সুফল লাভ করে। সে সব মুহাজিরকে এই জমি প্রদান করা হয় যারা এর আগে আনসারদের জমি ও বাড়ীঘরের উপর নির্ভরশীল ছিলেন।

মুশরিকদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বনু নজীরের ভূমিকা

বনু নজীরের ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ অব্যাহত রাখেঃ এই ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণের কারণে তারা মদীনার মুসলমানদের উপর হামলা চালানোর জন্য কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের কাফেরদেরকে উস্কানি দান ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই ঘটনা সম্পর্কে বেশ কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া গেছে। কিন্তু রেওয়াতেগুলো দুর্বল হওয়ার কারণে সেগুলো হয় মুরসাল নতুবা মুনকাতি অথবা সনদের একজন বর্ণনাকারী মজহুল।[৪৬] তবে এই রেওয়ায়েতগুলো একত্রে গ্রন্থিত বা সমন্বিত করলে তা প্রমাণ হিসেবে গ্রহণীয় বিবেচিত হতে পারে এবং পরস্পর পরস্পরকে শক্তিশালী করে। রেওয়ায়েতগুলো উরওয়াহ ইবনে আল জুবায়ের, আসিম ইবনে উমর ইবনে কাতাদাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর ইবনে হাজম, সাঈদ ইবনে আল মুসায়েব এবং মুসা ইবনে উকবা পর্যন্ত পৌঁছে শেষ হয়েছে। তাদের অনেকে বনু নজীরের উস্কানিদাতাদের নাম উল্লেখ করেন। ইবনে ইসহাক তাদের যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেন তারা হলোঃ সালাম ইবনে আবু আল হাকিক, কিনানা ইবনে আবু আল হাকিক আল নাজরী এবং হুয়াঈ ইবনে আখতার আল নাজরী।[৪৭]

বনু কুরায়জার বহিষ্কার

অভিযানের তারিখ

পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসের খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এরপর পঞ্চম হিজরীর জুলকদের শেষে এবং জুলহজ্ব মাসের প্রথম দিকে বন কুরায়জার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হয়।[৪৮] কাতাদাহ, উরওয়া ইবনে জুবায়ের, ইবনে

www.pathagar.com

ইসহাক ও আব্দুর রাজ্জাক এই অভিমত ব্যক্ত করেন।[৪৯] ইমাম মালিক ও মুসা ইবনে উকবার মতে খন্দকের যুদ্ধ চতুর্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। ইবনে হাজমও এই মতের সমর্থক। এই তিন ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের বর্ণিত একটি হাদীসের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ইবনে উমর বলেন, তার বয়স ১৫ বছর হওয়ায় রাসূল (সা.) তাকে খন্দকের যুদ্ধে অংশ নেয়ার অনুমতি প্রদান করেননি।[৫০]

আল বায়হাকী দেখিয়েছেন যে এই দুই মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব। তিনি বলেন, "প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই কারণ তারা একথা বুঝিয়েছেন যে চার বছর পার হবার পর এবং পাঁচ বছর পূর্ণ হবার আগে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।" আল জুহরী ঘোষণা করেন যে ওহুদ যুদ্ধের দু'বছর পর খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সকলেই এই ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে হিজরী তৃতীয় বর্ষের শাওয়াল মাসে ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এর ব্যতিক্রম হলেন তারা যারা হিজরতের পরের বছরের মহররম মাস থেকে হিজরীবর্ষ গণনা শুরু হওয়া উচিত বলে মনে করেন। তারা হিজরতের বছরের রবিউল আওয়াল মাস থেকে সামনের দিকের অবশিষ্ট মাসগুলোকে হিসেবের মধ্যে গণনা করেন না। আল বায়হাকী এখানে একথাই ব্যক্ত করেছেন। ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান আল ফাসাবীর মতে প্রথম হিজরীতে বদর, দ্বিতীয় হিজরীতে ওহুদ, তৃতীয় হিজরীর শাবান মাসে বদর আল মাওইদ এবং চতুর্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের অভিমতের সঙ্গে এই মতের কোন মিল নেই। একথা সুবিদিত যে উমর (রাঃ) ঘোষণা করেন যে হিজরতের বছরে মহররম মাস থেকে হিজরীর বর্ষ গণনা করা হবে তবে মালিকের মতে সে বছরের রবিউল আওয়াল মাস থেকে তা শুরু হওয়া উচিত।

এব্যাপারে তিনটি অভিমত থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে তৃতীয় হিজরীতে ওহুদ যুদ্ধ এবং পঞ্চম হিজরীতে শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, এই মতটিই সঠিক।

আল বায়হাকী ও অপর কয়েকজন বিশেষ ইবনে উমরের হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, ওহুদের যুদ্ধের সময় তার বয়স সবেমাত্র ১৪ বছরে পড়েছিল আর খন্দকের যুদ্ধের সময় ১৫ বছর পার হয়ে ১৬ বছরে পড়েছিল। এটি যুক্তিসঙ্গত। কারণ ওহুদ যুদ্ধ শেষ হওয়ার সময় দুই পক্ষ বদর প্রান্তরে আরেকটি যুদ্ধে (বদর আল মাওইদ) পরস্পরের মোকাবেলা করতে সম্মত হয় কিন্তু এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। আল বায়হাকী বলেছেন ঃ "দুমাস পরে তারা মদীনার অবরোধ করতে এসেছিল, একথা বলা অর্থহীন।"[৫১]

www.pathagar.com

অভিযানের কারণ

রাসূলের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি বনু কুরায়জা ভঙ্গ করায় তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানরা অভিযান চালায়। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে এই বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। রেওয়ায়েতগুলো সমন্বিত করে তাকে অকাট্য দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। মুসলমানরা বিভিন্ন গোত্রের প্রায় ১০ হাজার যোদ্ধার দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে থাকার কঠিন সময়ে হুয়াঈ ইবনে আখতাব আলী নজরী[৫২] চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য বনু কুরায়জাকে প্ররোচিত করে। শক্তিশালী রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, বনু কুরায়জার বিশ্বাঘাতকতার গুজব সত্য কিনা তা যাচাই করার জন্য রাসূল (সা.) জুবায়ের ইবনে আল আওয়ামকে প্রেরণ করেন।[৫৩] এরপর তিনি সা'দ ইবনে মু'য়াজ, সা'দ ইবনে উবাদা, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ও খাইয়াত ইবনে জুবায়েরকে পাঠান।[৫৪] এই চারজন এসে জানান যে এই গুজব সত্য। এই সংবাদে মুসলমানরা অত্যন্ত মর্মাহত হলেন।

ইবনে ইসহাক বনু কুরায়জার বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তি ভঙ্গের ব্যাপারে সনদ বিহীন একটি বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। অধিকাংশ সীরাত রচয়িতাও সনদ ছাড়া এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন।[৫৫] মুসা ইবনে উকবাও সনদ ছাড়া বর্ণনা করেন যে কুরাইশরা যাতে মুসলমানদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করার আগে মদীনা ছেড়ে চলে না যেতে পারে সেজন্য বনু কুরায়জা কুরাইশ ও গতফান গোত্রের ৯০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পণবন্দী হিসেবে আটক রাখার জন্য হুয়াঈ ইবনে আখতাবের কাছে দাবী জানায়। হুয়াঈ এতে রাজী হয় এবং তারা চুক্তি ভঙ্গ করার কথা ঘোষণা দেয়।[৫৬]

খন্দকের যুদ্ধের থেকে ফেরার পর রাসূল (সা.) বনু কুরায়জার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ লাভ করেন।[৫৭] তাই রাসূল সাহাবীদেরকে সরাসরি বনু কুরায়জার এলাকায় যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন, আল্লাহ ওদের শক্ত ঘাঁটি তছনছ করা এবং ওদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারের জন্য জিব্রাইলকে পাঠিয়েছেন।[৫৮] তিনি বনু কুরায়জা এলাকায় পৌঁছেই সকলকে আসরের নামাজ আদায় করার নির্দেশ দেন। (বুখারী[৫৯] ও মুসলিম[৬০] শরীফে বলা হয়েছে, জোহর)। আসরের নামাজের সময়ও অনেকে বনু কুরায়জা এলাকায় যাবার পথে ছিলেন, তাই তাদের কেউ কেউ নামাজ আদায় করলেন বাকীরা বিলম্বে নামাজ পড়লেন, কিন্তু রাসূল কাউকে তিরস্কার করেননি কারণ সকলেই তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী যথাযথভাবে কাজ করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালান। ইবনে ইসহাক বলেন, যারা আসরের নামাজ কাজা করেছিলেন তারা এশার পর তা আদায় করেন।

www.pathagar.com

বিশেষজ্ঞগণ বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় বিধান করে বলেন যে সম্ভবত রাসূলের নির্দেশ লাভের আগে অনেকে জোহরের নামাজ আদায় করেছিলেন এবং অন্যরা তখনো নামাজ আদায় করেননি, তিনি তাদেরকে নামাজ না পড়ার এবং ইতিমধ্যে যারা নামাজ আদায় করেছিলেন, তাদেরকে আসরের নামাজ না পড়ার নির্দেশ দেন। এছাড়া দুটি দলকে সম্ভবত পৃথকভাবে পাঠানো হয়েছিল, প্রথম দলটিকে জোহরের নামাজ এবং দ্বিতীয় দলকে আসরের নামাজ আদায় না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।[৬২]

রাসূল (সা.) তার অনুপস্থিতিতে মদীনা শাসনের জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে মাকতুমকে[৬৩] মদীনার শাসক নিয়োগ করে বনু কুরায়জার এলাকায় যান। এই বর্ণনা সহীহ প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও তা প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।[৬৪]

বহু মুরসাল ঐতিহ্য (আসার) রয়েছে যা পরস্পরকে শক্তিশালী করে হাসান লি গায়রী পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এতে বলা হয় যে মুসলিম বাহিনীর অগ্রভাগ থেকে পতাকা বহনের জন্য আলীকে (রাঃ) পাঠানো হয়েছিল।

বনু কুরায়জার অবরোধ কতদিন স্থায়ী হয়েছিল সে সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে অবরোধ কাল ছিল একমাস[৬৫]

২৫দিন,[৬৬] ১৫দিন[৬৭] অথবা ১০-১৮ দিন। সবচেয়ে শক্তিশালী রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এই অবরোধ কাল ছিল ২৫ দিন। অধিকাংশ মাগাজী রচয়িতা ইবনে ইসহাকের অনুসরণ করে এই অভিমতকেই সমর্থন করেছেন।[৬৯]

অবরোধের সাফল্য ও বনু কুরায়জার পরিণাম

অবরোধ আরও কঠোর করা হলো। বনু কুরায়জার পক্ষে তা অসহনীয় হয়ে উঠলো। তারা আত্মসমর্পণ করতে চাইলো এবং তাদের ব্যাপারে রাসূল (সা.) যে রায় দেবেন তা মেনে নিতে তারা সম্মত হলো। তারা রাসূলের সাহাবী ও তাদের মিত্র আবু লুবাবা ইবনে আব্দুল মুনজিরের সঙ্গে পরামর্শ করলো। তিনি তাদেরকে আভাস দিলেন যে তারা আত্মসমর্পণ করলে তাদেরকে হত্যা করা হবে।

এই কথা বলার জন্য আবু লুবাবা অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন এবং তার তওবা কবুল না হওয়া পর্যন্ত নিজেকে মসজিদে নববীর একটি স্তম্ভের সঙ্গে বেঁধে রাখেন।[৭০]

www.pathagar.com

বনু কুরায়জা সা'দ ইবনে মু'য়াজের সালিশ মেনে নিতে সম্মত হলো। তারা ভেবেছিল যে তাদের ও তার নিজ গোত্র আওয়াসের লোকদের সঙ্গে মিত্রতার কারণে তিনি তাদের প্রতি সদয় হবেন।

খন্দকের যুদ্ধে হাতে তীরবিদ্ধ হয়ে আহত হওয়ার কারণে সা'দ অসুস্থ ছিলেন। তাকে বনু কুরায়জার লোকদের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি রায় দিলেন যে, যোদ্ধাদের হত্যা করা হবে এবং তাদের সম্পত্তি বন্টন করে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ এই রায় অনুমোদন করে বললেন ঃ "তুমি আল্লাহর ফয়সালা অনুযায়ী রায় দিয়েছ।"[৭১] এই রায় প্রদানের মাধ্যমে সা'দ ইবনে মু'য়াজ বনু কুরায়জার সঙ্গে তার মিত্রতার সম্পর্ক ছিন্ন করেন। বনু কুরায়জার সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা এবং অতি সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও এই রায় আওয়াস গোত্রকে মোটেই বিচলিত করলো না। তাদের নেতা সা'দ বনু কুরায়জার প্রতি এই রায় দেয়ায় তারা নির্দ্বিধায় তা মেনে নেয়। মৃত্যুদণ্ড ভোগকারী যোদ্ধার সংখ্যা ছিল ৪০০।[৭২] ইসলাম গ্রহণকারী বনু কুরায়জার তিন ব্যক্তি এই দণ্ড থেকে অব্যাহতি লাভ করেছিলেন।[৭৩] তাদের সম্পত্তিও নিজেদের অধিকারে ছিল। অবরোধকালে চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত ও সাহাবীদের জিম্মায় অবস্থানকারী বনু কুরায়জার অপর তিনজন সদস্যও সম্ভবত মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। এ ব্যাপারে বেশ কয়েকটি রেওয়ায়েত রয়েছে তবে সেগুলোকে অকাট্য দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। বন্দীদেরকে বিনত আল হারিসের বাড়ীতে আটক করে রাখা হয়।[৭৪] মদীনার বাজার এলাকায় গর্ত খনন করে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। তাদেরকে দলে দলে হত্যা করে গর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়।[৭৫] তাদের মধ্যে মাত্র একজন মহিলাকে হত্যা করা হয়েছিল।[৭৬] এই মহিলা একটি পাথর গড়িয়ে দিয়ে রাসূলের সাহাবী খালেদ ইবনে সুয়ায়েদকে হত্যা করেছিল।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের ছেড়ে দেয়া হয়।[৭৭] যোদ্ধাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর রাসূল তাদের সম্পত্তি বন্টন করে দিলেন। স্ত্রী লোকদেরকে মুসলমানদের খেদমতে নিয়োজিত করা হয়।[৭৮] তাদেরকে কিভাবে বন্টন করা হয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ মাগাজী গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। তবে এসব বিবরণকে অকাট্য প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।

ইবনে ইসহাক, ইবনে সা'দ এবং আরও অনেকের মতানুসারে রাসূল (সা.) বন্দী মহিলাদের মধ্য থেকে রায়হানা ইবনে খানাফাকে নিজের জন্য পছন্দ করেন। আল ওয়াকিদী ও তার মতানুসারীরা বলেন যে তিনি তাকে বিয়ে করেছিলেন, তবে প্রথম অভিমতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারে।

www.pathagar.com

সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের কয়েকজনের মধ্যে বনু কুরায়জাকে শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহ অস্বীকার অথবা দুর্বল গণ্য করার একটা প্রবণতা দেখা গেছে।[৭৯] এই রেওয়ায়েত যথার্থ বলে প্রমাণিত হলে মানবিক অনুভূতিকে পীড়িত করবে অথবা ইহুদীবাদী প্রচারণার স্বার্থে কাজ করবে বলে ধারণা পোষণই তাদের এই প্রবণতার পিছনে সক্রিয় রয়েছে। কিন্তু এটি ধর্তব্যের বিষয় নয়। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ইসলামী সূত্রে এই ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে। দু'পক্ষের স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে মদীনাকে রক্ষার ব্যাপারে মুসলমানদের সঙ্গে সযোগিতার পরিবর্তে তারা মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং চুক্তিভঙ্গ করে। এই চরম বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বনু কুরায়জাকে এই কঠোর শাস্তি দেয়া হয়। বর্তমান যুগেও বিভিন্ন জাতি তাদের দুশমনের সহযোগী বিশ্বাসঘাতকদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করছে।

বনু কুরায়জাকে তাদের অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হয়। কারণ তারা মুসলমানদের হত্যা, তাদের সম্পদ লুণ্ঠন এবং নারী ও শিশুদের বন্দী হওয়ার মতো বিপন্ন অবস্থার মধ্যে নিপতিত করেছিল। তারা তাদের কৃতকর্মের জন্যই উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছিল। সুতরাং ঐতিহাসিক সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া অথবা নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত অস্বীকার কোন প্রয়োজন নেই।

তথ্যসূত্র ঃ

১. আমার তত্ত্বাবধানে শায়েখ আকরাম হুসাইন আলী প্রণীত মাররিয়াত ইয়াহুদ আল মদীনা শীর্ষক থিসিস-এ আমি এই বিষয়ে সংগৃহীত গুরুত্বপূর্ণ রেওয়ায়েত দেখতে পেয়েছি এবং এই নিরীক্ষিত বর্ণনাসমূহ সহীহ। এই থিসিস মাস্টার ডিগ্রীর ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য করার জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেন্টের কাছে জমা দেয়া হয়েছে।

আল তাবারী, তারিখ আল রাসূল, ২/৪৭৯-৪৮০।
আল ওয়াকিদী, আল মাগাজী, ১/১৭৬।
ইবনে সা'দ, আল তাবাকাত, ২/২৮-২৯।

২. আল তাবারী, তারিখ আল রাসূল, ২/৪৭৯-৪৮০; আল ওয়াকিদী, আল মাগাজী, ১/১৭৬; ইবনে সা'দ, আল তাবাকাত, ২/২৮-২৯।
৩. ইবনে হিশাম, সীরাত, ২৯৪; আবু দাউদ, সুনান, ৩/৪২৩।
৪. ফতহুল বারী, ৭/৩৩২।
৫. আল তাকরিব, ২/২০৫।
৬. দেখুন, থিসিসঃ "Announcement of the Constitution...."
৭. ইবনে হিশাম, সীরাত ২/৫৬১; আল ওয়াকিদী, আল মাগাজী, ১/১৭৬-৭; ইবনে কাসির, আল বিদাইয়া, ৪/৩-৪; ইবনে সাঈদ আল নাস, আইয়ুন আল আসর, ১/২৯৫।

www.pathagar.com

৮. সহীহ বুখারী, ৩/১২।

৯. ইবনে ইসহাক আসীম ইবনে উমর থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই সম্পর্কে বর্ণনা করেন এবং তাকে দিয়েই তার রেওয়াতের সনদ শেষ হয়েছে (ইবনে হিশাম, আল সীরাত, ২/৫৬২-৩) আসীম একজন নিম্ন পর্যায়ের তাবেঈ। হাদীস বিশারদগণের মানদন্ড অনুযায়ী হাদীসটি জয়ীফ, কিন্তু এটি এক ধরনের খবর যা উদ্ধৃত করার অনুমোদন রয়েছে। এই রেওয়ায়েত বনু কায়নুকার যোদ্ধাদের সংখ্যা উল্লেখ থাকায় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১০. আল ওয়াকিদী, আল মাগাজী, ১/১৭৬-৭। ইবনে সা'দ, আল তাবাকাত, ২/২৯।

১১. আল ওয়াজিদী, আল মাগাজী, ১/১৮৪।

১২. দেখুন; ইবনে হিশাম, আল সীরাত, ২/৫৬৪; ইবনে হাজর, ফতহুল বারী, ৭/৩৩৭।

১৩. আবু দাউদ, আল সুনান, ৩/৪০২।

১৪. ইবনে হিশাম, আল সীরাত, ২/৫৬৪-৫। এর সনদ জয়ীফ। একজন নিম্ন পর্যায়ের তাবেতাবেয়ীর মধ্যদিয়ে সনদ শেষ হয়েছে। কিন্তু আমাদের উদ্ধৃতি যথার্থ হয়েছে, কারণ অন্যান্য সহীহ রেওয়ায়েতে বিষয়টি সমর্থিত হয়েছে।

১৫. সহীহ বুখারী, ৫/৫২-৬২।

১৬. আবু দাউদ, আল সুনান, ৩/৪০২; আল বায়হাকী, দলিল আল নবুওয়াত, ২/৪৬২-৪। আরও দেখুন ইবনে ইসহাকের সীরাত, হাসান সনদসহ বর্ণিত, ১৯৯-২০০।

১৭. দেখুন, আল তাহাবী, মুশকিল আল আসর।

১৮. আব্দুর রাজ্জাক, আল মুসান্নাফ, ৫/৩৫৭; আবু দাউদ, আল সুনান, ২/১৩৯-২৬ কিতাব আল খারাজ ওয়া আল ফাই ওয়া আল ইমারা।

১৯. আল হাকীম, আল মুস্তাদরাক, ২/৪৮৩, কিতাব আল তাফসির।

২০. আব্দুর রাজ্জাক, আল মুসান্নাফ, ৫/৩৫৭।

২১. আল বায়হাকী, দলিল আল নবুবুয়াহ, ৩/৪৪৬-৪৫০; আবু নুয়াইম, দলিল আল নবুবুয়াহ, ৩/১৭৬-৭।

২২. ইবনে হিশাম, আল সীরাত, ৩/৬৮৩; সহীহ আল বুখারী, ৩/১১; ইবনে ইসহাকের মুয়াল্লাকা।

২৩. আল ওয়াকদী, আল মাগাজী, ১/৩৬৩, ইবনে সা'দ, আল তাবাকাত, ৩/৫৭।

২৪. আল সীরাত, ৩/৬৮৩।

২৫. ইবনে আল কাইয়ুম, জাদ আল মা'দ ২/১১০।

২৬. ফতহুল বারী, ৬/৩৮৮-৯।

২৭. আল তাবারীর সনদসমূহ (তারিখ আল রাসূল, ১/১৪৬-৭)। এর কয়েকটির ধারা ইয়াজিদ ইবনে রহমান পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। কয়েকটিতে জয়ীফ মুহাম্মদ ইবনে হামিদ আল রাজী ও সালামা ইবনে আল ফজল আল আবরাশী অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। আল বায়হাকী, দলিল আল নবুবুয়াহ, ৩/৪৪৬-৮, সনদ দুটি উরওয়া ইবনে আল জুবায়ের ও মুসা ইবনে উকবা পর্যন্ত পৌঁছেছে। (তাদের পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে)।

www.pathagar.com

ইবনে কাসির, আল তাফসির, ১৩/৩১, ইবনে ইসহাক, মুজাহিদ ও ইকরিমা থেকে বর্ণিত।

২৮. আব্দুর রাজ্জাক, আল মুসান্নাফ, ৫/৩৫৯-৬০; আরও দেখুন ইবনে হাজর, ফতহুল বারী, ৭/৩৩১; আবু দাউদ, সুনান, ২/১৩৯-৪০; কিতাব আল খারাজ ওয়াল ফায়ই ওয়াল ইমারা।

২৯. ইবনে ইসহাক, আল সীরাত, ৩/১৯১।

৩০. ইবনে হাজর, ফতহুল বারী, ৭/৩৩১।

৩১. প্রাগুক্ত, ৭/৩৩২

৩২. সহীহ আল বুখারী, ৩/১১; সহীহ মুসলিম, ৫/১৫৯।

৩৩. আল ওয়াকিদী, আল মাগাজী, ১/৩৬৩-৭০। তবে আল ওয়াকিদী মাতরুক। ইবনে হিশাম, আল সীরাত, ৩/৬৮২; ইবনে সা'দ, আল তাবাকাত, ৩/৫৭-৮; আল বায়হাকী, দলিল আল নুবুয়াহ, ৩/৪৪৬-৫০, দুটি সনদে চার ব্যক্তি মজহুল অন্তর্ভুক্ত।

৩৪. আল বায়হাকী, দলিল আল নবুবুয়াহ, ৩/৪৪৬-৮; আবু নুয়াইম, দলিল আল নবুবুয়াহ, ৩/১৭৬-৭। তাদের সনদে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল বাগদাদী, আবু আলাকা মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে খালিদ, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ইতার ও আল কাসিম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আল মুগিরা; আমি তাদের জীবনী খুঁজে পাইনি, তবে সনদের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ নির্ভরযোগ্য।

৩৫. আল তাবারী, তারিখ আর রাসূল, ৩/৩৩৪-৫; ইবনে সাঈদ আল নাস, আইয়ুন আল আসর, ৩/৪৮; ইবনে কাসির, আল বিদাইয়া, ৩/৪৫ এবং অন্যান্য সূত্র।

৩৬. ইবনে সাঈদ আল নাস, আইয়ুন আল আসর, ২/৪৯; ইবনে কাসির, আল তাফসির ৪/৩৩০; আর সুয়ুতি, লুবাব আল নুকুল ফি আসাব আল নুজুল, ২১৪।

৩৭. আব্দুর রাজ্জাক, আল মুসান্নাফ, ৫/৩৫৪-৩৬১; আবু দাউদ, আল সুনান, ৩/৪০৪-৭; আল বায়হাকী, দলিল আল নবুবুয়াহ, ৩/৪৪৬। আরও দেখুন, ইবনে হাজর, ফতহুল বারী, ৭/৩৩১।

৩৮. সূরা আল হাশর, (৫৯ঃ৫)।

৩৯. সহীহ আল বুখারী, ৩/১১; আবু দাউদ, আল সুনান, ৩/৩৬; আল তিরমিজি, আল সুনান, (তাফসিরসহ তুহফা আল আহজী), ৫/১৫৭-৮, ইবনে মাজাহ, সুনান, ৩/৯৪৮-৯।

৪০. আব্দুর রাজ্জাক, আল মুসান্নাফ, ৫/৩৫৪-৩৬১।

৪১. ইবনে সা'দ, আল তাবাকাত, ৩/৫৮।

৪২. ইবনে হিশাম, আল সীরাত, সনদ ছাড়া, ৩/৬৮৩; আল বায়হাকীর দলিল আল নবুওয়াহ, ৩/৪৪৬-৯; এই রেওয়ায়েতকে শক্তিশালী করেছে। এর সনদ উরওয়াহ ও মুসা ইবনে উকবা পর্যন্ত পৌঁছে শেষ হয়েছে। এই দুই সনদে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের জীবনী আমরা দেখতে পাইনি।

৪৩. ইবনে হাশিম, আল সীরাত, ৩/৬৮৩, এর সনদ আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর পর্যন্ত উপনীত হয়েছে।

www.pathagar.com

৪৪. "আল্লাহ তাদের কাছ থেকে তার রাসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, সেজন্যে তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, কিন্তু আল্লাহ যার উপর ইচ্ছা, তার রাসূলকে প্রাধান্য দান করেন। আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান" (আল হাশর ৫৯৪৬)। বনু নজীরের সম্পর্কে সূরা আল হাশর নাজিল হয়েছিল (সহীহ আল বুখারী, ৩/১৩১; সহীহ মুসলিম, ৪/৩৪৫)।

৪৫. আব্দুর রাজ্জাক, আল মুসান্নাফ, ৫/৩৫৮-৩৬১; আবু দাউদ, আল সুনান, ৩/৪০৪ এবং ইবনে হিশাম, আল সীরাত, ৩/৬৮৩-৪।

৪৬. ইবনে হিশাম, আল সীরাত, ৩/৭০০-১) আব্দুর রাজ্জাক, আল মুসান্নাফ, ৫/৩৬৮-৩৭৩; ইবনে সা'দ, আল তাবাকাত, ৩/৬৫-৬, ইবনে হাজর, ফতহুল বারী, ৭/৪১২-৪।

৪৭. ইবনে হিশাম, আল সীরাত, ৩/৭০০-৭০১।

৪৮. ইবনে সাদ, আল তাবাকাত, ৩/৭৪; ইবনে হিশাম, আল সীরাত ৩/৭১৫; আল তাবারী, তারিখ আল রাসূল, ৩/৫৯৩; ইবনে সাঈদ আল নাস, আইয়ুন আল আসর, ৩/৬৮।

৪৯. আব্দুর রাজ্জাক, আল মুসান্নাফ, ৫/৩৬৭; ইবনে হিশাম, আল সীরাত, ৩/৬৯৯; আল হায়াশামী, মাজমা আল জাওয়াঈদ, ৬/১৪৩; তিনি আল তাবারানীর কাছ থেকে এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন বলে উল্লেখ করে বলেন, সনদের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ সিকাহ।

৫০. সহীহ আল বুখারী ৩/৩৩, ৭৩ আরও মালিকের অভিমত দ্রষ্টব্য।

৫১. ইবনে কাসির, আল বিদাইয়া, ৪/৯৩-৪; আল সীরাহ আল নবুওয়াহ, ৩/১৮০-১; ইবনে কাইয়ুম, জা'দ আল মা'দ, ৩৮৮-৯; ইবনে হাজর, ফতহুল বারী, ৭/৩৯৩।

৫২. আব্দুর রাজ্জাক, সাঈদ ইবনে মুসায়েব থেকে এই মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেন। এটি সবচেয়ে সহীহ মুরসাল হাদীস। এই বর্ণনা অন্যান্য রেওয়ায়েত কর্তৃক সমর্থিত হলে তা প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে (আল মুসান্নাফ, ৫/৩৬৮-৩৭৩)। আবু নূয়াইম ও সাঈদ থেকে মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেন, (আবু নূয়াইম, দলিল আল নবুওয়াহ, ৩/১৮৩)।

৫৩. সহীহ আল বুখারী, ৩/৩০৬; সহীহ মুসলিম, ৭/১৩৮।

৫৪. ইবনে হিশাম, আল সীরাত, সনদ ছাড়া, ৩/৭০৬।

৫৫. আল ওয়াকিদী, আল মাগাজী, ৩/৪৫৪-৯; আর তাবারী, তারিখ আল রাসূল, ৩/৫৭০-৩; ইবনে হাজম, জাওয়ামী আল সীরাত, ১৮৭-৮; ইবনে আব্দুল বার, আর দুবার, ১৮১-৩; ইবনে সাঈদ আল নাস, আইয়ুন আল আসর, ৩/৫৯-৬০; ইবনে কাসির, আল বিদাইয়া, ৩/১০৩-৪।

৫৬. ইবনে কাসির, আল বিদাইয়া, ৩/১০৩-৪।

৫৭. সহীহ বুখারী, ৩/২৫; আহমদ, আল মুসনাদ, ৬/৫৬, ১৩১, ২৮০।

৫৮. সহীহ বুখারী, ৩/২৪, ১৪৪।

৫৯. প্রাগুক্ত, ৩/২৪।

৬০. সহীহ মুসলিম, ৫/১৬৩।

৬১. ইবনে হিশাম, সীরাত, ৩/৭১৬-৭। এটি মা'বাদ ইবনে কাব ইবনে মালিকের একটি মুরসাল হাদীস। তিনি একজন মকবুল ব্যক্তি।

www.pathagar.com

৬২. ইবনে হাজর, ফতহুল বারী, ৭/৪০৮-৯।

৬৩. ইবনে হিশাম, সীরাত, ৩/৭১৬; ইবনে সা'দ, আল তাবাকাত, ৩/৭৪। (উভয় রেওয়ায়েত সনদ বিহীন)।

৬৪. ইবনে হিশাম, সীরাত, ৩/৭১৬; ইবনে হাজর, ফতহুল বারী, ৭/৪১৩।

৬৫. তাবারী, তারিখ আল রাসূল, ২/৫৮৩, বর্ণনাকারী নিজেই বলেছেন, তা একমাস না ২৫ দিন ছিল সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত নন।

৬৬. আল সা'তি, আল ফতহুল রব্বানী লি তারতির মুসনাদ আল ইমাম আহমদ, ২১/৮১-৩। সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

৬৭. ইবনে সা'দ, আল তাবাকাত, ৩/৭৪। সনদবিহীন।

৬৮. ইবনে কাসির, আল বিদাইয়া, ৪/১১৮-৯; ইবনে হাজর, ফতহুল বারী, ৭/৪১৫। আল জুহুরী থেকে মুসা ইবনে উকবার মুরসাল হাদীস।

৬৯. তাবারী, তারিখ আল রাসূল, ২/৫০৩; ইবনে হাজম, জাওয়ামী আল সীরাত, ১৯৩; ইবনে আব্দুল বার, আল দুরার, ১৮৯; ইবনে সাঈদ আল নাস, আইয়ুন আল আসর, ২/৬৯।

৭০. আল সাতি, আল ফতুহুল রব্বানী, ২১/৮১-৩, হাসান সনদসহ।

৭১. সহীহ বুখারী, ২/২১০, ৩/২৪-২৫; সহীহ মুসলিম, ৫/১৬০-১।

৭২. আহমদ, আল মুসনাদ, ৩/৩৫০, হাসান সনদসহ। ইবনে হাজর (ফতহুল বারী, ৭/১৪) তাদের সংখ্যা ৪০০-৯০০ থাকার ভিন্নতার কথা উল্লেখ করে তিনি বিভিন্ন রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বলেন যে বনু কুরায়জার অনুসারী ব্যক্তিবর্গ, যেমন, দাস, মুক্ত করা দাস ও অন্যান্যদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭৩. সহীহ আল বুখারী, ৩/১১; সহীহ মুসলিম, ৫/১৫৯। ইসলাম গ্রহণকারী তিন ব্যক্তি হলেনঃ সালাবা ইবনে সাইয়াহ, উসায়েদ ইবনে সাইয়াহ এবং আসাদ ইবনে উবায়েদ।

৭৪. ইবনে ইসহাক এই বর্ণনা দেন (ইবনে হিশাম, সীরাত, ৩/৭২১)। উরওয়া বলেন, এটি ছিল উসমান ইবনে জায়েদের বাড়ী, বন্দীর সংখ্যা বিপুল হওয়ায় দুইজনের বাড়ীতে তাদেরকে আটক রাখা হয়েছিল বলে দুই রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে।

৭৫. আহমদ, মুসনাদ, ৩/৩৫১; আল তিরমিজি, ৪/১৪৪-৫।

৭৬. ইবনে হিশাম, সীরাত, ৩/৭২২; আহমদ, মুসনাদ, ৬/২৭৭; আবু দাউদ, আল সুনান, ২/১৫০। (এর সনদ হাসান লি জয়ীফ)।

৭৭. ইবনে হিশাম, আল সীরাত, ৩/৭১৪; ইবনে সা'দ, আল তাবাকাত, ২/৭২-৭।

৭৮. সহীহ বুখারী, ৩/১১; মুসলিম, ৫/১৫৯।

৭৯. দেখুন, কাতারে বিশ্ব সীরাত সম্মেলনের নিবন্ধে ডঃ ওয়ালিদ আরাফাতের গবেষণাকর্ম।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

খায়বর[১] ও হেজাজের অবশিষ্ট ইহুদী ঘাঁটি জয়

খায়বর হচ্ছে একটি কৃষি মরুদ্যান। স্থানটি মদীনা থেকে ১৬৫ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত।[২] সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ৮৫০ মিটার। হার্রা বনু সলিমের পর এটি হচ্ছে আরব জাহানের দ্বিতীয় বৃহত্তম হার্রা।[৩] খায়বরের জমি উর্বর। পানির কোন অভাব নেই। তাই এখানে বিভিন্ন ধরনের ফসল ও ফলমূল উৎপাদিত হয়, এছাড়া বিপুল পরিমাণ খেজুর গাছের জন্যও স্থানটি বিখ্যাত। একারণে খায়বর হেজাজের বাগিচা নামে পরিচিতি লাভ করে। উর্বর জমি, সুরক্ষিত অবস্থা এবং পশু সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে স্থানটি এই বিশেষণে ভূষিত হয়। খায়বরের বাজার এলাকার নাম ছিল সুক আল নাতাহ। গতফান গোত্রের লোকেরা বাজারটি পাহারা দিতো। তারা খায়বরকে তাদের সীমানার অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি এলাকা বলে গণ্য করতো।[৪]

শক্তিশালী অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে খায়বরে বহু ব্যবসায়ী ও হস্তশিল্পী বসবাস করতো এবং সেখানে বিপুল অংকের মুদ্রা বিনিময় হতো।

খায়বর বিজয়ের আগে সেখানে আরব ও ইহুদীদের মিশ্র বসতি ছিল। রাসূলের (সা.) সময়ে মদীনা থেকে ইহুদীদের বহিষ্কার করার পর খায়বরে ইহুদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[৫]

বনু নজীরের নেতৃবৃন্দ খায়বরে বসতি স্থাপন করার পূর্বে সেখানকার ইহুদীরা মুসলমানদের প্রতি কোনরূপ শত্রুতা পোষণ করেনি। বনু নজীরের নেতৃবৃন্দ মদীনার তাদের বাড়ীঘর থেকে বহিস্কৃত হওয়ার কারণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। বহিষ্কারের ফলে তাদের ক্ষমতা মোটেই খর্ব হলো না। কারণ তারা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও সম্পদসহ মদীনা ত্যাগ করেছিল। বাদকদলের ঢোলের বাদ্য ও বংশীধ্বনির পিছনে পিছনে আকাশচুম্বী অহংকার ও গর্বের প্রকাশ ঘটিয়ে তারা মদীনা ত্যাগ করে। তৎকালীন অন্য কোন গোত্রের এরূপ আচরণ লক্ষ্য করা যায়নি।[৬]

খায়বরে বসতি স্থাপনকারী বনু নজীরের সবচেয়ে প্রভাবশালী লোকদের মধ্যে ছিল সালাম ইবনে আবুল হাকীক, কিনানা ইবনে আবুল হাকিক এবং হুয়াঈ ইবনে আখতাব। তারা খায়বার যাওয়ার পর সেখানকার লোকেরা তাদের নেতৃত্ব মেনে নেয়।[৭]

www.pathagar.com

মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের যুদ্ধে খায়বরের ইহুদীদের জড়িত করার জন্য এই তিন ব্যক্তির নেতৃত্বই যথেষ্ট ছিল। তারা মনের গভীরে লুকায়িত তীব্র ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং মদীনায় নিজেদের বাড়ীঘরে ফিরে যাবার প্রবল ইচ্ছা দ্বারা তাড়িত হয়ে এই পন্থা বেছে নেয়।

তারা খন্দকের যুদ্ধের সময় প্রথম বৈরিতা শুরু করে। বনু নজীরের নেতাদের নেতৃত্বে খায়বরের ইহুদীরা কুরাইশ ও অন্যান্য আরব বেদুঈন গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন এবং এজন্য তারা অর্থও ব্যয় করে। এরপর তারা মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে এবং তাদের দুশমনদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বনু কুরায়জাকে সম্মত করায়।[৮]

আল্লাহ তায়ালার সাহায্যে মুসলমানরা মদীনা রক্ষা এবং আক্রমণকারী গোত্রগুলোকে পরাজিত করার পর রাসূল (সা.) খায়বরের পরিস্থিতি মোকাবেলা করা জরুরী বলে অনুভব করেন, কারণ খায়বর মুসলমানদের জন্য মারাত্মক বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল।

ইবনে ইসহাক একজন মজহুল রাবীর সনদ যুক্ত রেওয়ায়েতে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান জানান এবং তাদেরকে তার আগমন সম্পর্কে তাদের ধর্মগ্রন্থসমূহের বিবরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।[৯] ইহুদীরা রাসূলের দাওয়াত গ্রহণ করলো না এবং মুসলমানদের শত্রুদের প্ররোচিত করার জন্য ক্ষমাও চাইলো না। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) সালাম ইবনে আবুল হাকীকসহ তার বিরুদ্ধে প্ররোচনাদানে ভূমিকা পালনে নেতৃত্বদানকারীদের ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিলেন। রাসূলুল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক ও কয়েকজন আনসারকে সেখানে প্রেরণ করেন এবং তারা তাকে হত্যা করেন।

আল বুখারী এই হত্যার ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক শক্ত ঘাঁটির অভ্যন্তরে দেহরক্ষী প্রহরাধীন তার বাড়ীর ভিতরে প্রবেশের পথ খুঁজে বের করেন এবং শয়নকক্ষে ঢুকে তাকে হত্যা করেন।[১০] এই ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক (রাঃ) ছিলেন একজন অসীম সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু মুজাহিদ যিনি ঈমানের জন্য যে কোন কোরবানী স্বীকারে সদা প্রস্তুত ছিলেন।

তবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিপদ দূর করার জন্য ইহুদীদের কয়েকজন নেতাকে হত্যা করাই যথেষ্ট ছিল না। ষষ্ঠ হিজরীতে মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে

www.pathagar.com

হুদায়বিয়ার সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধির ফলে মুসলমানরা খায়বর জয় করার প্রতি মনোনিবেশ করার একটা চমৎকার সুযোগ পায়। অনেক মুফাস্‌সিরে কোরআন মনে করেন যে, আল হুদায়বিয়া থেকে ফেরার পথে অবতীর্ণ সূরা আল ফাতহ্-এ আল্লাহ্ মুসলমানদের খায়বার বিজয় এবং সেখান থেকে গণিমতের মাল লাভের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন।

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করলো, আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাজিল করলেন তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যা তারা লাভ করবে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শত্রুদের স্তব্ধ করে দিয়েছেন যাতে এটা মুমিনদের জন্য এক নিদর্শন হয় এবং তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। আরও একটা বিজয় রয়েছে, যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি, আল্লাহ্ তা বেষ্টন করে আছেন, আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান" (আল ফাতহ ৪৮:১৮-২১)।

অভিযানের তারিখ

ইবনে ইসহাকের মতানুসারে সপ্তম হিজরীর মহররম মাসে এই ঘটনা ঘটে। আল ওয়াকিদীর মতে ষষ্ঠ হিজরীর জুলহজ্ব মাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি থেকে ফেরার পর সপ্তম হিজরীর সফর অথবা রবিউল আওয়াল মাসে তা সংঘটিত হয়।[১১] আল জুহুরী ও ইমাম মালিক মনে করেন যে, ষষ্ঠ হিজরীর মহররম মাসে খায়বর অভিযান পরিচালিত হয়।[১২] ঐতিহাসিকগণ এই অভিযানের তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে এসব অগ্রণী ব্যক্তিবর্গকে অনুসরণ করেছেন। এজন্য তাদের মতের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইবনে ইসহাক ও আল ওয়াকিদীর তারিখের মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য নেই। তাদের তারিখের মধ্যে ব্যবধান তিন মাসেরও কম। তাদের এবং আল জুহুরী ও ইমাম মালিকের তারিখের মধ্যে পার্থক্যের কারণ হিজরী বর্ষের সূচনাকাল নির্ধারণ। তাদের কেউ কেউ হিজরতের মাস রবিউল আওয়ালের

www.pathagar.com

পূর্ববর্তী মাসগুলোকে হিসেবের মধ্যে গণ্য করেছেন, অন্যরা মাসগুলো হিসেব করেননি এবং তারা রবিউল আওয়াল মাসকে হিজরী বর্ষের সূচনা বলে গণ্য করেন। এর ফলে তাঁরা সকল ঘটনার তারিখ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একটি বছরকে বাদ দিয়েছেন। ইবনে হাজর আল ওয়াকিদীর চেয়ে ইবনে ইসহাকের অভিমত অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন।[১৩]

খায়বার অভিমুখে যাত্রা

রাসূল (সা.) এর নেতৃত্বে মুসলমানরা খায়বর অভিমুখে রওনা হলেন। যাত্রার শুরুতে তারা "আল্লাহু আকবর" এবং "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" শ্লোগানে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে তোলেন। রাসূলুল্লাহ তাদেরকে শ্লোগান বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, "তোমরা যাকে ডাকছো তিনি সবকিছু শোনেন ও অতি সন্নিকটে থাকেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন।"[১৪] এই ঘটনায় ইসলামী সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ শক্তির একটি সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁরা ঈমানী শক্তি ও জিহাদের সুউচ্চ মনোবলে বলিয়ান হয়ে লোক ও অস্ত্র বলে বলিয়ান এবং সুরক্ষিত ও রসদ সম্ভারে পরিপূর্ণ শত্রু ঘাঁটিগুলোর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাদের এসব প্রস্তুতির কোনটিই মুমিনদের লক্ষ্য অর্জনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

একমাত্র আল ওয়াকিদী রাসূলের খায়বর অভিযানের গমন পথের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন। আল ওয়াকিদী রাসূলুল্লাহর (সা.) গমন পথের বিবরণদান এবং সীরাতের বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার স্থলের বর্ণনার ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি নিজে প্রায়ই এসব পথ দিয়ে যাতায়াত করতেন এবং লোকদের কাছে বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) মদীনা থেকে রওনা হলেন এবং সিনাইয়াত আল ওয়াদা, জাগাবাহ, নুকমা, আল মুস্তানা, আল ওয়াসিহ, আসর, সাহ্‌বা ও আল খারাসার মধ্যদিয়ে অগ্রসর হতে থাকলেন। এরপর তিনি আল শিক ও আল নাতাহর মধ্যবর্তী স্থান হয়ে আল মনজিলা ও আল রাজি অতিক্রম করে সেখান থেকে খায়বর বিজয়ের সূচনা করেন।[১৫] আল রাজি খায়বরের উত্তরপূর্ব দিকে অবস্থিত। রাসূল খায়বরের সঙ্গে সিরিয়া এবং গতফান গোত্রে অবস্থিত তাদের মিত্রদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে চেয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয়।

www.pathagar.com

খায়বর বিজয়ের বিবরণ

রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বপ্রথম আল নাতাহ জয় করেন। মুসলমানদের হাতে সেখানকার দু'টি শক্ত ঘাঁটি নায়ীম ও আল সাবের পতন ঘটে। তারপর তিনি আল শিক দখল করেন। সেখানকার দুটি শক্ত ঘাঁটি আবি ও আল নিজার মুসলমানদের হস্তগত হয়। আল নাতাহ ও আল শিক খায়বরের উত্তরপূর্বে অবস্থিত। এরপর তিনি কিতাবা জয় করেন। এর শক্ত ঘাঁটি মানি (অথবা আল কামুস) এর পতন ঘটে। এটি ছিল ইবনে আবুল হাকিকের শক্ত ঘাঁটি। এরপরে তিনি আল ওয়াসিহ ও আল সালালিম জয় করেন এবং সেখানকার দুর্গগুলো মুসলমানদের করতলগত হয়। আল ওয়াকিদীর বর্ণনা অনুযায়ী এই হল খায়বরের আশপাশের এলাকা জয়ের ধারাবাহিক ঘটনাবলী।[১৬] ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় ধারাবাহিক ঘটনাবলীর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা গেছে। নাতাহর ঘাঁটি নায়ীম দখলের মধ্যদিয়ে বিজয়ের সূত্রপাত হওয়ার আল ওয়াকিদীর বর্ণনার সাথে তিনিও একমত পোষণ করেছেন, তবে তিনি মনে করেন যে অন্য সব ঘাঁটি দখলের আগেই কামুস ঘাঁটি জয় করা হয়েছিল।[১৭]

সহীহ হাদীস থেকে জানা গেছে রাসূল (সা.) ফজর হবার আগেই খায়বর পৌছান এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় ফজরের নামাজ আদায় করেন। এরপর সূর্যোদয়ের আগেই আক্রমণ শুরু করেন। গবাদী পশু, কোদাল ও ঝুড়ি নিয়ে কাজের জন্য বাড়ী থেকে বাইরে আসা ইহুদী কৃষকরা মুসলমানদের দেখে ভয় ও বিস্ময় মিশ্রিত কণ্ঠে বলে উঠে, 'সর্বনাশ! মুহাম্মদ তাঁর বাহিনীসহ এসে গেছে, দেখছি।" রাসূলুল্লাহ (সা.) জবাবে বললেন, "আল্লাহ আকবর। খায়বরের পতন ঘটেছে। আমরা কোন জনপদে আগমন করলেই তার অধিবাসীদের সকাল বেলাটা দুর্ভাগ্যময় হয়ে ওঠে।"[১৮]

ইহুদীরা তাদের সুরক্ষিত দুর্গগুলোতে যেয়ে আশ্রয় নিলো এবং মুসলমানরা নায়ীম দুর্গ অবরোধ করলেন। খায়বরের ইহুদীদের মিত্র গতফান গোত্র শিগগিরই তাদের সাহায্যে এগিয়ে এলো কিন্তু নিজেদের বাড়ীঘরের উপর মুসলমানদের আক্রমণ হতে পারে আশংকা করে তারা যুদ্ধে যোগদান করলো না। আল ওয়াকিদী বর্ণনা করেন যে, গতফান গোত্রের যোদ্ধারা খায়বরের দুর্গগুলো পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল তবে ইবনে ইসহাক জানান যে তারা খায়বরে পৌছার আগেই ফিরে যায়। কেবলমাত্র আল ওয়াকিদীর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ

www.pathagar.com

গতফান গোত্রকে তাদের প্রত্যাহারের বিনিময়ে খায়বরের একবছরের উৎপাদিত খেজুরে প্রদান করার প্রস্তাব দেন কিন্তু তারা তাতে রাজী হয়নি। এই বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয়, কারণ আল ওয়াকিদী একজন দুর্বল রাবী এবং একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ এই বিষয়টি বর্ণনা করেননি।[১৯]

নায়ীম দুর্গ অবরোধের প্রথম দু'দিন আবু বকর (রাঃ) মুসলমানদের পতাকা বহন করেন কিন্তু দুর্গের পতন ঘটলো না। সকলের মধ্যে নিদারুণ চাপ ও ক্লান্তি দেখা দিল। রাসূল (সা.) বললেন ঃ "আগামীকাল আমি এমন একজনের হাতে পতাকা প্রদান করবো যাকে আল্লাহ ও তার রাসূল ভালবাসেন এবং সেও আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালবাসে। সে দুর্গ জয় না করে ফিরবে না" মুসলমানদের মনোবল ফিরে এলো। পরের দিন সকালে ফজরের নামাজ আদায়ের পর তিনি আলীকে (রাঃ) ডেকে নিয়ে তার হাতে পতাকা তুলে দিলেন। আলী তৃতীয় দিনে পতাকা বহন করলেন এবং দুর্গ জয় করলেন।[২০] একটি রেওয়ায়েতে আভাস পাওয়া গেছে যে আলীর আগে পতাকা বাহকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ), আবু বকর (রাঃ) নয়, কিন্তু রেওয়ায়েতটি দুর্বল কারণ জয়ীফ রাবী মায়মুন আল বসরী হাদীসটি বর্ণনা করেন।[২১] অন্য এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে তৃতীয় দিনে আবু বকর, উমর ও আলী (রাঃ) পালাক্রমে পতাকা বহন করেন। এই রেওয়ায়েতটিও দুর্বল, কারণ বর্ণনাকারী বারিদা ইবনে সুফিয়ান একজন জয়ীফ রাবী।[২২]

রাসূলল্লাহ (সা.) খায়বরের ইহুদীদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো এবং আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য সম্পর্কে জানানোর জন্য আলীকে (রাঃ) নির্দেশ দেন। তিনি বললেন ঃ "আল্লাহর শপথ। আল্লাহ তোমার মাধ্যমে একজনকেও যদি (ইসলামের পথে) হেদায়েত প্রদান করেন তাহলে তা হবে তোমার জন্য সবচেয়ে দামী উষ্ট্ররাজীর চেয়েও উত্তম।[২৩] এই বর্ণনা থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, খায়বরের গণিমতের মালের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর কোন আগ্রহ ছিলনা; বরং তিনি ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার ও প্রসার করতে এবং এক্ষেত্রে বাধাসমূহ অপসারণ করতে চেয়েছিলেন।

আলী (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "ইয়া রাসূলল্লাহ, কিসের ভিত্তিতে আমি জিহাদ করবো?" তিনি বললেন ঃ "যতক্ষণ পর্যন্ত তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ উচ্চারণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাও। তারা যদি তাতে সম্মত হয় তা হলে নির্ধারিত পাওনা (জাকাত) বাদে তাদের জীবন ও সম্পদ, নিরাপদ থাকবে এবং আল্লাহ তায়ালাই তাদের নিয়ত সম্পর্কে ভাল জানেন।"[২৪]

নায়ীম দুর্গ অবরোধকালে মাহমুদ ইবনে মুসলেমা (রাঃ) শহীদ হন। মারহাব দুর্গের উপর থেকে গম পেষার যাতার ভারী পাথর ছুড়ে মারলে তিনি তার আঘাতে নিহত হন।[২৫] আলী (রাঃ) মারহাবের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং তাকে হত্যা করেন।[২৬] মারহাব ছিল ইহুদীদের অন্যতম সেরা যোদ্ধা এবং তার মৃত্যুর ঘটনায় তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে।

কয়েকটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, ইহুদীরা আলীর (রাঃ) ঢাল তার হাত থেকে ফেলে দিলে তিনি নায়ীম দুর্গদ্বারের একটি পাল্লাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেন। তবে এই রেওয়ায়েতগুলোর সবকটিই অবাস্তব।[২৭] এগুলো প্রত্যাখ্যান করার অর্থ আলীর (রাঃ) শক্তি ও সাহসকে অস্বীকার করা নয়। অনেক নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতে তার শক্তিমত্তা ও সাহস সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

নায়ীম জয় করতে দশ দিন লাগে।[২৮] এরপর মুসলমানরা নাতাহ অঞ্চলে আল সাদ ইবনে মু'য়াজ ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হন। এই দুর্গের পাঁচশ' যোদ্ধা এবং প্রচুর খাদ্য ও রসদ মজুদ ছিল। মুসলমানদের খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছিল। আল হাব্বাব ইবনে আল মুঞ্জির (রাঃ) এই অভিযানে পতাকা বহন করেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যান। দুর্গটি জয় করতে তিনদিন লাগে। এরপর মুসলমানরা নাতাহর শেষ দুর্গ কালাত আল জুবায়ের দখল করেন। নায়ীম, সাব ও অন্যান্য ইহুদী দুর্গ ও ঘাঁটি মুসলমানদের অধিকারে আসার পর সেখানকার দুশমনেরা কালাত আল জুবায়ের দুর্গে যেয়ে সমবেত হয়। এই দুর্গটি ছিল বেশ উঁচু এবং অত্যন্ত সুরক্ষিত। মুসলমানরা দুর্গের পানি সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে ইহুদীদের বেরিয়ে এসে যুদ্ধ করতে বাধ্য করলেন। তাঁরা ১০ জন ইহুদীকে হত্যা করলেন। অবরোধ তিন দিন ধরে চলার পর তারা শক্ত ঘাঁটিটি জয় করেন। ইহুদীদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী নাতাহর লোকদের পরাজিত করার পর মুসলমানরা আল রাজি থেকে আল মঞ্জিলার দিকে অগ্রসর হলেন।

www.pathagar.com

নাতাহ ইহুদীদের পরাভূত করে তাদের খাদ্য সামগ্রী ও রসদ হস্তগত করার পর মুসলমানদের শক্তি যে আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এছাড়া নাতাহার পতন খায়বরের অন্যান্য ইহুদীদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল।

মুসলমানরা আল শিক জয়ের জন্য অভিযান শুরু করলেন। সে এলাকায় আবি ও আল নিজারসহ কয়েকটি ঘাঁটি ছিল। মুসলমানরা আবি দখলের মাধ্যমে জয়ের সূচনা করলেন। ঘাঁটির সামনে মাত্র একটি যুদ্ধ হলো এবং তাতে বহু ইহুদী নিহত হলো। এরপর মুসলমানরা দুর্গ আক্রমণ করে অভ্যন্তরে মজুত খাদ্য ও রসদ দখল করে নেন। ইহুদী যোদ্ধাদের অনেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় এবং আল নিজার দুর্গের কাছে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তারা সেখানে তীর-ধনুক ও পাথর নিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মুসলমানরা অবরোধ করার আগেই তাদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে এবং দুর্গটির পতন ঘটে। আল শিকের অবশিষ্ট লোকেরা খায়বরের দক্ষিণ পশ্চিমে কিতাবা এলাকার শক্ত ঘাঁটিসমূহে পালিয়ে যায় এবং আল কামুস (আল মানি) দুর্গের কাছে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পরাজিতদের কেউ কেউ ওয়াসি ও সালালিম ঘাঁটির লোকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বাধার সৃষ্টি করে। মুসলমানরা তাদেরকে ১৪ দিন ধরে অবরোধ করে রাখার পর আল নিজার দুর্গে সর্বশেষ লড়াই সংঘটিত হয়। শেষদিকে ইহুদীদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে এবং কেবল দুর্গের অভ্যন্তরে তাদের বাধাদান সীমিত হয়ে পড়ে, আর ইহুদীদের শান্তি প্রার্থনা প্রস্তাবের মাধ্যমে এসব বাধার অবসান ঘটে।

আল ওয়াকিদীর বর্ণনার ভিত্তিতে শক্ত ঘাঁটি আল সা'ব ও আল জুবায়ের এবং আল শিক ও আল কিতাবা অঞ্চলের ঘাঁটিগুলো জয়ের এই বিবরণ দেয়া হলো।[২৯] কেবলমাত্র আল ওয়াকিদীর বর্ণনায় এই এলাকা জয়ের একটা স্বচ্ছ চিত্র ফুটে উঠেছে। হাদীস বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টিতে তিনি জয়ীফ হওয়া সত্ত্বেও একজন ঐতিহাসিক (আখবারি) হিসেবে তার কাছে বিপুল পরিমাণ তথ্য মজুদ ছিল। তার এই মৌলিক বিবরণ অনুমোদনযোগ্য।

খায়বর বিজয় সম্পর্কে ইবনে ইসহাকের বর্ণনা বিভ্রান্তিকর এবং খায়বরের দুর্গগুলোর অবস্থানের সঙ্গে তুলনা করলে তা অসঙ্গতিপূর্ণ ও পুরোপুরি সঠিক নয় বলে প্রতীয়মান হয়। সহীহ রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে খায়বরে ইহুদীদের সঙ্গে লড়াইয়ের পর রাসূলল্লাহ (সা.) তাদের ভূখণ্ড ও খেজুর বাগান দখল করে নিয়ে ইহুদীদেরকে তাদের দুর্গগুলোতে যেয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেন। ইহুদীরা সংযত

www.pathagar.com

আচরণ ও কোনকিছু গোপন না করার শর্তে রাসূলুল্লাহর জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য, অস্ত্র ও বর্ম রেখে তাদের বাহনে করে যা কিছু নিয়ে যাওয়া সম্ভব তা নিয়ে চলে যেতে সম্মত হয়। কিন্তু তারা মুসলমানদের দেয়া এই শর্ত না মানলে তাদের নিরাপত্তা দেয়া হবে না এবং তাদের সঙ্গে কোন চুক্তিও করা হবে না। ইহুদীরা খায়বর যুদ্ধের আগে নিহত হুয়াই ইবনে আখতাবের কয়েকটি কস্তুরী লুকিয়ে রাখলো। বনু নজীরের বহিষ্কারের সময় সে এগুলো সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। সাইয়াহকে[৩০] জিজ্ঞাসা করা হলো, "হুয়াই ইবনে আখতাবের কস্তুরীগুলো কোথায় আছে?" সে বললো, "যুদ্ধ ও অন্যান্য খরচ মেটানোর জন্য সেগুলো বেচে দিয়েছি।" পরে মুসলমানরা কস্তুরীগুলো খুঁজে পেলেন। এরপর তারা আবুল হাকিকের দু'ছেলেকে হত্যা করলেন এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের বন্দী করা হলো।[৩১]

সনদবিহীন ইবনে ইসহাকের এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে এই সম্পদ যে ব্যক্তি লুকিয়ে রেখেছিল এবং যার কাছে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল সে হলো কিনানা ইবনে আল রাবী।[৩২] ইবনে সা'দ বলেন, তারা হলো ঃ কিনানা ও তার ভাই আল রাবী।[৩৩] ইবনে সা'দের সনদে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবু লাইলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। তিনি সাদিক কিন্তু তার স্মরণশক্তি ছিল অত্যন্ত দুর্বল।[৩৪]

আল কামুস দুর্গের ইহুদীদের শান্তি প্রস্তাব পেশ করার বিষয় প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু পরে তারা চুক্তি ভঙ্গ করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের সম্পদ দখল করেন। নাতাহ, আল শিক ও আল কামুস দুর্গের পতনের পর আল ওয়াসিহ ও আল সালালিমের লোকেরা উপলব্ধি করলো যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধে কোন কাজ হবে না, তাই তারা প্রাণ নিয়ে চলে যাবার অনুমতি দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহর কাছে আবেদন জানালো এবং তিনি তা মঞ্জুর করলেন।[৩৫]

খায়বরের অবশিষ্ট এলাকা মুসলমানদের অধিকারে আসলো। খায়বরের উত্তরে অবস্থিত ফিদাকের অধিবাসীরাও শান্তি স্থাপন এবং এর বিনিময়ে নিজেদের সম্পদ নিয়ে চলে যাবার অনুমতি চেয়ে অবিলম্বে রাসূলের কাছে আবেদন জানালো। রাসূল (সাঃ) তাদের আবেদনও মঞ্জুর করলেন।

ফিদাক একান্তভাবেই আল্লাহর রাসূলের জন্য, কারণ কোন অশ্বারোহী বা উষ্ট্রী বাহিনীর অভিযান ব্যতিরেকেই তা মুসলমানদের অধিকারে আসে। এরপর মুসলমানরা ওয়াদী আল কুরা অবরোধ করেন। খায়বর ও তায়মার মধ্যবর্তী স্থানে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গড়ে ওঠা জনপদ ওয়াদী আল কুরা। খায়বর থেকে সেখানে

www.pathagar.com

যেতে কয়েকদিন সময় লাগলো। অবরোধের পর সেখানকার অধিবাসীরা আত্মসমর্পণ করলো এবং মুসলমানরা বিপুল পরিমাণ গণিমতের মাল লাভ করলেন কিন্তু সেখানকার জমি ও খেজুর বাগান ইহুদীদের কাছে থেকে গেল। মুসলমানরা খায়বরের ইহুদীদের মতোই তাদের সঙ্গে আচরণ করলেন। তায়মা খায়বর ও ওয়াদী আল কুরার অনুরূপ একটি চুক্তি সম্পাদন করলো।[৩৮]

এভাবে মুসলমানদের হাতে ইহুদীদের অবশিষ্ট ঘাঁটিগুলোর পতন ঘটলো। ইবনে ইসহাক আল ওয়াসি ও আল সালালিম এবং ফিদাকের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে শান্তি চুক্তির অনুরোধ জানানোর বিষয় বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনার সনদ মুনকাতি যা ইসলামী শরয়ী সংক্রান্ত বিষয়ে দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য না হলেও ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য। সনদের বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর ইবনে আমর ইবনে হাজম মাগাজী সম্পর্কিত তথ্য বর্ণনার জন্য বিখ্যাত।

খায়বরের যুদ্ধে ৩৯ জন ইহুদী নিহত হয়[৩৯] এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের বন্দী করা হয়। বন্দীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাফিনা বিনতে হুয়াঈ ইবনে আখতাবকে মুক্ত করে দেন এবং তাকে বিয়ে করেন।[৪০]

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় বলা হয় যে যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে ২০ জন শহীদ হন।[৪১] আল ওয়াকিদী তাদের সংখ্যা ১৫ বলে উল্লেখ করেন। এই ঘটনা থেকে আল্লাহ কর্তৃক ইহুদীদের পরিত্যাগের লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, ইহুদীরা সুরক্ষিত দুর্গের ভিতর থেকে যুদ্ধ করছিল আর মুসলমানরা খোলা প্রান্তরে থেকে আক্রমণ চালাচ্ছিলেন কিন্তু মুসলমানদের পক্ষে শহীদদের সংখ্যার তুলনায় ইহুদীদের প্রাণহানির সংখ্যা অনেক বেশী। এক সহীহ রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে এক ইহুদী রমণী রাসূলুল্লাহকে (সা.) একটি ভূনা মেষ খেতে দেয়। মহিলাটি মেষটিতে বিষ মাখিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ রানের গোশত খেতে পছন্দ করতেন বিধায় মহিলাটি রানের কাছে সবচেয়ে বেশী বিষ মিশ্রিত করে। রাসূলুল্লাহ রানের কাছ থেকে এক টুকরা গোশত মুখে দিয়ে চিবিয়ে পরীক্ষা করার সময় বিষ মিশ্রিত থাকার বিষয়টি বুঝতে পারেন এবং থু করে টুকরাটি মুখ থেকে ফেলে দেন। মহিলাটি অপরাধ স্বীকার করলে রাসূলুল্লাহ তাকে মাফ করে দেন[৪২] কিন্তু পরে এই বিষ মিশ্রিত খাবার খাওয়ার কারণে বিশর ইবনে মা'রুর মারা গেলে তিনি তার প্রাণদণ্ড দেন।[৪৩]

www.pathagar.com

মুসলমানদের খায়বর বিজয়ে সবচেয়ে বেশী সহায়ক হয়েছিল হুদায়বিয়ার সন্ধি। বস্তুত এই সন্ধির পর মুসলমানরা খায়বরের ইহুদীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর চমৎকার সুযোগ লাভ করলেন। কুরাইশরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসলোনা এবং গতফান গোত্রও নিজেদের বাড়ীঘরের নিরাপত্তার কথা ভেবে খায়বরের ইহুদীদের সঙ্গে তাদের মিত্রতার বন্ধন ছিন্ন করলো। কুরাইশরা খায়বরের ইহুদীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের সংবাদ শুনে মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ হলো।[৪৪] এই বিজয় ছিল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা, কারণ খায়বরের দুর্জেয় দুর্গ ও ঘাঁটিসমূহ, এর বিপুল সংখ্যক কুশলী যোদ্ধা এবং বিপুল অস্ত্রশস্ত্রের কথা সকলের জানা ছিল। তাই খায়বর বিজয়ের ঘটনা অন্যান্য আরব গোত্রের উপর গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। এই ঘটনায় তাদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা বৈরিতা ত্যাগ করে মুসলমানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে এগিয়ে আসে। এভাবে ইসলাম প্রচারের এক নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

রাসূলল্লাহর (সা.) যুগে ইহুদীদের খায়বর থেকে বহিষ্কার করা হয়নি। সহীহ রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, খায়বরের ইহুদীরা কৃষি খেতে কাজ করবে, এজন্য অর্থ ব্যয় করবে এবং উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক মুসলমানদেরকে প্রদান করবে, এই শর্তে রাসূলুল্লাহ তাদেরকে সেখানে থাকার অনুমতি প্রদান করেন। মুসলমানরা ইচ্ছা করলে ইহুদীদেরকে বহিষ্কার করতে পারতেন এবং সে অধিকারও তাদের ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাদেরকে খায়বরে অবস্থানের সুযোগ দেন। ইহুদীরা দ্রুত রাসূলুল্লাহর কাছে এই প্রস্তাব দিয়ে বললো, "আমরা আপনাদের চেয়ে কৃষি কাজ ভাল বুঝি।" তিনি তাদের বহিষ্কার করার ইচ্ছা পোষণ করা সত্ত্বেও তাদের কথায় সম্মত হলেন।[৪৫]

বস্তুত সমগ্র খায়বর এলাকা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অধিকারে আসার বিষয় তাঁর এইরূপ ইচ্ছা পোষণের মাধ্যমে আভাসিত হয়েছে। যারা শান্তি স্থাপন করেছিল তারা জীবনের নিরাপত্তা ও খায়বর ছেড়ে চলে যাবার সুযোগ প্রদানের শর্তে তা করেছিল।

ইহুদীরা খায়বরে অবস্থান করলো। রাসূলুল্লাহ শস্যের ফলন মূল্যায়ন এবং মুসলমানদের অংশ নেয়ার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে এক ব্যক্তিকে সেখানে পাঠাতেন। একবার তিনি এই কাজের জন্য আব্দুলাহ ইবনে রাওয়াহাকে সেখানে পাঠান। তিনি হিসেব করে দেখলেন যে উৎপাদিক শস্যের অর্ধেক পরিমাণ হবে ২০ হাজার

www.pathagar.com

উষ্ট্রের বহনযোগ্য পরিমাণ খেজুর। তিনি ইহুদীদেরকে দুই ভাগের যে কোন এক ভাগ গ্রহণ এবং অপরভাগ তাকে দেয়ার সুযোগ দিলেন। ইহুদীরা তার উদারতার প্রশংসা করে বলে ঃ এই ন্যায় বিচারের ভিত্তির উপর আসমান ও জমিন স্থাপিত রয়েছে এবং আমরা আপনার কথা মতো অংশগ্রহণ করতে রাজী আছি।[৪৬]

তবে অপর এক সহীহ রেওয়ায়েতে বলা হয় যে, তার হিসাবে ৪০ হাজার উষ্ট্র বোঝাই ফসল উৎপাদিত হয়েছিল। তারা এই হিসেব মেনে নিয়ে ২০ হাজার উষ্ট্র বোঝাই শস্য প্রদান করলো।[৪৭]

দুটি রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয়ে বিধান সম্ভব। ৪০ হাজার উষ্ট্র বলতে ইহুদী ও মুসলমান উভয়ের অংশকে এবং ২০ হাজার উষ্ট্র বোঝাই বলতে দু'অংশের একাংশকেই বুঝানো হয়েছে।

খায়বর বিজয়ের প্রভাব

খায়বর বিজয় যে মুসলমানদের জন্য এক বিরাট সাফল্য বয়ে এনেছিল তাতে কোনই সন্দেহ নেই। খায়বর জয়ের ফলে মুসলমানদের অব্যাহত উপার্জনের একটি উৎস সৃষ্টি হয় এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটে। আয়েশা (রাঃ) খায়বর বিজয় সম্পর্কে বলেন, "এখন আমরা পেট ভরে খেজুর খেতে পারি।" ইবনে উমর বলেন, "খায়বর বিজয়ের আগে আমরা পেট পুরে খেতে পেতাম না।"[৪৮]

এসব বর্ণনায় খায়বর বিজয়ের ফলে মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী করার বিভিন্ন সুবিধাদি এবং খায়বর জয়ের পূর্বে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে। খায়বর জয়ের আগে মুসলমানদের তীব্র অভাব অনটন থাকা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.) গণিমতের মাল লাভের চেয়ে ইহুদীদের ইসলাম গ্রহণ করাকেই অধিকতর পছন্দ করেছিলেন। আলীর (রাঃ) প্রতি তাঁর নির্দেশ প্রদানের মধ্যে সেকথাটি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ইহুদীদের বহিষ্কার অথবা ধ্বংস করতে চাইলেন না, আর এই কারণেই আল কামুস, আল ওয়াতিহ ও আল সালালিমের শান্তি প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। পরে তারা সেখানে অবস্থান করার অনুমতি চেয়ে রাসূলের কাছে আবেদন জানালে তিনি তাতেও সম্মত হন। এই ঘটনা রাসূলের (সা.) সহনশীলতা ও ন্যায়বিচারের অত্যুৎকৃষ্ট নজীর হয়ে রয়েছে। এই পদক্ষেপের

www.pathagar.com

মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামরিক স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয় এবং মুসলমানদের সামরিক শক্তিকে অটুট রাখা হয় যাতে সমগ্র আরব উপদ্বীপকে ইসলামের সার্বভৌমত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করার অব্যাহত জিহাদে তা ব্যবহার করা সম্ভব হয়। মুসলমানরা কৃষি কাজে নিয়োজিত হননি কারণ চাষাবাদ এবং খেজুর বৃক্ষের চারা ও গাছের অব্যাহত পরিচর্যা ও শ্রমের প্রয়োজন, এতে তাদের সময় ও শক্তি নিঃশেষ হয়ে যেত। তারা ইহুদী কৃষকদের অভিজ্ঞতা ও কর্মশক্তি থেকে লাভবান হন। ইহুদী কৃষকরা তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে খায়বরের কৃষি উৎপাদনের হার অব্যাহত রাখে। তাদের উৎপাদিত ফসলের একটা বড় অংশ মুসলমানদের প্রদান করতো যা দিয়ে ইসলামী সেনাবাহিনীকে অস্ত্র সজ্জিত এবং অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হতো।

মুসলমানরা বিপুল পরিমাণ বহনযোগ্য সম্পদ লাভ করেন, প্রত্যেক ব্যক্তি তার চাহিদা মতো খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করেন, এর পরিমাণ বেশী না হওয়ার জন্য মুসলমানদেরকে এর অংশ প্রদান করতে হয়নি এবং রাষ্ট্রকেও এক পঞ্চমাংশ (খুমস) দিতে হয়নি।[৪৯] এই বর্ণনা ও আল ওয়াকিদীর রেওয়ায়েতের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে, তাতের বলা হয় যে বিপুল পরিমাণ সম্পদ ছিল এবং তা দিয়ে মুসলমানদের ও তাদের পশু সম্পদের একমাস বা তার চেয়েও বেশী দিনের খাদ্য চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়েছিল।[৫০]

খায়বরের গণিমতের মাল বন্টন

পবিত্র কোরআনে খায়বরের গণিমতের মালকে একান্তভাবে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত মুসলমানদের জন্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং অন্য কেউ তার অংশ পাবেন না ঃ

"তোমরা যখন গণিমতের মাল লাভ করবার জন্য যেতে থাকবে তখন এই পিছনে রেখে যাওয়া লোকেরা তোমাদেরকে অবশ্যই বলবে যে আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও। এরা আল্লাহর ফরমান পরিবর্তন করতে চায়। এদেরকে স্পষ্টভাষায় বলে দিন ঃ"তোমরা কক্ষণই আমাদের সঙ্গে যেতে পারনা, আল্লাহ তো আগেই একথা বলে দিয়েছেন।" ওরা বলবে ঃ "না, তোমরাই বরং আমাদের প্রতি হিংসা পোষণ কর।" (অথচ কোন হিংসার কথা নয়) আসলে এরা সঠিক কথা খুব কম বুঝে" (আল ফাতহ ৪৮ ঃ ১৫)।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (সা.) খায়বরের জমি দু'ভাগে ভাগ করলেন ঃ দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য খাদ্য মজুত রাখা এবং মদীনায় যেসব প্রতিদিনধিদল আসতো তাদের মেহমানদারির জন্য একাংশ রাখা হলো এবং অপর অংশ হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে প্রদান করা হলো। মোট অংশের সংখ্যা ছিল ৩৬।[৫২] এরমধ্যে ১৮ অংশ হুদায়বিয়ার সন্ধির সাক্ষীদেরকে দেয়া হয়। মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৫০০, তাদের মধ্যে ৩০০ জন ছিল অশ্বারোহী। একজন পদাতিক সৈন্য যে পরিমাণ গণিমতের মাল পায় একজন অশ্বারোহী সৈন্য পায় তার দ্বিগুণ।[৫৩] যারা হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলেন কিন্তু খায়বর অভিযানে অংশ নিতে পারেননি তারাও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের ন্যায় অংশ লাভ করেছিলেন। এই রেওয়ায়েত অবশ্য জয়ীফ এবং ইবনে ইসহাক সনদ ছাড়া তা বর্ণনা করেন।[৫৪] হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলেন কিন্তু খায়বর যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি একমাত্র জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ। তাকেও গণিমতের অংশ দেয়া হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) খায়বরের গণিমতের মালের অংশ আহল আল সাফিনাকেও (জাহাজের আরোহীদের) দিয়েছিলেন। এই মুসলিম ব্যক্তিবর্গ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন এবং মদীনায় ফিরে তাদের খায়বর পৌছানোর আগেই খায়বর বিজয় সম্পন্ন হয়। জাফর ইবনে আবু তালিবের নেতৃত্বে এই দলের ৫২ অথবা ৫৩ জন ছিলেন। একমাত্র এই ব্যক্তিবর্গ খায়বর অভিযানে অনুপস্থিত থেকেও সেখানকার গণিমতের মালের অংশ লাভ করেছিলেন।[৫৫]

সম্ভবত সঙ্গত কারণে তারা হুদায়বিয়ার উপস্থিত হতে পারেননি, তা না হলে তারা অবশ্যই সেখানে উপস্থিত হতেন, তার জন্যেই তাদের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রমী আচরণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্ভবত গণিমতের মালের উপর যাদের অধিকার ছিল তাদেরকে তার কিছু অংশ অন্যদের সঙ্গে ভাগাভাগি করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর এভাবেই রাসূলুল্লাহর পরামর্শে ও গণিমতের মালের অধিকারীদের সম্মতিক্রমে আবু হুরায়রা ও দাউসি গোত্রের কয়েকজন সদস্যও গণিমতের মালের অংশ লাভ করেছিলেন, কিন্তু তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি।[৫৬]

মুজাহিদের দৃষ্টান্ত

খায়বর বিজয়ে একজন বেদুইনের অংশ নেয়ার ঘটনা সহীহ হবার যথেষ্ট

www.pathagar.com

প্রমাণ পাওয়া গেছে। যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে গণিমতের মালের অংশ প্রদান করতে চাইলেন। কিন্তু (মাল বন্টনের সময়) বেদুইন লোকটিকে পাওয়া গেলনা। পরে তিনি ফিরে আসলে তাকে একটি অংশ প্রদান করা হলো। তিনি রাসূলুল্লাহর কাছ থেকে তা গ্রহণ করে বললেন ঃ আমি এর জন্য আপনাকে অনুসরণ করিনি, আমি এজন্য জিহাদে অংশ নিয়েছিলাম যেন আমি এখানে (হাত দিয়ে তিনি গলা নির্দেশ করলেন) আঘাত লাভ করি এবং সরাসরি বেহেশতে প্রবেশের সুযোগ পাই।" রাসূলুল্লাহ বললেন, "তোমার নিয়ত সহীহ হলে, তুমি যা চাও আল্লাহ তোমাকে তা-ই দেবেন।" এর কিছুক্ষণের মধ্যে তারা দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়লেন। পরে রাসূলুল্লাহর কাছে বেদুইনের লাশ আনা হলে দেখা গেল যে গলার যে স্থানটিতে তিনি নির্দেশ করেছিলেন ঠিক সেই স্থানেই একটি তীর বিদ্ধ হয়ে তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ তাঁর নিজের চাদর দিয়ে তাঁর লাশ ঢেকে দিলেন এবং নামাজে জানাজা পড়ালেন। এরপর আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দোয়া করলেন ঃ "ইয়া রব, তোমার এই বান্দা তোমার জন্যই হিজরত করেছিল ও শহীদ হয়েছে এবং আমি নিজে তার সাক্ষী।"[৫৭]

এই ঘটনায় জাহেলিয়াতের যুগে অশ্বারোহণ, লুণ্ঠন ও ডাকাতিতে অভ্যস্ত একজন বেদুইনের জীবন কিভাবে ঈমানের পরশ পাথরের স্পর্শে খাঁটি স্বর্ণে পরিণত হয়েছিল তার এক বলিষ্ঠ প্রমাণ ফুটে উঠেছে। তিনি জিহাদে জীবন বিলিয়ে দিয়ে বেহেশত ছাড়া আর কোন পুরস্কার গ্রহণ করতে চাননি। তাহলে রাসূলুল্লাহর বিশিষ্ট সাহাবীগণের অন্তরে ঈমানী আলোর প্রভাবের গভীরতা কত ব্যাপক ছিল? তারা ইহুদীদের জমি ও সম্পদের লোভে তাদের এলাকাসমূহ দখল করেছিলেন, একথা কি বলা যেতে পারে? তাঁরা ধর্মীয় উন্মাদনা তাড়িত হয়ে ইহুদীদেরকে বহিষ্কার করেছিলেন, একথাও কি ভাবা যায়? রাসূলুল্লাহর (সা.) সাহাবীগণ যুদ্ধের আগে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান, দখলের পর তাদের নিরাপত্তা বিধান এবং আত্মসমর্পণের পরে তাদেরকে খায়বরে অবস্থান করার অনুমতি প্রদান করেন। ইহুদীরা হযরত উমর (রাঃ) এর খেলাফত পর্যন্ত সেখানে ছিল। পরে তারা মুসলমানদের প্রতি বৈরী আচরণ, ঘৃণা প্রকাশ এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে। তারা মুসলমানদের একজনকে হত্যা করে এবং খায়বরে নিজ অবস্থানে ঘুমন্ত অবস্থায় আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের (রাঃ) দু'হাত ও পা কেটে

www.pathagar.com

ফেলে। এরপর উমর (রাঃ) তাদেরকে খায়বর থেকে বহিষ্কার করেন। তিনি খেজুর বাবদ তাদের পাওনা নগদ অর্থ, উট এবং জীন ও রশির মতো বিভিন্ন পণ্যের মাধ্যমে পরিশোধ করেন।

এভাবে হেজাজে ইহুদীদের অর্থনৈতিক ও সামরিক ভূমিকার অবসান ঘটে এবং মুসলমানরা নির্বিঘ্নে মুশরেক আরব গোত্রগুলোর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে ইসলামের পতাকাতলে সমগ্র আরব উপদ্বীপকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

তথ্যসূত্র ঃ

১. এই বিষয়ে বিবরণ সংগ্রহ ও তার মধ্যকার সহীহ বর্ণনা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আমি আল শেখ আওয়াদ আহমদ আল শাহরি-এর থিসিস মারবিয়াত গাজওয়া খায়বর (খায়বর অভিযানের বিবরণ) এর উল্লেখ করেছি। শেখ আওয়াদ মাস্টার ডিগ্রীর জন্য এই থিসিস মদীনা মনোয়ারার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টে জমা দিয়েছেন। আমি পরীক্ষা কমিটির একজন সদস্য ছিলাম।

২. আধুনিক সড়ক পথে এই দূরত্ব। রাসূল (সা.) যে পথে খায়বর গিয়েছিলেন তা এর থেকে ভিন্ন।

৩. দেখুন, আল মাওসুয়া আল আরাবিয়া আল মু'য়াসেরা (সহজ আরব এনসাইক্লোপিডিয়া), পৃষ্ঠা, ৭৭০; হামাদ আল যাসির, ফি শিমালি গারব আল যাজিরা, ২৩৬-৮।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. প্রাগুক্ত।

৬. ইবনে হিশাম, আল সীরাত, ৩/২৭২।

৭. প্রাগুক্ত।

৮. ইবনে হিশাম, আল সীরাত, ৩/২৫৩। সীরাত রচয়িতাদের বিবরণের সনদ গ্রন্থিত করে এই উদ্ধৃতি দেয়া হয়। সনদের মধ্যে একজন মাজহুল বর্ণনাকারী রয়েছেন, মুরসাল হওয়ার কারণে তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তবে এই বর্ণনা গ্রহণীয়, কারণ কোন খবর গ্রহণের ক্ষেত্রে হাদীসের মানদণ্ডে সহীহ বিবেচিত হওয়া অপরিহার্য নয়।

৯. ইবনে হিশাম, আল সীরাত, ২/১৯৫।

১০. ইবনে হাজর, ফতহুল বারী, কিতাব আল মাগাজী, বাব কালত আবু রফিক, ৭/৩৪০।

১১. ইবনে হিশাম, আল সীরাত, ২/১০০; আল ওয়াকিদী, আল মাগাজী, ২/৬৩৪।

১২. ইবনে আসাকির, তারিখ মদীনাত দিমাস্ক (দামেস্ক নগরীর ইতিহাস), ১/৩৩।

www.pathagar.com

১৩. ফতহুল বারী, ৭/৪৬৪

১৪. বুখারী, কিতাব আল মাগাজী, বাব গাজওয়া খায়বর, ৭/৪৭০।

১৫. আল ওয়াকিনী, আল মাগাজী, ২/৬৩৯।

১৬. প্রাগুক্ত।

১৭. ইবনে হিশাম, আল সীরাত, ৩/৪৩৮।

১৮. সহীহ বুখারী, কিতাব আল সালাহ, ১/৪৭৮; কিতাবুল আজাদ, ২/৮৯; সহীহ মুসলিম, কিতাব আল জিহাদ ওয়া আল সাইয়ার, বাব আল গাজওয়া, ৩/৪২৬।

১৯. আল ওয়াকিনী, আল মাগাজী, ৩/৬৫০; ইবনে হিশাম, আল সীরাত, ৬/৪৩৮।

২০. আহমদ, আল মুসনাদ, ৫/৩৫৩; আল হাকীম, আর মুস্তাদরাক, ৩/৩৭; আল হায়াসামী, মাজমা আল জাওয়াদ ৬/১৫০; আল হাকীম প্রমাণ করেন যে এর সনদ সহীহ এবং আল দাহাবী ও আল হায়াসামী উভয়ে তার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন।

২১. আহমদ, আল মুসনাদ, ৫/৩৫৮; আল হায়াসামী, কাশফ আল আস্তার আন জাওয়াইদ মুসনাদ আল বাজার, ২/৩৩৮; আল তাবারী, তারিখ আল রাসূল ২/৩০০; ইবনে হাজর, তাকরিব আল তাহজিব, ২/২৯২।

২২. ইবনে হিশাম, আল সীরাত, ৩/৪৫৫; আল তাবারী, তারিখ আল রাসূল, ২/৩০০; আল হাকীম, আল মুস্তাদরাক, ২/৩৭; আরও দেখুন, ইবনে হাজর, তাহজিব, ১/৪৩৩; আল হায়াসামী, (মাজমা আল জাওয়াইদ ৯/১২৪) ও আল বাজার, (ইবনে কাসির, আল সীরাহ আল নবুওয়া, ৩/৩৫৩), অন্য একটি সনদসহ এই রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, এর সনদের মধ্যে হাকীম ইবনে জুবায়ের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন এবং তিনি জয়ীফ, ইবনে হাজরের তাকরিব আল তাহজিব, ১/২৯২-এ একথা উল্লিখিত হয়েছে।

২৩. সহীহ মুসলিম, কিতাব আল ফাজাইল আল সাহাবা, ৪/১৮৭২।

২৪. শারহ-আল নবোবি আল মুসলিম, ১৫/১৭৭।

২৫. ইবনে হিশাম, আল সীরাত, ৩/৪৩৮; আল ওয়াকিদী, আল মাগাজী, ২/৬৪৫।

২৬. সহীহ মুসলিম, কিতাব আল জিহাদ ওয়া আল সাইয়ার, বাব গাজওয়া জু কারাদ, ৩/১৪৩৩।

২৭. আল সাতি, আল ফাতহ আল রব্বানী, ২১/১২০; ইবনে হিশাম, আল সীরাত, ৩/৪৪৬; ইবনে কাসির, আল সীরাহ আল নবুওয়াহ, ৩/৩৫৯; ইবনে হাজর, আল ইসাবাহ, ২/৫০৯।

২৮. আল ওয়াকিদী, আল মাগাজী, ২/৬৫৭।

২৯. প্রাগুক্ত, ২/২৫৯, ৬৭০।

৩০. হুয়াঈ ইবনে আখতাবের ফুফা, "আওন আল মা'বুদ", ৮/২৪২।

৩১. আবু দাউদ, আল সুনান, কিতাব আল খারাজ ওয়া আল ইমারা ওয়া আল ফাই, বাব মাজা, (১)-ফি হুকুম আর্দ খায়বর, ৩/৪০৮।

www.pathagar.com

৩২. ইবনে হিশাম, আল সীরাত, ৩/৪৪৯।

৩৩. ইবনে সাদ, আল তাবাকাত, ২/১১২।

৩৪. ইবনে হাজর, তাকরিব আল তাহজিব, ২/১৮৪।

৩৫. ইবনে হিশাম, আল সীরাত, ৩২/৪৪৯।

৩৬. প্রাগুক্ত।

৩৭. খলিফা, তারিখ, ৮৫, ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত।

৩৮. ইবনে আল কাইয়ুম, জা'দ আল মা'দ, ১/৪০৫।

৩৯. আল ওয়াকিদী, আল মাগাজী, ২/৬৯৯।

৪০. সহীত মুসলিম, কিতাব আল নিকাহ, ২/১৬৪৫।

৪১. ইবনে হিশাম, আল সীরাত, ২/৮০৪-৫, তিনি এখানে নামের তালিকা প্রণয়ন করেছেন।

৪২. আল ওয়াকদী, আল মাগাজী, ২/৭০০।

৪৩. সহীহ বুখারী, ৫/১৭৬, সহীহ মুসলিম, ৭/১৪-১৫।

৪৪. আহমদ, আল মুসনাদ, ৩/১৩৮; মাওয়ারিদ আল জামান, ৪১৩।

৪৫. সহীহ বুখারী, কিতাব আল মাগাজী, বাব মুয়ামেলাহ আল নবী আহল খায়বর, ৭/৪৯৬; সহীহ মুসলিম, কিতাব মুসাকাহ, বাব মুসাকাহওয়া আল মুয়ামেলাত বি যুজ'মিন আল তামর ওয়া আল জার, ৩/১১৮৬-১১৮৭; আবু দাউদ, সুনান, বাব ফি আল মুসাকাহ, ৩/৬৯৭। এই বর্ণনা আবু দাউদের সুনানের (কিতাব আল খারাজ, বাব মা জা'ফি হুক্ম আর্দ খায়বর, ৩/৪১২) রেওয়ায়েতের পরিপন্থী নয়, তাতে বলা হয়েছে; "রাসূল (সা.) ও মুসলমানরা যখন (জমিজমাসহ) খায়বরের সম্পদরাজি অধিকার করেন তখন কৃষি ক্ষেত্রে কাজ করার মতো যথেষ্ট শ্রমিক তাদের কাছে ছিল না তাই রাসূলুল্লাহ ইহুদীদের ডেকে তাদের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এভাবে দু'টি রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব যে ইহুদীরা রাসূলের কাছে প্রস্তাব দেয় এবং তিনি সে সম্পর্কে চিন্তা করলেন ও মুসলমানদের স্বার্থের অনুকূলে দেখে তা গ্রহণ করেন। অতঃপর ইহুদীদের ডেকে এনে চুক্তি সম্পাদন করেন।

৪৬. আল সা'তি, আল ফতহুল রব্বানী, ২১/১২৫, এটি একটি সহীহ হাদীস।

৪৭. আবু দাউদ, সুনান, কিতাব আল বু'উ, বাব আল খারাজ, আবু উবায়েদ, আল আমওয়াল, ১৯৮।

৪৮. সহীহ বুখারী, কিতাব আল মাগাজী, বাব গাজওয়া খায়বর, ৭/৪৯৫।

৪৯. আল সা'তি, আল ফতহুল রব্বানী, ২১/১২৫; আবু দাউদ, আল সুনান, কিতাব আল জিহাদ, বাব আল নাহিদ আন আল নুহুবা ইজা কানা ফি আল তায়াম কিবলা ফি আরদ্ আল আদুবি।

www.pathagar.com

৫০. আল ওয়াকিদী, আল মাগাজী, ২/৬৬৫।

৫১. আরও দেখুন, আল তাবারী, আল তাফসির, ২৫/৫০।

৫২. আওয়াদ আল শাহ্‌রি, মারবিয়াত গাজওয়াত খায়বর, ১৯৫।

৫৩. আবু দাউদ, আল সুনান, কিতাব আল খারাজ ওয়া আল ফাইওয়া আল-ইমারা, বাব মা, জা'ফি হুকুম আর্দ খায়বর, ৩/৪১৩; আল হাকীম, আল মস্তাদরাক, ২/১৩১ (আল দাহাবী একে সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন)।

৫৪. ইবনে হিশাম, আল সীরাত, ৩/৪৬৭।

৫৫. সহীহ বুখারী, কিতাব ফার্দ আল খুমস, ৬/২৩৭; সহীহ মুসলিম, কিতাব ফাজাইল আল সাহাবা ৪/১৯৪৬

৫৬. উমর ইবনে শিব্বা, তারিখ আল মদীনা, ১০৫।

৫৭. আব্দুর রাজ্জাক, আল মুসান্নাফ, ৫/২৭৬।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট এক ঃ

আহল আল সুফফাহ্ সম্পর্কিত সূত্র

প্রাথমিক সূত্র

১. আল কুরআনুল করীম।

২. আল বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (মৃত্যু ২৫৬ হিঃ)। সহীহ তিন ভলিউমের ৯ খন্ড। (মিসর ঃ মুহাম্মদ আলী সুবেহ)।

৩. ইবনে আবু হাতিম; আবু মুহাম্মদ আব্দুর রহমান ইবনে আবু হাতিম আল রাজী (৩২৭ হিঃ), কিতাব আল জারহ্ ওয়াল তাদিল, ৭ খন্ড। (হায়দারাবাদ, ভারত ঃ দায়রাত আল মা'রিফ আল উসমানিয়া, ১৯৫২-১৯৫৬)।

৪. হাজী খলিফা, মুস্তাফা ইবনে আব্দুল্লাহ (১০৬৮ হিঃ), কাশ্ফ আল জুনুন, দুইখন্ড। এর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে মুহাম্মদ শরীফ আল দ্বীন ইয়ালতাকিয়া ও রিফা'ত বিলকাহ আল কিলসির তাফসির (ইস্তাম্বুল ঃ আল বাহাইয়া প্রেস, ১৩৬০ হিজরী/১৯৪০ খৃস্টাব্দ)।

৫. খলিফা ইবনে খাইয়াত (২৪০ হিঃ), আল তারিখ, আকরাম জিয়া আল উমরীর মন্তব্যসহ। (নাজাফ ঃ আল আদাব প্রেস, ১৯৬৭ খৃস্টাব্দ)।

৬. আবু দাউদ আল সিজিস্তানী, সুলায়মান ইবনে আল আশা'স (২৭৫ হিঃ), সুনান, দুইখন্ড। আহমদ সা'দ আলী গ্রন্থটি তত্ত্বাবধান করেন। (মিসর ঃ মুস্তাফা আল বাবী আল হালাবী, ১৩৭১ হিঃ/১৯৫২ খৃঃ)।

৭. ইবনে সা'দ মুহাম্মদ (২৩০ হিঃ), আল তাবাকাত আল কুবরা, ৮ খন্ড। (বৈরুত ঃ দার বৈরুত ও দার সাদির, ১৯৫৮ খৃঃ)।

৮. আল সালামী, আবু আব্দুর রহমান মুহাম্মদ ইবনে আল হুসাইন আল সালামী আল নিসাপুরী (৪১২ হিঃ), তাবাকাত আল সুফাইয়া, নূরুল দ্বীন শুরায়েবার মন্তব্যসহ।

৯. আল সামহুদী, আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শিহাব আল দ্বীন আল হুসাইনী আল শাফী (১০১১ হিঃ), ওয়াফা আল ওয়াফা বি আখবার আল মুস্তাফা, দুই খন্ড। (কায়রো ঃ আল আদাব ওয়া আল মুয়াইদ, ১৩২৬ হিঃ)।

১০. ইবনে সাঈদ আল নাস, আবুল ফতেহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (৭৩৪ হিঃ), আইয়ুন আল আসর ফি ফুনুন আল মাগাজী ওয়াল শামাইল ওয়াল সাইয়ার, দুই খন্ড। (কায়রো ঃ মকতবাত আল কুদসী)।

www.pathagar.com

১১. আল তাবারী, মুহাম্মদ ইবনে জরির (৩১০ হিঃ), তাফসীর আল তাবারী, মাহমুদ মুহাম্মদ শাকিরের মন্তব্যসহ (মিসরঃ দার আল মা'রিফ)।

১২. ইবনে কাসির, ইমাদ আলদ্বীন ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাসির আল কুরায়েশী আল দামেস্কী (৭৭৪ হিঃ), তাফসির আল কোরআনুল আজীম, চার খন্ড (মিসর ঃ দার আইহিয়া আল কুতুব আল আরবিয়া)।

১৩. ইবনে মাজাহ, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ আল কাজবিনি (২৭৫ হিঃ), আল সুনান, দুই খন্ড; মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকীর মন্তব্যসহ (মিসরঃ দার আইহিয়া আল কুতুব আল আরবিয়া)।

১৪. মুসলিম ইবনে আল হাজ্জাজ আল কুশাইরি (২৬১ হিঃ), আল সহীহ, পাঁচ খন্ড। ফুয়াদ আব্দুল বাকীর মন্তব্যসহ (মিসরঃ দার আইহিয়া আল কুতুব আল আরাবিয়া, ১৩৭৪-১৩৭৫ হিঃ)।

১৫. ইবনে মঞ্জুর, জামাল আল দ্বীন আবুল ফজল মুহাম্মদ ইবনে মুকাররম ইবনে আলী (৭১১ হিঃ), লিসান আল আরব, ২০ খন্ড। (বুলাক, মিসর ঃ আল মিরাইয়া প্রেস, ১৩০০-১৩০৭)।

১৬. আল নাসাঈ, আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে আলী ইবনে শুয়ায়েব (৩০৩ হিঃ), আল সুনান, চার ভলিউম, ৮ খন্ড। (কায়রো ঃ আল মকতবা আল তিজারিয়া, তারিখবিহীন)।

১৭. আবু নূয়াইম, আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল ইস্পাহানী (৪৩০ হিঃ) আল হিলাইয়া আল আওলিয়া, ১০ খন্ড (মিসরঃ আল সাদ্দাম প্রেস, ১৩৫১-১৩৫৭ হিঃ)।

১৮. ইয়াকুত, আবু আব্দুল্লাহ ইয়াকুত ইবনে আব্দুল্লাহ আল হামাবী (৬২২ হিঃ), মুজা'ম আল বুল্‌দান, ৬ খন্ড Westenfeld এর মন্তব্যসহ (Leipzig : ১৮৬৬-১৮৭০ খৃঃ)।

আধুনিক সূত্র ঃ

১. আক্করাম আল উমরী, বুহুস ফি তারিখ আল সুন্নাহ আল মুসাররফা (বাগদাদ ঃ আল এরশাদ প্রেস, ১৯৬৮ খৃঃ)।

২. Rekendorf, দাইরাত আল মা'রিফ আল ইসলামিয়া, তিন খন্ড, আব্বাস আহমদ ও তার সহকর্মীবৃন্দ আনূদিত।

৩. সামি মাক্কী আল আনি, দিওয়ান কা'ব ইবনে মালিক (বাগদাদ ঃ আল মা'রিফ প্রেস, ১৯১৬ খৃঃ)।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট দুই ঃ

মদীনার সনদ সম্পর্কিত গবেষণা সূত্র

প্রাথমিক সূত্র

১. আল কুরআনুল করীম।

২. ইবনে আল আসির, মাজদ আল দ্বীন আবু আল সা'দাহ আল মুবারাক ইবনে মুহাম্মদ (৬০৬ হিঃ), আল নিহাইয়া ফি গারিব আল হাদীস ওয়াল আসার, পাঁচ খন্ড। তাহের আহমদ আল জাওয়ী ও মাহমুদ মুহাম্মদ আল তানাহি। (কায়রো ঃ ইসা আল বাবি আল হালাবী, ১৯৬৩)।

৩. আহমদ ইবনে হাম্বল (২৪০ হিঃ), আল মুসনাদ, ছয় খন্ড। (প্রকাশের স্থান ও তারিখ অনুল্লেখিত)।

৪. আল বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (২৫৬ হিঃ), সহীহ, নয় খন্ড। (কায়রো ও লেইডেন ঃ মুস্তাফা আল বাবি আল হালাবী, ১৯৫৮)। আমি সর্বশেষ সংখ্যার উল্লেখ করেছি।

৫. আল বালাদুরী, আহমদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে জাবির (২৭৬ হিঃ), আনসাব আল আশরাফ, প্রথম খন্ড, মুহাম্মদ হামিদুল্লাহর মন্তব্যসহ। (মিসরঃ দার আল মা'রিফ, ১৯৫৯)।

৬. আল বায়হাকী, আবু বকর আহমদ ইবনে আল হুসাইন ইবনে আলী (৪৫৮ হিঃ), কিতাব আল সুনান আল কুবরা, (হায়দারাবাদ, ভারত ঃ মজলিস দাইরাত আল মা'রিফ আল উসমানিয়া, তারিখবিহীন)।

৭. আল তিরমিজি, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সূরা আল সালামী (২৭৯ হিঃ), সহীহ আল তিরমিজি বি শারহ আল আরাবি আল মালিকী। (আল আজহার ঃ ইজিপশিয়ান প্রেস, ১৯৩১)।

৮. আল হাকীম, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল নিসাপুরী (৪০৫ হিঃ), আল মুস্তাদ্‌রাক আলা আল সাহিয়ান। (রিয়াদ ঃ মকতবা ওয়া মাতাবী আল নসর আল হাদীসা, তারিখ বিহীন)।

৯. বনে হাজর আল আসকালানী, শিহাব আল দ্বীন আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজর (৮৫২ হিঃ), তাহজিব আল তাহজিব, ১২ খন্ড। (হায়দারাবাদ, ভারত ঃ মজলিস দাইয়ারাত আল মা'রিফ আল উসমানিয়া, ১৩২৫-১৩২৭ হিঃ)।

www.pathagar.com

১০. ইবনে হাজম, আবু মুহাম্মদ আলী ইবনে আহমদ ইবনে সাঈদ ইবনে হাজম (৪৫৬ হিঃ), জাওয়ামী আল সীরাহ, ডঃ নাসির আল দ্বীন আল আসাদ ও ডঃ এহসান আব্বাসের মন্তব্যসহ। (মিসর ঃ দার আল মা'রিফ আল মিসরিয়া, তারিখবিহীন)।

১১. আল খতিব আল বাগদাদী, আবু বকর ইবনে আলী ইবনে সাবিত (৪৬৩ হিঃ), তারিখ বাগদাদ, ১৪ খন্ড। মুহাম্মদ হামিদ আল ফুক্কী এর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত। (মিসর ঃ আল সাদাহ প্রেস, ১৩৪৯ হিঃ/১৯৩১ খৃঃ)।

১২. তাকিদ আল ইলম, ডঃ ইউসুফ আল আইশের মন্তব্যসহ (দামেস্ক, ১৯৪৯)।

১৩. খলিফা ইবনে খাইয়াত (২৪০ হিঃ), আল তারিখ, আকরাম জিয়া আল উমরীর মন্তব্যসহ, (নাজাফ ঃ আল আদাব প্রেস, ১৯৬৭ খৃঃ)।

১৪. আবু দাউদ আল সিজিস্তানী, সুলায়মান ইবনে আশাস (২৭৫ হিঃ), সুনান, দুই খন্ড, আহমদ সা'দ আলীর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত। (মিসর ঃ মুস্তাফা আল বাবি আল হালাবী, ১৩৭১ হিঃ ১৯৫২ খৃঃ)।

১৫. আল দাহাবী, শামস আল দ্বীন মুহাম্মদ ইবনে উসমান (৭৪৮ হিঃ), তারিখ আল ইসলাম, এর ৬ খন্ড মুদ্রিত হয়েছে। (মিসর ঃ আল সা'দাহ প্রেস, ১৩৬৭-১৩৬৯ হিঃ)।

১৬. আল জারাকানী, শারহু আলা আল মাওয়াহিব আল লাদুনিয়া লি আল কাস্তালানী। (আল আজহার ঃ ইজিপশিয়ান প্রেস, ১৩৭২ হিঃ)।

১৭. আল জাইলাই আল ইমাম জামালুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ আল হানাফী (৭৬২ হিঃ), নসব আল রাইয়া লি আহাদীস আল হিদাইয়া। (কায়রো ঃ দার আল মামুন, ১৩৫৭ হিঃ/১৯৩৮ খৃঃ)।

১৮. ইবনে সা'দ, মুহাম্মদ (২৩০ হিঃ), আল তাবাকাত আল কুবরা, Leiden সম্পাদিত।

১৯. ইবনে সাঈদ আল নাস, আবু আল ফাতহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (৭৩৪ হিঃ), আইয়ুন আল আসর ফি ফুনুন আল মাগাজী ওয়া আল শামাইল ওয়া আল সাইয়ার, দুই খন্ড। (কায়রো ঃ মকতবাত আল কুদসী, তারিখবিহীন)।

২০. আল শাওকানী, মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ (১২৫০ হিঃ), নায়ইল আল আবতার, চার খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ। (মিসর ঃ মুস্তাফা আল বাবি আল হালাবী, ১৩৫২ হিঃ/১৯৬১ খৃঃ)।

২১. আল তাবারী, মুহাম্মদ ইবনে জারির (৩১০ হিঃ), তারিখ আল তাবারী, ১০ খন্ড, মুহাম্মদ আবুল ফজল ইব্রাহীমের (মিসর) মন্তব্যসহ।

www.pathagar.com

২২. আবু উবায়েদ, আল কাসিম ইবনে সালাম (২২৪ হিঃ), আল আমওয়াল, মুহাম্মদ খলিল হারাসের মন্তব্যসহ, (মিসর, ১৩৮৮ হিঃ)।

২৩. ইবনে আল কাইয়ুম, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ (৭৫০ হিঃ), জা'দ আল মা'দ, চার খন্ড। (মিসর ঃ মুহাম্মদ আলী সুবেহ, ১৩৫৩ হিঃ ১৯৩৪ খৃঃ)।

২৪. ইবনে কাসির, ইমাদ আল দ্বীন আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে উমর ইবনে কাসির আল কুরাইশী আল দামেস্কী (৭৭৪ হিঃ), আল বিদাইয়া ওয়া আল নিহাইয়া, ১৪ খন্ড। (কায়রো ঃ আল সাদাহ প্রেস, ১৩৫১ হিঃ/১৯৩২ খৃঃ)।

২৫. ইবনে মাজাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ (২৭৩ হিঃ), আল সুনান, ফুয়াদ আব্দুল বাকীর মন্তব্যসহ। (কায়রো ঃ দার আইহিয়া আল কুতুব আল আরাবিয়া, ১৯৫৩)।

২৬. মালিক ইবনে আনাস (১৭৯ হিঃ) আল মুদাওয়ানাহ আল কুবরা, আট খন্ড। (মিসর ঃ আল সা'দাহ প্রেস, ১৩২৩ হিঃ)।

২৭. মুসলিম ইবনে আল হাজ্জাজ, (২৬১ হিঃ), সহীহ মুসলিম বি শরহ আল নববী। (মিসর ঃ ১৩৪৯ হিঃ)।

২৮. আল মাকদিসী, আল মুতাহার ইবনে তাহের (৩৫০ হিঃ), কিতাব আল বাদ ওয়া আল তারিখ, ছয় খন্ড। Clement Huart-এর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত (প্যারিস, ১৯০৩)।

২৯. আল মাকরিজি, তাকি আল দ্বীন আবু আল আব্বাস আহমদ (৮৪৫ হিঃ), ইমাতা আল আসমা', মুহাম্মদ শাকিরের মন্তব্যসহ। (কায়রো ঃ মাতবা'ত লাজনাত আল তালিফ ওয়া আল তরজমা ওয়া আল নশর, ১৯৪১)।

৩০. ইবনে মঞ্জুর, জামালুদ্দীন আবুল ফজল মুহাম্মদ ইবনে মুকাররম ইবনে আলী (৭১১ হিঃ)। লিসান আল আরব (বেরুত ঃ দার সাদির, তারিখবিহীন)।

৩১. ইবনে হিশাম, আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিক (২১৮ হিঃ), আল সিরাহ আল নবুবিয়া চার খন্ড, মুস্তাফ আল সাকা ইব্রাহীম আল আবিয়ারী ও আব্দুল হাফিজ শালাবীর মন্তব্যসহ, দ্বিতীয় সংস্করণ। (মিসর ঃ মুস্তাফা আল বাবি আল হালাবী, ১৩৭৫ হিঃ/১৯৫৫ খৃঃ)।

৩২. আল ওয়াকিদী, মুহাম্মদ ইবনে উমর (২০৭ হিঃ), কিতাব আল মাগাজী, তিন খন্ড, Dr. Marsden Jones-এর মন্তব্যসহ। (অক্সফোর্ড প্রেস, ১৯৬৬)।

৩৩. আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহীম আল আনসারী (১৮২ হিঃ), আল রাদ আলা সাইয়ার আল আওজাত, আবু আল ওয়াফা আল আফগানীর মন্তব্যসহ। (মিসর ঃ ১৩৫৭ হিঃ)।

www.pathagar.com

আধুনিকসূত্র

১. আকরাম জিয়া আল উমরী, বুহুস ফি তারিখ আল সুনান আল মুশাররফা (বাগদাদ ঃ আল এরশাদ প্রেস, ১৯৬৭ খৃঃ)।

২. সালেহ আহমদ আল আলী, "তানজিমাত আল রাসূল আল ইদারিয়া ফি আল মদীনা।" আল মাজমা আল ইলম আল ইরাকী, সংখ্যা-১৭ (বাগদাদ ১৯৬৭)।

৩. Wellhausen, ইউসুফ আল আইশ অনূদিত, আল দৌলা আল আরাবিয়া ওয়া সুকুতুহা। (দামেস্ক ঃ আল জামাইয়া আল সুরাইয়া, ১৯৫৬ খৃঃ)।

৪. মুহাম্মদ হামিদ উল্লাহ, মাজমুয়াত আল ওয়াসাইক আল সিয়াসিয়াহ, দ্বিতীয় সংস্করণ। (বৈরুত ঃ দার আল এরশাদ, ১৩৮৯ হিঃ/১৯৬৯ খঃ)।

৫. মুহাম্মাদ ইজ্জাহ দারুজাহ, সীরাত আল রাসূল, দ্বিতীয় সংস্করণ। (মিসর ঃ ইসা আল বাবি আল হালাবী, ১৯৬৫ খৃঃ)।

৬. Sarjeant, R.B, "The Constitution of Medina", Islamic Quarterly-VIII ১-২।

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

- ডঃ আকরাম জিয়া আল দ্বীন আল উমরী ১৩৬১ (১৯৪২) হিজরীতে উত্তর ইরাকের মসুলে জন্মগ্রহণ করেন।
- বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৩৮২ (১৯৬২) হিজরীতে বি এ এবং ১৩৮৬ (১৯৬৬) হিজরীতে ইসলামের ইতিহাসে এম এ ডিগ্রী লাভ করেন।
- কায়রোর আইন শামস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৩৯৪ (১৯৭৪) হিজরীতে তিনি পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন।
- ১৩৮৬-১৩৯৬ (১৯৬৬-১৯৭৬) হিজরী পর্যন্ত তিনি বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন।
- তিনি ১৩৯৭-১৪০২ (১৯৭৭-১৯৮২) হিজরী পর্যন্ত মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান এবং একাডেমিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।
- বর্তমানে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেন্টে সুন্নাহর ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।
- ডঃ আল উমরী ইসলামী ইতিহাস- বিশেষ করে রাসূলের (সা.) জীবনী সম্পর্কে প্রায় ২০ খানা গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন।

তার মৌলিক রচনাসমূহ নিম্নরূপ-

i) বুহুস ফি আল সুন্নাহ আল মুশরিকা (চতুর্থ সংস্করণ)
ii) আল মুজতামা আল মাদানী ফি আহদ আল নুবুবাহ (দু' খণ্ড)
iii) আল রিসালা ওয়া আল রাসূল
iv) আল সীরাত আল নবুবিয়া আল সহিহা
v) কিয়াম আল মুজতামা আল ইসলামী মিন মঞ্জুর হাজারী
vi) আল তুরাহ ওয়া আল মুয়াসারা

এছাড়া তার সম্পাদনা কর্মসমূহ নিম্নরূপ-

i) আল মারিফা ওয়া আল তারিখ, ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান আল ফাসাবী।
ii) আজওয়াজ আল নবিয়ী, মুহাম্মাদ ইবনে জুবালাহ।
iii) তরিকাত আল নবিয়ী, হামাদ ইবনে ইসমাঈল আল আনসারী
iv) মুসনাদ খলিফা ইবনে খাইয়াত, আল উসফুরী আল বসরী (২৪০ হিঃ)।

www.pathagar.com